শিশুসাহিত্য পরিষদ
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

সম্পাদকমণ্ডলী

শিশুসাহিত্য পরিষদের পক্ষে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল
শ্রীননীগোপাল মজুমদার

প্রকাশক

শিশুসাহিত্য পরিষদের পক্ষে
শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা-২৫

মুদ্রাকর

শ্রীনীরদ চৌধুরী
নববিধান প্রেস
;৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প' .

ভবানীপুর বুক ব্যু..., ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৫
অশোক বুক সেণ্টার, ১৬৫ এম, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু,
কলিকাতা-১৯
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দাম

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আমার

———————————————————————————কে

উপহার দিলাম

চিত্রশিল্পী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে

শ্রীরত্নাবলী চক্রবর্ত্তী

শ্রীনির্মাল্যপ্রসূন সেন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমাদের কথা

শিশু ও কিশোরদের জন্য যাঁরা লেখেন, ছবি আঁকেন এবং তাদের সাহিত্যের কথা যাঁরা ভাবেন তাঁদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হল শিশুসাহিত্য পরিষদ। আজ আটাশ বছরেরও উপরে নানাভাবে এই পরিষদ বাংলার শিশুদের সেবা করে আসছেন।

পুরোনো লেখা সব দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে বলে এঁরা বের করে ছিলেন "আহরণী"। তোমরা আদর করে পড়েছিলে সে বই। তারপর বের করেছিলেন "আনন্দ"।

দুঃখের বিষয় যাঁরা ছোটদের জন্য বই বের করেন তাঁরা গল্প ও কবিতায় ভরে দেন তাঁদের বার্ষিকীগুলি। অথচ তোমরা চাও গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক, ছবি, বিজ্ঞান, অ্যাডভেঞ্চার, ম্যাজিক, আরো কত কি! এই অল্প পরিসরের মধ্যে (কারণ দাম আমরা কম রেখেছি) অনেক কিছুই তোমাদের কাছে করেছি পরিবেশন। আমরা নিশ্চয়ই জানি শিশুবিচিত্রা তোমাদের ভালো লাগবে।

কোন সম্মান দক্ষিণা না নিয়ে লেখা পাঠিয়েছেন তোমাদের লেখক বন্ধুরা; তোমাদের শিল্পী বন্ধুরাও বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দিয়েছেন ছবিগুলি। রামধনু পত্রিকার সম্পাদক মশাই তাঁদের কতকগুলি ব্লক আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। যে সব লেখক এখন পরলোকগত তাঁদের রচনা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের উত্তরাধিকারীরা। একে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করেছেন নববিধান [illegible], ক্যালকাটা ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী ও রিপ্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট। মহাকাশ অভিযানের ছবিগুলি আমাদের দিয়েছেন ইউ. এস্. এস্. আর. (U.S.S.R.)—এর সংবাদবিভাগ এবং ইউ. এস্. আই. এস্. (U.S.I.S.)।

এঁদের সবাইকে আমরা জানাই ধন্যবাদ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
সভাপতি, শিশু-সাহিত্য পরিষদ

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

বিষয় বস্তু

শিশু
বিচিত্রা

ঝড়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্ন মেঘে করিয়া ভর
ঐ যে ঝড় আসে,
মুকুলগুলি জানে না ডর
কচি পাতারা হাসে।

কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়,
ঝড় তো তার মুক্তিদাতা
তারি বা কিসে ভয়?

ডঃ প্রতুল গুপ্তের অটোগ্রাফ থেকে
'রামধনু'র সৌজন্যে

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মসিল চার্ল্‌স্‌ নামে এক ব্যক্তি প্যারিস নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে "২৭শে আগষ্ট আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব, আর সে আপনা আপনি ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।"

যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭শে আগষ্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্ল্‌স্‌ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোনও জিনিস আপনা হইতেই ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্ল্‌স্‌ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও তাহারা স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের অনেক পূর্বেই অনেকে অধৈর্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়ি দ্বারা বেলুন বাঁধা ছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল, আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ফ্রান্স দেশের একটি ছোট গ্রামে বেলুনটি পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি! উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়, বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। শহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে এ গ্রামের অধিবাসিগণ তাহা জানিত না। সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখী বই আর কিছু নহে।

চারিদিকে গণ্ডী করিয়া লোকের সারি দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভতর একটু একটু গুর্ গুর্ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটাকে দুই-একটা খোঁচা দিয়া তামাসা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোকরায়। শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেকবার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাদপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক্ একবার ওদিক্ হইতে সে যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারটির গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল। অমনি সেটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ!—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল।

কিছুকাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুটকাইয়া গেল। তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারটিকে বন্দী করতঃ গ্রামবাসী "ভট্টাচার্য মহাশয়দের" নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন, "ইহা এতাবৎকাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম।"

৮১ বছর আগেকার অধুনালুপ্ত 'সখা' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

রাজাজীর ডাকাতি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কয়েক বছর আগে আমি মাদ্রাজ গিয়েছিলাম,—নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে। প্রথম দিন রাজাজী এসে, বাংলায় যখন গভর্ণর ছিলেন সে সময়কার কথা তুলে, বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক কথা বললেন। বেশ লাগল। রাজাজীর সঙ্গে রাজনীতিক মতভেদ থাকলেও এ সত্য উপলব্ধি করেছি যে সভা-সমিতিতে তাঁর ভাষণ সকলেরই উপভোগ্য হয়।

বাংলা দেশে থাকার সময়ে আমার একজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি সেই সভাস্থলেই প্রস্তাব করলেন,—আপনার সঙ্গে আমরা একদিন ব্যক্তিগত ভাবে একটু আলোচনা করতে চাই, আপনার অনুমতি চাইছি।

রাজাজী একটু ব্যঙ্গ করে বললেন,—রাজনীতি নয় তো? সে বিষয়ে আমি এখন বড় একটা কারুর সঙ্গে কথা বলি না। এখন শুধু সাহিত্যচর্চা করি।

আমরা বললাম,—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

বেশ, তবে আপনাদের, সাংবাদিকদের,—বিশ্বাস করা বড় কঠিন।

সে যাই হোক, শেষটায় রাজী হলেন এবং সময় ঠিক করে দিলেন।

আমরা নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বাড়ী যেতেই খুব আদরযত্ন করে আমাদের বসতে বললেন এবং কফি এনে দিলেন পান করবার জন্য।

সেখানে বসেছিলেন আরও দুই-একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। অতীতের নানা কথা শুরু হ'ল। রাজাজী কৌতুকপ্রিয় এবং মিষ্ট-ভাষী। তামিলি বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিলেন। তাঁদের একজন সাংবাদিক, অপর জন রিপোর্টার বা সংবাদ-সংগ্রাহক।

প্রথমে বললেন,—আমি বাংলা জানি না, তবে বাঙ্গালীকে ও বাংলা ভাষাকে ভালবাসি। আপনাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যে বহু কৃতী সন্তান জন্মেছেন যাঁরা নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে ভারতকে করেছেন গৌরবান্বিত। আমাদের তামিল সাহিত্যও প্রাচীন এবং অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত চমৎকার।

আমাদের হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এমন সময় অপর মাদ্রাজী ভদ্রলোক বললেন,—আচ্ছা রাজাজী, শুনেছি আপনি নিজের হাতে মানুষ মেরেছেন—এ কথা কি সত্যি? বলুন তো ব্যাপারটা। কতদিন আগে একটা লোককে নাকি আপনি গুলি করেছিলেন?

হেসে বললেন রাজাজী,—হাঁ, আমি একটা লোককে গুলি করেছিলাম। সে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। তবে এ বিষয়ে আমাকে নিয়ে নানা জনে নানা ভাবে কাহিনীটি রটিয়েছে। তবে শুনুন আমার মুখে সত্যি যা ঘটেছিল।

সাংবাদিক অমনি তাঁর নোট-বুক খুলে বসলেন কলম বের করে। রাজাজী অমনি হাত তুলে বললেন,—না, ও কাজটি করবেন

না। তা হলে আমি বলব না। গম্ভীর ভাবেই তিনি কথা কয়টি বললেন।

ভদ্রলোক চুপ করলেন।

রাজাজী ফের বললেন,—লেখাপড়ার ভিতরে আমি নই, তা হ'লে সব কথা গোলমাল হয়ে যাবে।

শুনুন:

অনেক কাল আগেকার কথা। আমি তখন ওকালতি করি। পশার ভালই। নামাক্কাল নামে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য। সেলেম থেকে নামাক্কাল যাত্রা বড় সহজ নয়। অনেকটা পথ। সেখানে যেতে হলে নিতে হবে হয় ঘোড়ার গাড়ী, নয় তো গোরুর গাড়ী। আমি নিলাম বেশ বড় দেখে একটা গোযান। দু'টি বেশ বড় বলবান্ বলদ গাড়ী নিয়ে চলেছে। গোযান নিলাম এইজন্য যে রাত্রিবেলা বেশ আরামে ঘুমুতে পারবো বলে। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত ডাকাতের ভয় ছিল। সে জন্য আমার সেলেমের বন্ধুরা বলেছিলেন—রাজাজী, সাবধান! ও দিক্‌টায় বড় ডাকাতির ভয়। পথটা একেবারেই ভাল নয়। পথে পথে আবার টোলঘর বা খাজনা আদায়ের ঘরও আছে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ তামিল ভাষায় একজন চীৎকার করে উঠল—টাকা চাই! টাকা চাই! টাকা দাও।

গাড়ী থেমে গিয়েছিল। আমি বুঝলাম ডাকাত পড়েছে।

কিন্তু ঘাবড়ালাম না, স্বাভাবিক ব্যঙ্গসুরে বললাম,—কি? তুমি পনাম চাইছ?

হাঁ।—উত্তর দিল একজন, কঠোর স্বরে।

ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রি। কাছাকাছি কাউকে দেখতে পেলাম না। লোকটি আবার কর্কশকণ্ঠে বলল,—হাঁ, পনাম চাই।

আমি লম্বালম্বি ভাবে শুয়েছিলাম গোরুর গাড়ীতে। কে একজন

আমার গাড়ীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আমার পা ধরে টানতে আরম্ভ করল।

আমার বিছানার কাছে রেখেছিলাম আমার রিভলবার বা পিস্তলটি। সেটি, যেদিক্ হতে শব্দ আসছিল সেদিক্ লক্ষ্য করে, ছুড়লাম। গুড়ুম করে একটা শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম কে যেন ভীষণ শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভয় হ'ল এবং মনে হ'ল এবার ডাকাত দল নিশ্চয়ই আমার গাড়ী ঘেরাও করে ফেলবে। আমি পিস্তল হাতে করে প্রস্তুত রইলাম। মনে যে একটু আতঙ্ক হয়েছিল সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা অমূলক। কানে এসে পৌঁছাল একটা করুণ আর্ত্তনাদের ধ্বনি। গুলির শব্দে শুল্ক-ঘরের পাশে শায়িত কয়েকজন লোকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারা একটি কালিমাখা ক্ষীণ আলোর লণ্ঠন নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল আমার গাড়ীর সামনে। তারা লোকটাকে দেখে চেঁচিয়ে বললে,—হুজুর, লোকটা মরে নি!

আমার লক্ষ্য ভুল হয় নি। আমি শব্দ শুনেই গুলি ছুড়েছিলাম। আমার শব্দভেদী গুলি ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছিল। গুলিটা লোকটার মাথার খুলি ভেদ করে ঢোকে নি, তার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পুরানো ধরনের রিভলবার, বেশ বড় আকারের। আমি লোকটাকে আমারই গাড়ীতে তুলে কাছাকাছি একটি ছোট শহরে নিয়ে গেলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই লোকটা ভাল হয়ে গেল। আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল কিন্তু আমি নির্দোষ বলে খালাস পেলাম। আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুড়বার অধিকার আমার ছিল।

তা হলে রাজাজীই ডাকাতের উপর ডাকাতি করে এলেন! মনে মনে ভাবলাম আমরা।

ভয় ভাঙা

নরেন্দ্র দেব

সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মেছিল বলে নাম হয়েছিল তার সাগরদাস। কিন্তু জীবনে কখনো সাগর যে কেমন তা সে দেখে নি। লোকের মুখে শুনেছে—সাগরে নাকি অগাধ জল, যার কোনো কূল-কিনারা নেই।

সাগরদাস গরীবের ছেলে। লেখাপড়া শিখতে পারলে না। বয়সে বড় হয়ে উঠছে দেখে তার বাবা তাকে নিয়ে গেল একদিন গ্রামের পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত টোলে। লেখাপড়া শিখবার জন্য নয়,—পণ্ডিতমশাইকে বললে,—ঠাকুর! ছেলেটাকে আপনার শ্রীচরণে দিয়ে গেলুম। এ আপনার কাজকর্ম সবই করবে। বেতন কিছু দিতে হবে না, শুধু দুবেলা দু'-মুঠো প্রসাদ দেবেন আপনার পাতে।

সেই থেকে সাগরদাস পণ্ডিত মশায়ের কাছেই আছে। তাঁর সব কাজই করে। ডাকে 'ঠাকুর বাবা' বলে। পণ্ডিত মশাই তার ভক্তিশ্রদ্ধা আর কাজের মতিগতি দেখে খুব খুশি হ'য়ে ছেলেটাকে খুবই ভালবাসতেন। সাগরদাস না-হলে তাঁর চলে না।

পণ্ডিত মশায়ের অনেক দিনের বাসনা ছিল একবার পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি গঙ্গাসাগরে গিয়ে সাগর-স্নানের তীর্থ করে আসবেন। এবার যোগাযোগ হয়ে গেল। তিনি গঙ্গাসাগর তীর্থে যাবার জন্য গোছ-ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাই দেখে সাগরদাস বললে,—ঠাকুর বাবা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। নইলে, আপনাকে দেখা-শোনা করবে কে?

পণ্ডিত মশাই ভেবে দেখলেন ছেলেটা ঠিকই বলেছে। সেই দূর বিদেশে এই বৃদ্ধ বয়সে একলা যাওয়া উচিত হবে না। অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে দেখবে কে? অনেক চিন্তা করে তিনি সাগর-সঙ্গমে সাগরদাসকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন।

শুনে সাগরদাসের আনন্দ আর ধরে না। এবার সে সমুদ্র দেখবে। দেখতে দেখতে তাদের যাত্রার দিনও এগিয়ে এলো। 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে পণ্ডিত মশাই সাগরদাসকে সঙ্গে নিয়ে নৌকো ক'রে নদী পার হয়ে জাহাজে উঠে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। সাগর-তীর্থে চলেছেন, মহা আনন্দ তাঁর।

নৌকো যতক্ষণ নদীর জলে হেলে-দুলে চলছিল, সাগরদাস হাসি-মুখে 'হরিনাম' করতে করতে চলছিল। কারণ নৌকো চড়া তার অভ্যাস আছে। কিন্তু নৌকো ছেড়ে জাহাজে উঠে যখন সমুদ্র পাড়ি শুরু হ'ল, জাহাজের দোলানি আর ঢেউয়ে ওঠা-নামার ধাক্কায় সাগরদাসের মাথা ঘুরতে শুরু করলো। গা বমি বমি করতে লাগলো। ওরে বাপ রে! সমুদ্রে কী প্রচণ্ড ঢেউ! জাহাজ তো মোচার খোলার মতো টলমল করছে। ওরে বাপ রে—বাপ! এই কি সমুদ্র! সত্যিই যে এর কূল-কিনারা নেই! কোথায় যে নিয়ে চলেছে কে জানে? জলে ডুবিয়ে দেবে কি শেষে?

সাগরদাস ভয়ে 'হাঁউমাঁউ' করে কেঁদে উঠলো। চীৎকার করে বলতে লাগলো,—ঠাকুর বাবা! আমাকে বাঁচান। আমাকে নামিয়ে দিন। আমি সাগরে যেতে চাই না। ওরে বাপ রে বাপ! এ যে জাহাজেই আমি মরে গেলুম ঠাকুর! মরে গেলুম!

সাগরদাসের চীৎকার আর কান্না শুনে জাহাজের লোকেরা বিরক্ত হয়ে সবাই ওকে নামিয়ে দিতে বললে। পণ্ডিত মশাই বিপদে পড়লেন। সাগরদাসকে নিয়ে এখন কী করবেন কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে সেই জাহাজেই একজন 'সাধু মহারাজ' সাগর স্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি পণ্ডিত মশাইকে বললেন,—যদি আমার হাতে ওকে ছেড়ে দেন, আমি এখনি ওকে ঠাণ্ডা করতে পারি।

পণ্ডিত মশাই যেন বাঁচলেন। বললেন,—এই বোকাটাকে যদি আপনি ঠাণ্ডা করতে পারেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হবো।

সাধু মহারাজ তৎক্ষণাৎ সাগরদাসকে দু'হাতে তুলে ধরে খুব জোরে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

বাস্। সাগরদাসের কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। সে তখন প্রাণপণে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কেটে ডুবে না যায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলো। সাধু মহারাজ দেখে খুশি হলেন। কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ শুকিয়ে উঠলো। যদি ছেলেটা ডুবে যায়?

সাগরদাস হাত-পা নাড়তে পারছে না। তাকে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখেই সাধু মহারাজ জলে নেমে গিয়ে তাকে জাহাজে টেনে তুলে আনলেন। বেঁধে রাখলেন একটা ডাণ্ডায়। সাগরদাস জাহাজের সেই খুঁটিটা দু'হাতে চেপে ধরে চুপ করে বসে হাঁপাতে লাগলো।

পণ্ডিত দেখে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। সাধু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কেমন করে ছেলেটাকে ঠাণ্ডা করলেন?

সাধু মহারাজ বললেন,—দেখতেই তো পেলেন। এর মধ্যে কোনও 'মন্ত্রতন্ত্র' বা 'যাদুবিদ্যে' নেই। ছেলেটা বোধ হয় জীবনে কখনো সমুদ্রযাত্রা করে নি, তাই এতো বেশী ভয় পেয়েছিল। আমি শুধু ওর সেই ভয়টুকু ভেঙে দিলুম। আপনি নিশ্চয় জানেন, ঠাকুর মশাই, যে মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় তার মৃত্যুভয়। সেই জন্যে আমরা সর্বদা সাবধান হয়ে চলি। শুনুন একটা শাস্ত্রবাক্য বলি:

"খেতে খেতে ভরে ওঠে পেটটি যার,
যত ভাত দাও পরে, খায় না আর।
ক্ষিদে যার থাকে পেটে খায় সে চেয়ে,
হয় নাকো খুশি কেউ অল্প খেয়ে।
হোক যত ছেলে মেয়ে কুরূপ ঘরে,
বাপ-মা আদরে তবু পালন করে।
থাক, যত টাকাকড়ি, মোটর গাড়ী,
শিশুহীন হলে তার শূন্য বাড়ী।
হাসে খেলে শিশুদলে সদাই যেথা
সেই ঘর ভাবে তারা স্বর্গ সেথা।
তবু জেনো শিশুদের না দিলে তাড়া,
মানুষ হবে না তারা শাসন ছাড়া।"

হানাবাড়ী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

জীবনে রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রত্যেকেই হয় তো দু'-চারটা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু যে কাহিনী আজ আপনাদের শুনাইতে বসিয়াছি ঠিক তাহার সহিত তুলনা চলে এমন ব্যাপার ক'জন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন জানি না, আমি যে আর করি নাই তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি।

এম-এ ক্লাসে পড়ি। এপ্রিলের মাঝামাঝি গ্রীষ্মের ছুটী সুরু হইয়াছে। পশ্চিমে ও সময় দারুণ গরম, হাওয়া বদলাইবার মৎলবে মানুষ ওদিকে তখন সচরাচর যায় না—ছোটে পাহাড়-পর্বত অঞ্চলে। কিন্তু অসাধারণ কিছু একটা করাই আমার চিরকালের অভ্যাস, তাই একদিন তল্পিতল্পা গুছাইয়া পশ্চিমের গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। লাহোরে মেজমামা থাকিতেন, ছুটির প্রথম ভাগটা সেখানে কাটাইব এই ছিল অভিপ্রায়।

দু'দিন পরে আম্বালা জংশনে গাড়ী বদল করিয়া নতুন গাড়ীর যে কাম্‌রাটিতে উঠিলাম রবীন্দ্রনাথ সেটিকে দেখিলে হয় তো বলিতেন 'মহামানবের মিলনক্ষেত্র'। অর্থাৎ গুজরাট হইতে ব্রহ্মদেশ এবং কাশ্মীর হইতে সেতুবন্ধ, কোন জায়গার লোকেরই সেখানে অভাব নাই। সেই জনসমুদ্রের মধ্যে গাড়ীর এক কোণে দুইটি বাঙ্গালী-মূর্তি দেখিয়া মনটা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিল, গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া সেই বেঞ্চেই আসন লইলাম। লোক দুইটির মধ্যে একজনের বয়স বছর ত্রিশেক,—শীর্ণ চেহারা, চোখে-মুখে কেমন একটা হতাশা-মাখানো বিষণ্ণ ভাব। অপর লোকটি তার সঙ্গীর চাইতে দু'-চার বছরের বড় হইবে,—মাথায় কিঞ্চিৎ খাটো কিন্তু বহরে দ্বিগুণ এবং বেশ একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ির অধিকারী। খাটো গলায় দু'জনার কথাবার্তা চলিতেছিল। স্থূলকায় লোকটি

কহিতেছিল, "ওরা আমলই দিলে না একেবারে? আমি বলি তুমি একবার ছুলিচাঁদের সঙ্গেই দেখা কর না কেন! হাজার হোক্, তোমার ক্লাসফেলো তো সে!"

শীর্ণকায় লোকটি উদাসভাবে খোলা জানালার পথে বাহির পানে তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল, তারপর কহিল, "হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই তো লাহোর যাওয়া!"

ইহার পর তাহাদের গুণ গুণ আর কি কথাবার্ত্তা হইল ভাল শুনিতে পাই নাই; কেন না আমার তখন অত্যন্ত তন্দ্রা আসিতেছিল, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

রাত নয়টার পর ট্রেন আসিয়া লাহোরে থামিল। আমি অপরিচিত জায়গায় প্রথমে আসিতেছি তাই আমার মামাতো ভাই বিমল স্টেশনে উপস্থিত ছিল। সে ঠিক আমারই সমবয়সী, কাজেই আমার সঙ্গে খাতিরটা তার খুব বেশী। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া শুনিলাম আমাদের নাকি টঙ্গা ভাড়া করিয়া মাইল সাত-আট পথ যাইতে হইবে। মেজমামা সেনাবিভাগে রসদ সরবরাহ করিতেন; ঠিক সহরের উপর তাঁর বাসা নয়, তিনি থাকেন সহরতলীতে। রেলের যাত্রী ধরিবার জন্য অনেক টঙ্গা স্ট্যাণ্ডেই অপেক্ষা করিতেছিল, বিমল গিয়া একটির চালককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাড়া যাওগে?" সে কহিল "আহো।" তাহার জবাব শুনিয়া আমি অমনি তল্পিতল্পা সমেত গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিলাম, বিমল বাধা দিয়া কহিল, "দাঁড়া; 'আহো' কথার মানে 'এস' নয়, ও কথাটার মানে হচ্ছে 'হ্যাঁ'। আগে ভাড়াটা ঠিক করে নি। লোকটাকে দেখে আমাদের ও অঞ্চলেরই গাড়োয়ান বলে মনে হচ্ছে—তা হলে সস্তায় দাঁও মারা যাবে।"

বিমল মেজমামার ব্যবসা রাখিতে পারিবে বটে!

দরদস্তুরের কথা পাকা হইয়া গেলে আমরা টঙ্গায় গিয়া চাপিয়া বসিলাম। অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া

আসিয়াছি, রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস শরীর জুড়াইয়া দিতেছে, হঠাৎ যেন কেমন একটা ধাক্কা খাইয়া আমাদের টঙ্গা থামিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, যে রাস্তায় আমরা এতক্ষণ আসিতেছিলাম্ সেটি এখানে আসিয়া দু'ভাগ হইয়া দু'দিকে চলিয়া গিয়াছে—আমাদের ঘোড়া একটা পথ ধরিতেছিল, গাড়োয়ান প্রবল বেগে রাশ টানিয়া ঘোড়ার মুখ অপর রাস্তার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে ; তাহাতেই এই আচম্‌কা ধাক্কার সৃষ্টি। বিমল ঘাড় ফিরাইয়া গাড়োয়ানের সহিত গুরুমুখী ভাষায় কি বলিল এবং শিখ গাড়োয়ান সে কথার কি জবাব দিল আমি ভালমত বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে
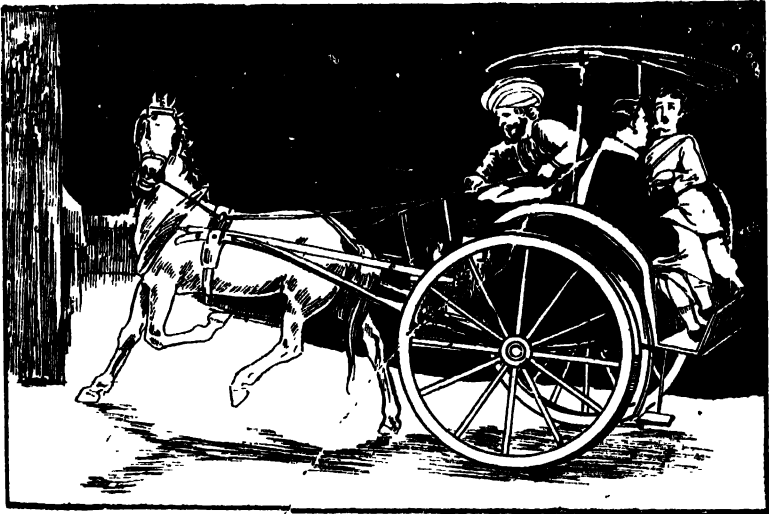
প্রবল বেগে রাশ টানিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে

জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইতে দেখিয়া বিমল বলিল, "আমাদের ওদিকে যাবার দু'টো রাস্তা—একটা সোজা পথ, আর একটায় গেলে কিছু ঘুরতে হয়। ঘরমুখো ঘোড়া সোজা পথই ধরেছিল। রাত দশটা বেজে গেছে বলে গাড়োয়ান সে পথে যেতে সাহস পাচ্ছে না, ঘুর-পথেই যেতে হবে। সোজা রাস্তায় তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছানো যায় বটে, কিন্তু ওদিকে ভয় আছে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা মুল্লুক তো দেখছি তোদের! রাজধানীর এত কাছে রাত দশটা বাজতে না বাজতে চোর-ডাকাতের উপদ্রবে রাস্তায় চলাফেরা করতে মানুষে ভরসা পায় না?"

"চোর-ডাকাত নয় রে, চোর-ডাকাত নয়,—ভূতের উপদ্রব। ও রাস্তায় যেতে পথে একটা হানাবাড়ী পড়ে", বলিয়া বিমল যে বিবরণ দিল সংক্ষেপে তাহা এইরূপ ঃ—তিন-চারশ' বছরের পুরাতন সাবেক আমলের কোন এক রাজার কেল্লা নাকি ওই রাস্তার উপর অবস্থিত। সেই সুবিশাল পুরাতন অট্টালিকা বর্তমানে একেবারে প'ড়ো দশায় আসিয়াছে। নিতান্ত বৃদ্ধ যাহারা তাহারাও কখনও কোন জনপ্রাণীকে ও বাড়ীতে বাস করিতে দেখে নাই। পল্লীটাতে মানুষের বসতি নাই বলিলেই চলে, তাহার মধ্যে জনশূন্য প'ড়ো কেল্লা মহাশ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতেছে। সে আমলের অনেক বীভৎস নরহত্যাই নাকি ওই কেল্লার মধ্যে ঘটিয়াছে। রাত্রি একটু গাঢ় হইতেই নানা প্রকারের অশরীরী প্রেতাত্মাদের তাই এখন পর্যন্ত অট্টালিকার মধ্যে নড়িতে-চড়িতে দেখা যায়, তাদের কণ্ঠস্বর—কখনো করুণ, কখনো ক্রুদ্ধ তাদের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে আসে। সেই সাবেকী রাজার বর্ত্তমান বংশধর যিনি তিনি কেল্লাটার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু এমন সব ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর কর্ম্মচারীদের চোখে পড়িয়াছে যে অবশেষে মেরামতের মৎলব বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছে। সাহসী বলিয়া পাঞ্জাবীদের ভারতময় খ্যাতি, কিন্তু রাত ন'টার পর ও তল্লাট মাড়াইতে ভরসা পায় এমন লোক তাদের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর।

বিমলের কথা শুনিয়া মনে মনে ভারী আমোদ বোধ করিলাম; বলিলাম, "আমার মনে হচ্ছে যেন বাঙালীদের সাহসই সব চাইতে বেশী। বিংশ শতাব্দীর ছেলে হয়ে ভূতের ভয়ে সোজা রাস্তায় না গিয়ে বাঁকা রাস্তা ধরব—আমার কোষ্ঠীতে বাপু তা কখনো লেখে নি। তুই গাড়োয়ানকে গাড়ী ফেরাতে বল. হানাবাড়ীর সামনে দিয়েই আমরা যাব।"

বিমল কহিল, "যা হবার নয় তা বলে লাভ কি? গাড়োয়ান যতই আমাদের হুজুর-হুজুর বলুক আর সেলাম ঠুকুক, যে মুহূর্ত্তে আমি ও কথা বলব সে মুহূর্ত্তেই ও 'হুজুরের' হুকুম অমান্য করে বসবে।"

সেদিন বাড়ী পৌঁছিয়া কোন প্রকারেই কথাটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। পরদিন প্রাতে তাই বেড়াইবার অছিলায় বিমলকে সঙ্গে লইয়া সেই হানাবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কেল্লার চেহারা এবং চারিদিক্‌কার অবস্থা চোখে পড়িতেই স্থানটির ভীষণতা প্রথমে আমার চোখে ধরা দিল, বুঝিলাম হানাবাড়ীর রহস্য জানা থাকিলে নিথর-নিস্পন্দ রাত্রে যে কোন সাহসী পুরুষেরই এখানে আসিতে বুক দুরু দুরু করিবে। পুরোনো কেল্লার চারিদিক্ জীর্ণ হইয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে, চত্বর আগাছা ও জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে, চারিদিকে ধু-ধু করা মাঠ আর মাঝে মাঝে জঙ্গল। মিনার-গম্বুজবিশিষ্ট কেল্লাটিকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি শ্মশানের মধ্যে গলিতকায় একটা দৈত্য বসিয়া বসিয়া বিকট হাসি হাসিতেছে।

বাড়ীর মালিক বাড়ীটিকে সবে মেরামৎ করিতে আরম্ভ করিয়াই কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনিচ্ছুক বিমলকে টানিয়া লইয়া আমি গুটি গুটি পা ফেলিয়া চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে কেল্লার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। অধিকাংশ স্থলেই দরজা-জানালার কোন বালাই ছিল না; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরগুলি বহুদিন হইতে বাদুড়, প্যাঁচা, ছুঁচো ও চামচিকার আশ্রয়স্থল হইয়া বিকট গন্ধে ভরপুর রহিয়াছে। যতদূর সম্ভব কেল্লাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ তখন পর্যন্ত চোখে পড়িল না।

রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া বিমলকে বলিলাম, "ভৌতিক উপদ্রবের যে কথা লোকের মুখে শোনা যায় দিনের আলোতে তা প্রত্যক্ষ করার আশা বড় কম। আজ রাত্রি গোটা বারোর সময়ে আর একবার বরং এদিকে আসা যাবে, কি বলিস?"

আমার প্রস্তাবে বিমল প্রথমটা যেন 'থ' হইয়া গেল। তারপর একটুকাল মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া কহিল, "যদি তোর একান্তই সে রকম ইচ্ছে থাকে তাই হবে।" বিমলের কণ্ঠস্বরে কিন্তু উৎসাহের বাষ্পও পাইলাম না।

রাত্রি এগারোটার পর বিমল ও আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের দু'জনার হাতেই একটি করিয়া ইলেক্‌ট্রিক টর্চ ও বাঁশের মোটা লাঠি। তা ছাড়া লাহোরের চারিদিক্‌কার দৃশ্য দেখিবার জন্য কলিকাতা হইতে যে দামী বাইনকুলারটা কিনিয়া আনিয়াছিলাম সেটিও সঙ্গে লইতে ভুলিলাম না।

সত্য ঘটনা বলিতে বসিয়াছি, কিছুই গোপন করিব না। হানাবাড়ীর নিকটবর্তী হইতেই আমার সমস্ত শরীর যেন ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। হঠাৎ বিমল আমার হাতে সজোরে একটা টান দিয়া অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সম্মুখে আঙ্গুল বাড়াইয়া কি যেন দেখাইয়া দিল। চাহিয়া যা দেখিলাম তাহাতে তো আমার চক্ষুস্থির! যে শূন্যপুরী আজ সকালেই আমরা আগাগোড়া ঘুরিয়া আসিয়াছি তাহারই একটা কুঠরীর জানলার মত খোলা জায়গা দিয়া এক ঝলক তীব্র আলোর রেখা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

কেল্লার ভিতরে ঢুকিবার মত সাহস তখন আমাদের আর অবশিষ্ট ছিল না। রাস্তার পাশেই একটা বড় গাছ ছিল, আমরা চট্‌পট্‌ তাহার উপর উঠিয়া এমন একটা জায়গা বাছিয়া লইলাম, যেখান হইতে সেই ফাঁকা জায়গা দিয়া কুঠরীটার অনেকখানি অংশই নজরে আসে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের চোখের সম্মুখে যে ভয়াবহ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল তাহাতে যে কোন মানুষেরই বোধ করি বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। আমরা দেখিলাম, সেই ঘরের ভিতর এক ভীষণদর্শন কাপালিক ঠিক আমাদের দিকে মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার বিশাল জটাভার কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আবক্ষ শ্মশ্রু, পরনে রক্তের মত রাঙ্গা কাপড়। কাপালিকের ডান হাতে একটা রক্তমাখা খাঁড়া,

বাঁ হাতে প্রকাণ্ড ত্রিশূল এবং গলার মালায় সারি সারি মড়ার মাথা ঝুলিতেছে। সব চাইতে আশ্চর্য, কাপালিক যেন এক মুহূর্ত্তে শূন্য হইতে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া বাহির হইল। তাড়াতাড়ি বাইনকুলারটি চোখে লাগাইয়া আরও যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ করি গাছ হইতে পড়িয়া যাওয়াই মানুষের পক্ষে

চোখের সম্মুখে ভয়াবহ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।

স্বাভাবিক ছিল। এ তো রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ নয়, এ যে একটা অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি! মানুষ কিছুতেই নয়,—প্রেতাত্মা!

একটু বাদেই সেই ভীষণ মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মাটিতে বসিল—ঠিক যেন যোগাসানে। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাইনকুলার চোখে লাগাইয়া ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ করিতে লাগিলাম। ঠিক করিয়াছিলাম, বিমলের হাতে বাইনকুলারটি কিছুতেই দেওয়া হইবে না—সে তাহা হইলে নির্ঘাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। হঠাৎ দেখি কাপালিক-মূর্ত্তির ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, মুখে ক্রোধের সুস্পষ্ট রেখা পড়িয়াছে, চোখ হইতে জ্বলন্ত আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ত্রিশূল উঁচাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন এখনই আমাদের দিকে সেটি ছুঁড়িয়া মারিবে।

আমাদের সাহস শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ; মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ে গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম। তারপর জুতা হাতে, লাঠি বগলে মাইল খানেক পথ দু'জনায় এরূপ বেগে অতিক্রম করিলাম যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড়বাজও সেদিন আমাদের হারাইতে পারিত কিনা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

ছুটিতে ছুটিতে আমরা লোকালয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তার পাশেই একটা বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছিল, দেখিয়া নিজেদের নিরাপদ জ্ঞান করিয়া থামিলাম। দুইজনেই তখন প্রচুর হাঁপাইতেছি। হঠাৎ সেই বাড়ীর বারান্দা হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "ওখানে কে দাঁড়িয়ে ?"

বিমল জবাব দিল, "আমি বোস্।"

"কে ? বোস্ জুনিয়ার ?" বলিতে বলিতে একজন শিখ ভদ্র-লোক আমাদের দিকে আগাইয়া আসিলেন। বিমল আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিল, "ইনি লেফটেনাণ্ট্ অমর সিং। এটা এঁর পৈত্রিক বাড়ী, মাঝে মাঝে এখানে এসে ইনি থাকেন।" তার পর আমাকে দেখাইয়া অমর সিংকে কহিল, "এটি আমার কাজিন্ প্রভাত রায়, ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির এম-এ ষ্টুডেণ্ট।"

লেফটেনাণ্ট্ অমর সিং আমার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "তার পর বোস্, রাত প্রায় একটা, এ সময়ে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছ ! ব্যাপার কি ?"

অমর সিংকে তখন আমি সমস্ত ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া পরিশেষে কহিলাম, "ও কাপালিকের মূর্ত্তিটা যে কোন রক্ত-মাংসের জীব নয় তা আমি আমার বাইনকুলারের সাহায্যে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি। অথচ জন্মাবধি ভূতপ্রেতে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। এ যে আমার সম্মুখে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হয়েছে—এ সমস্যার মীমাংসা না করতে পারলে আমি যেন কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছি না।"

অমর সিং মন দিয়া আমার সমস্ত কথাগুলি শুনিলেন, তার পর বলিলেন, "এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি ঠিক বলছেন ও মূর্ত্তিটা কোন মানুষের নয়?"

"ঠিক বলছি।"

"তাই তো, আমার নিজেরই যে বড় কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা কি পরখ করবার জন্যে। আমার বাড়ীতে দু'জন সাহসী আর্দালী আছে; তাদের যদি সঙ্গে নিই তো আপনারা ফের সেই হানা-বাড়ীতে যেতে প্রস্তুত আছেন?"

বিমলের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া আমি বলিলাম, "আছি।"

অমর সিং তখন তাঁহার আর্দালী দুইটিকে কাছে ডাকিলেন, বন্দুক আনিতে হুকুম দিলেন। তারপর বন্দুক আসিলে অমর সিং ও আর্দালীদ্বয় তিন বন্দুকসহ এবং আমরা আমাদের সনাতন লাঠি কাঁধে ফেলিয়া আবার সেই পুরানো কেল্লা অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িলাম।

কেল্লার সেই ঘরটা হইতে আলোর রশ্মি তখনও সমানে বাহির হইতেছিল, আমি অমর সিংকে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইলাম। তারপর পাঁচজনে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

উপরে উঠিয়া দেখা গেল যে ঘর হইতে আলো বাহির হইতেছিল সে ঘরের দুয়ার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। অমর সিং একটুখানি অপেক্ষা করিয়া দুয়ারের গায়ে বার কয়েক করাঘাত করিলেন—আর্দালীদ্বয় বন্দুক উঁচাইয়া দাঁড়াইল। মিনিট খানেক সব চুপচাপ, তারপর খুট করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দরজা খুলিতেই যাহা আমাদের চোখে পড়িল তাহাতে সবাই চম্‌কাইয়া উঠিল, কিন্তু আমিই চম্‌কাইলাম সব চাইতে বেশী। খানিক পূর্বে যে কাপালিক-মূর্ত্তি দেখিয়াছি এ তো সে নয়! সে ছিল জটাজুটধারী বিশালশ্মশ্রু একটা অশরীরী ছায়ামাত্র, আর আমাদের সম্মুখে যে দাঁড়াইয়া—

যদিও এরও পরিধানে কাপালিকেরই বেশ—তবুও এ তো জীবন্ত মানুষ! শীর্ণকায়, দাড়ি-গোঁফ কামানো একটি যুবক! আর এ যুবকও তো আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; আম্বালায় গাড়ী বদল করিয়া যে মলিনমুখ বাঙ্গালী যুবকটিকে দেখিয়াছিলাম, এ তো সেই! এ কি তবে আগাগোড়াই ভৌতিক কাণ্ড?

যুবকটি একে একে আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকেই একবার তাকাইয়া শেষে অমর সিংকে কহিল, "আমি নির্জনে আপন মনে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলাম, আপনারা এখানে কেন এলেন?"

অমর সিং কহিলেন, "সে প্রশ্ন তো আমাদেরই জিজ্ঞাস্য। কেন আপনি মালিকের বিনা অনুমতিতে এ বাড়ী অধিকার করে রয়েছেন আর কেনই বা আপনার অদ্ভুত ব্যবহারে সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন?"

একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া যুবকটি কহিল, "আপনি হুঁশিয়ার বটে, কিন্তু খুব বেশী হুঁশিয়ার ন'ন। মালিকের বিনা অনুমতিতে এখানে রয়েছি এ কথা আপনাকে কে বললে? এ কাগজখানা পড়ুন তো!" অমর সিংএর হাতে সে একখানা কাগজ বাড়াইয়া দিল। আমরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম সেখানায় লেখা আছে—"ধনঞ্জয় চৌধুরীকে তাহার কাজের জন্য আমার 'পুরানা কেল্লা' ছাড়িয়া দিলাম—যতদিন আবশ্যক ততদিন সে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে।" নীচে স্বাক্ষর রহিয়াছে "সর্দার বাহাদুর দুলিচাঁদ।" আজ প্রাতেই জানিয়াছিলাম কেল্লার বর্তমান অধিপতির ওই নাম।

হঠাৎ বিমল বলিয়া উঠিল, "ধনঞ্জয় চৌধুরী নামটা যেন চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে!"

যুবক একটু হাসিয়া বলিল, "তা হবে। আপনারা যখন 'রহস্যের' খোঁজে এসেছেন তখন আমার সমস্ত রহস্যই ব্যক্ত করব—আসুন, ঘরের ভেতরে আসুন।"

ঘরের ভিতরে ঢুকিতেই আমি অবাক্ হইয়া দেখিলাম ঘরটার

ছাদ হইতে মেঝে পর্যন্ত সমস্ত দেওয়াল আগাগোড়া আয়নায় মোড়া। আমাকে অবাক্ হইয়া সেই দিকে তাকাইতে দেখিয়া যুবক বলিল, "এটা কেল্লার শিষমহল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সাবেক আমলের প্রায় প্রত্যেক রাজবাড়ীতেই এই রকমের একটা করে শিষমহল থাকত। এ কেল্লার বর্তমান মালিক দুলিচাঁদের ইচ্ছা ছিল ঠিক সাবেক কালের মত করেই এটাকে আবার মেরামৎ করা হয়। প্রথমেই শিষমহলটা মেরামৎ হ'ল। তার পরেই হঠাৎ নাকি একদিন দুলিচাঁদের কর্মচারীরা কেল্লার কোথায় একটি আস্ত ভূত আবিষ্কার করে ফেলল,—কোথায় আবিষ্কার করল তা কিন্তু আমার অজ্ঞাত,—আর সেই থেকে কেল্লা-মেরামতের কাজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

"যাক, এবার আমার নিজের কথা বলি। আপনাদের মধ্যে এই-মাত্র একজন বলছিলেন আমার নাম তিনি জানেন। হয়তো জানেন, কেন না আমি পাঞ্জাব ডায়মণ্ড ফিল্ম কোম্পানীর একজন অভিনেতা। বায়স্কোপের অভিনেতা বলে মনে করবেন না আমি আমেরিকার অভিনেতাদের মতই একজন কোটিপতি। আমার আয় অতি সামান্যই; তার ওপর পৈত্রিক ঋণ থাকাতে সাংসারিক দুরবস্থার সীমা নেই। খবরের কাগজে আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না, দিল্লীর সুবিখ্যাত রয়াল ফিল্ম কোম্পানী বর্তমানে একটা মস্ত কাজে হাত দিয়েছে—একটা বিখ্যাত ছবি তারা তুলবে এবং সেই উদ্দেশ্যে লাখো লাখো টাকা ব্যয় করবে। কাপালিকের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য একজন সুযোগ্য অভিনেতা তারা খুঁজছে। ভেবে দেখলাম, কোন সুযোগে যদি এই কাপালিকের ভূমিকায় আমি একবার নামতে পারি তা হলে আমার অর্থকষ্ট দূর হবে—থোকে অনেক টাকা পাব, বাবার ঋণ তাতেই শোধ হয়ে যাবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে দিল্লী গেলাম; কিন্তু আমার অভিনয় দেখে ওরা মোটেই খুশি হতে পারল না—ওরকম অভিনয় চলবে না বলে জবাব দিলে। বড়ই আশাভঙ্গ হ'ল। এ কেল্লার মালিক সর্দার

বাহাত্বর ছুলিচাঁদের সঙ্গে রয়াল ফিল্ম কোম্পানীর সম্পর্ক আছে। ছুলিচাঁদ আমার কলেজের সহপাঠী, ভাবলাম তাকে দিয়ে একটু সুপারিশ করিয়ে নিলে যদি কোন ফল হয়। লাহোরে এসে আজ ছুলিচাঁদের সঙ্গে দেখা করার পর সে যা বললে তাতে আমার চোখের পর্দা খুলে গেছে। সে বললে একাগ্র সাধনা ছাড়া মানুষ কোন কাজে সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিলাতী অভিনেতা-দের টাকার বহরটাই আমরা শুধু দেখি, কিন্তু তাদের অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা একেবারেই ভুলে যাই। আমায় সে মাস তিনেক কাল অন্য কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে শুধু কাপালিকের অভিনয়েই মহড়া দিতে উপদেশ দিল। এ তিন মাস কাল সে রয়াল্ ফিল্ম কোম্পানীকে অন্য লোক নিযুক্ত করতে বারণ করবে। সে আরও জানাল, ভূতের ভয় না থাকলে সে তার পুরানো কেল্লার শিষমহলটা আমায় ছেড়ে দিতে, রাজী। কেন না চারদিকে আয়না থাকলে অভিনয়-শিক্ষার বড়ই সুবিধা হয়—সামান্য ক্রটিটুকুও অভিনেতার চোখে পড়ায় সে তা শুধরে নিতে পারে। আমি যখন তাকে জানালাম ভূতের ভয় আমার আদৌ নেই তখন সে সাহ্লাদে এই অনুমতি-পত্র লিখে দিয়েছে। আজ রাত্রেই আমি প্রথম মহলা সুরু করেছি। অভিনয়-মহলার সময় ঠিকমত পোষাকপত্র পরা থাকলে লোকে কেমন একটা প্রেরণা পায়, তাই কাপালিকের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই আমার সঙ্গে রয়েছে। ওই দেখুন আমার জটা আর দাড়ির বহর—যা দরজা খুলবার আগে আমি ছেড়ে রেখেছি।”

যুবক একটু থামিতেই আমি বলিলাম, “আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, বাকিটা আমিই সব বলে যাচ্ছি। প্রথম দৃশ্য হচ্ছে—আপনি ত্রিশূল আর খড়্গ হাতে এসে যোগাসনে বসবেন। জানালার দিকে পেছন ফিরে আপনি দাঁড়ালেন, অমনি সামনের আয়নাময় দেয়ালে আচমকা আপনার চেহারা ফুটে উঠল। আমরা পেছনে একটা গাছে বসেছিলাম—সবটা ঘর তো আমাদের নজরে আসে নি, শুধু সামনের দেয়ালটাই আসছিল। হঠাৎ এক

ময় কাপালিক-মূর্ত্তি ফুটে উঠতে দেখে আমরা আঁৎকে উঠলাম। দ্বিতীয় দৃশ্য হচ্ছে—হঠাৎ কোন কারণে আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে ত্রিশূল উঠিয়ে আক্রমণ করবেন। আপনার ছায়াটা আমাদের মুখোমুখি থাকায় মনে হ'ল অশরীরী মূর্ত্তিটা আমাদেরই ত্রিশূল ছুঁড়ে মারতে আসছে।"

ধনঞ্জয় সাগ্রহে বলিল, "রাগের ভাবটা আমার মুখে ঠিকমত ফোটাতে পেরেছিলাম ?"

"ভয়ানক রকম পেরেছিলেন। ওই দেখেই তো আমরা গাছ থেকে নেমে চোঁচা দৌড়। তার পর দলবল জুটিয়ে রহস্যভেদ করতে এখানে এসেছি।"

ধনঞ্জয় চৌধুরীর মুখে একটু সাফল্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বছর দেড়েক পরে কলিকাতার সিনেমায় রয়াল ফিল্ম কোম্পানীর বিখ্যাত ছবিখানা দেখিলাম। দর্শকদের মুখে সেদিন কাপালিকবেশী ধনঞ্জয়ের সুখ্যাতি আর ধরে নাই। খবরের কাগজগুলিও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল—সমগ্র ভারতে এরূপ অভিনয়-কৌশল আর কোন অভিনেতাই দেখাইতে পারে নাই।

দেহাতী গান

সুনির্মল বসু

দেহাতী গান,—সে আবার কি ? ···কোন রকম কালোয়াতী গান বুঝি ?

আরে না, না,—কালোয়াতী গানের আসর আমি এখানে জমাতে বসি নি,—কোন নতুন ধরনের সঙ্গীতের ইঙ্গিতও তোমরা আমার কাছ থেকে আশা ক'র না। দেহাতী গান,—নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার ; সেই কথাই আজ বলছি।

বিহার প্রদেশের অজ-পাড়াগাঁকে বলে দেহাত্, আর সেখানকার নিরক্ষর গ্রামবাসীদের বলে 'দেহাতী'। তাদের গানই দেহাতী গান।

ও কি! তোমরা যে হেসে উঠ্‌লে! ভাবছ, পাড়াগাঁর জংলীদের আবার গান কি ?

আমারও আগে সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু ওদের গ্রামে কয়েক মাস বাস ক'রে আমার সে ধারণা বিল্‌কুল্ পাল্‌টে গেছে।

আজ তোমাদের কাছে সেই দেহাতী গানেরই কয়েকটি নমুনা দিতে এসেছি। হয়তো তোমাদের ধারণাও বদ্‌লে যেতে পারে।

দেহাতী ভাষা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে,—তাই তার ভাব যথা সম্ভব বজায় রেখে আমি বাংলায় যে তর্জমা করেছি সেই রসই কিছু তোমাদের আজ পরিবেষণ করছি।

ঝড়ের দিনে ওদের দেশের ছেলেরা ঝড়ের তালে তাল দিয়ে নেচে নেচে গান ধরে—

এলো রে ঐ ঘূর্ণি ঝড়,—
বাঁশের বনে ঝরলো পাতা,
বাবলা গাছের নড়লো মাথা,—

কাঁপছে যেন বালুর চর ;
ছোট্ট টিয়ে উড়তে গিয়ে
আছড়ে পড়ে ছট্‌ফটিয়ে,—
আন্‌ তো খাঁচা—শীঘ্র কর্‌ ;
টিয়ের ছানা কোথায় এটা।
আরে ছিঃ ছিঃ, চাম্‌চিকেটা
ধুঁক্‌ছে শুয়ে ধুলোর 'পর !

ওদের শিকার করতে যাবার গান। ছোট ছেলেরা খেলার সময়েও এই গান করে—

চল্‌ মোরা ভাই, শিকার করি
বনের ভিতরে,
মোদের দলের দলপতি
কর্‌ব কি তোরে ?
বর্শা-ধনুক ভরসা মোদের,
গ্রাহ্য করি নে
নেক্‌ড়ে, ভালুক, হুঁড়ার, ফেরু,
হায়না, হরিণে।
আমরা সবাই কর্‌ব শিকার
কাঠ-বিড়ালীটা,
বাড়ী এসে খাব সবাই
মহুয়ার পিঠা।

খেলা করতে করতে অনেক সময়ে ওদের ছেলেরা এই গানটাও করে—

তুই বেশ গান গাস্‌ ভাই রে,
ঠিক যেন পেঁচা ডাকে বাইরে।
খাসা তোর রূপখানি সাঁচ্চা,
ঠিক যেন মোরগের বাচ্চা।

চাঁদ সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা বেশ মজার—

চাঁদের দেবতা বড় লাজুক যে ভাই,
সন্ধ্যায় আঁধারেতে
দেখা দেয় আকাশেতে,
দিনের বেলায় তারে দেখিতে না পাই।

কেমন মজার কল্পনা! চাঁদ বড় লাজুক—দিনের বেলায় পাছে কেউ তার মুখ দেখে ফেলে সেই লজ্জায় দিনের আলোতে সে বে-মালুম গা ঢাকা দেয়। আর একটি গান শোন—

সূয্যি মামার সঙ্গে বুঝি চাঁদা মামার আড়ি,
দুই মামাতে হয় না দেখা, মজার কথা ভারী।
যেমনি চাঁদের মুখ দেখা যায় অমনি তাড়াতাড়ি
সূয্যি মামা একটি ডুবে পালায় নিজের বাড়ী।
আবার যখন সূর্য ওঠে আভাস পেয়ে তারই
চাঁদা মামা পালায় চোঁচা আকাশখানা ছাড়ি'।

চারিধারে আঁধার ক'রে মেঘ আসছে, তখন হয়তো শোনা যায় ছেলের দল গান জুড়েছে—

নদীর কোণার জনার-ক্ষেতে
অধীর হ'ল বায়,
তোরা দেখবি যদি আয়!
কাজল মেঘের বাদল নামে
নীল আকাশের গায়,
তোরা দেখবি যদি আয়!
বন-বাদাড়ে সাঁঝ-আঁধারে
ঐ যে কারা যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়!
ঢোলক বাজে বনের মাঝে
সাঁঝের নিরালায়,—
তোরা দেখবি যদি আয়!

আকাশের তারা সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণাই থাক্—ওদের কল্পনাটাও কিন্তু বাস্তবিকই আজব রকমের—

ঝিক্‌মিক্ করে ভাই ওটা কি ?
আঁধারেতে আগুনের ফোঁটা কি ?
আকাশেতে হুলো বুঝি বাঁধা রে—
জ্বল্ জ্বল্ চোখ জ্বলে আঁধারে।

এক গ্রাম থেকে ভিন্ গাঁয়ের পথে চল্‌তে চল্‌তে ওদের পুরুষেরা গান ধরে—

সুন্‌সুনিয়ার ফুল ফুটেছে পাহাড়-তলীতে--
পায়ে কাঁটা ফুট্‌লো রে ভাই, পথটি চলিতে।
পাহাড়-তলীর পথের বাঁকে কাদের দুলালী,
গানের তানে মোদের সবার প্রাণটি ভুলালি ?
হল্‌দে শাড়ী পরনে তার, টিপ্‌টি কপালে—
সুন্‌সুনিয়ার শাক তোলে সে আজকে সকালে।

সব দেশেই নাতি আর ঠাকুরদা'র সম্বন্ধটা বেশ রসমধুর। নাতিরা ঠাকুরদা'কে নিয়ে পরিহাস করতে বেশ মজা পায়। এদের দেশেও তার রেওয়াজ আছে—

তামাক টানে ঠাকুরদাদা—গুড়ুক-গুড়ুক-গুড়,
যেমনি মিঠে তামাক রে ভাই, তেমনি মিঠে সুর।
ঠাকুরদাদার বয়স হ'ল চারটি কুড়ি পার,—
মাথাতে টাক, পাক ধরেছে গোঁফ জোড়াতে তার।
এই বয়সেও ঠাকুরদাদার বেজায় সাহস ভাই,
ফড়িং দেখে কাঁপতে থাকে,—সন্দেহ তায় নাই।
এই বয়সেও ঠাকুরদাদা খেতেও পারে বেশ,
আধ টুক্‌রো ভুট্টা খেয়ে নাকালের একশেষ।

ঠান্‌দি'রও রেহাই নেই। তাঁর সম্বন্ধেও ছড়ার অভাব নেই :

আমাদের ঠান্‌দিদি
তার ঢের গুণ,

কথায় কথায় খালি
হেসে হয় খুন।
ছোট ক্ষেতখানি তার
দেখি চেয়ে অনিবার,
কত শত ঝিঙে, লাউ,
পটল, বেগুন ;
যদি কিছু খেতে চাই
রাগিয়া আগুন।

আর একটি গানও খুব প্রচলিত—

ভাত রেঁধেছে, ডাল রেঁধেছে,
রাঁধল মটর শাক,—
যেমনি বুড়ী বসবে খেতে
ছিনিয়ে নিল কাক।

আহা, ঠান্‌দি বুড়ীর জন্য বাস্তবিকই কষ্ট হয়।

বিয়ের উৎসবে ওরা অনেক সময় এই গানটি করে—

ওরে টিয়ে, উড়ে যা রে
নীল আকাশের পারে,—
যেখানে আমার ভাই আছে,
আমার খবর নিয়ে
চুপে চুপে সেথা গিয়ে,
মোর কথা বল্ তার কাছে।
টিয়ে তো শোনে না কথা—
বোঝে না আমার ব্যথা,
ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে শুধু পাখী,
বসিয়া দুয়ার-ধারে
আজি শুধ্ বারে বারে
ছল ছল করে মোর আঁখি।

বিয়ের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এই করুণ গানটি কেন যে গাওয়া হয় তার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে পাই নি।

ওদের ছেলে-ভুলানো গানও কেমন সুন্দর!—

থাম্ খোকা,—থামা তোর কান্নাকাটি,
ভুট্টার ছাতু দেব,—রুটি, চাপাটি;
আকাশের চাঁদ দেব হাতে তুলিয়া,
এবার কাঁদন তোর যা রে ভুলিয়া।

এই রকম আরও কত গান যে আছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। সব গান তোমাদের শোনাবার উপযুক্ত নয় ব'লে আজ এখানেই পালা শেষ করলাম।

সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর, নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কালাপানির অতলে

শ্রীপ্রমেন্দ্র মিত্র

তোমাদের যদি বলি আর বছরের গোড়ার দিকে আলিপুরের হাওয়া-অফিসের ভূকম্পনমান যন্ত্রে, শ' তিনেক মাইল দূরের পৃথিবীর মাটীর ওপরে নয়, বঙ্গোপসাগরে জলের নীচে, এমন একটা দারুণ ভূমিকম্প ধরা পড়ে যাতে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গেছ্‌ল এবং তারই সাথে যদি বলি চাটগাঁয়ের কক্সবাজারে শুঁটকি মাছের বাজার বছরের মাঝামাঝি অত্যন্ত চড়ে যায়, আর এই দুই অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যদি জুড়ে দিই যে জল-ঝড় নেই—পৌষ মাসের শেষাশেষি একদিন কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর এক বিরাট বহর আশ্চর্য ভাবে সমুদ্রের মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—তাদের কারও কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না,—তা হলে তোমরা এই তিনটি ছাড়া ছাড়া ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না পেয়ে নিশ্চয়ই আমায় পাগল ভাববে।

কিন্তু এই তিন পৃথক্ ব্যাপারের ভেতর কি ভয়ঙ্কর সম্বন্ধ যে আছে তাই তোমাদের আজ বলতে বসেছি।

সেবার চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে রমানাথ বাবুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার আলাপ হয়। রমানাথ বাজপেয়ীর নাম তোমরাও হয়তো কেউ কেউ শুনেছ। যারা শোনে নি তাদের জন্যে তাঁর একটু পরিচয় দিচ্ছি। রমানাথ বাবু বাঙ্গালী হয়েও নেপ্‌ল্‌সের বিখ্যাত 'অ্যাকোয়েরিয়ামের' তিন বছর প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নেপ্‌ল্‌সের 'অ্যাকোয়েরিয়ামের' মত আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। চিড়িয়াখানায় যেমন পৃথিবীর জীবজন্তু ধরা থাকে এই 'অ্যাকোয়েরিয়ামে' তেমনি সমুদ্রের যত অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী সাধারণের দেখবার জন্যে ধরে রাখা আছে। এই জলচর-নিবাসের অধ্যক্ষের পদ যে সে লোক পায় না। বাজপেয়ী

মশাইএর মত সামুদ্রিক-প্রাণিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ইউরোপেও খুব কম আছে বলেই তাঁকে এ পদ দেওয়া হয়।

আপাততঃ তিনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলাতের এক বৈজ্ঞানিক সভার অনুরোধে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা করবার ভার নিয়ে চট্টগ্রামে আস্তানা পেতেছিলেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ।

অত্যন্ত অমায়িক লোক। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আমাদের দেশের সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করবার চেষ্টা করেছি শুনে তিনি অত্যন্ত আদর করে ডেকে আমার সঙ্গে এ সব বিষয়ে নিজে থেকে আলাপ করতেন। তাঁর সব কথা বুঝতাম এমন গর্ব করতে পারি না, কিন্তু তাঁর কাছে যে অনেক কিছু শিখেছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কক্সবাজারের জেলে-নৌকার বহর যখন আশ্চর্য ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তার কিছুদিন আগের কথা বলছি।

সকাল বেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে আছি। তিনি শীঘ্রই সমুদ্রে তাঁর গবেষণার জন্যে সামুদ্রিক প্রাণি-শিকারে যাবেন ঠিক হয়েছে। তার জন্যে ইতিমধ্যে একটি মাঝারি আকারের মোটর লঞ্চ জোগাড় করা হয়েছিল, আপাততঃ তাতে জাল ফেলার সরঞ্জাম খাটিয়ে কয়েকজন ভাল জেলে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। জেলেদের একজন সর্দারকে ডাকিয়ে তিনি তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমি তাঁর শেষ লেখা একখানি বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিলুম।

হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন,—"শুনছ সুধীর! সমুদ্রে যাদের চোদ্দ পুরুষ একরকম ঘর-বাড়ী করে বাস করছে তাদের সমুদ্রের সম্বন্ধে কি রকম কুসংস্কার এখনও আছে শুনলে?"

আমি তাঁদের কথাবার্তা এতক্ষণ অনুসরণ করি নি। জিজ্ঞেস করলাম,—"কি বলছে?"

"বলছে, সমুদ্রে মাছটাছ আজকাল ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, জেলেদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তা সত্ত্বেও ওরা আজকাল কাজে বেরুতে চায় না—ওদের বিশ্বাস সমুদ্রে দানো জেগেছে।

জিজ্ঞেস করলাম,—"সে আবার কি ?"

এবার জেলে-সর্দার নিজেই উত্তর দিলে এবং সে যা বললে তার মর্ম বুঝে অবাক্ হয়ে গেলুম। জেলেরা নাকি মিছিমিছি ভয় পায় নি। যেখানে মাছের ভারে সেদিন পর্যন্ত জাল ছিঁড়ে পড়ত সেখানে একটি মাছও যে পড়ে না এটাই তো একটা ভয়ের ব্যাপার; কিন্তু এ ছাড়া তাদের অনেকে স্বচক্ষে এমন জিনিস দেখেছে যা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না।

সর্দারকে আবার প্রশ্ন করায় সে যা বললে তা সত্যিই অদ্ভুত। মাছ ধরে ফিরতে অনেক সময়ে তাদের রাত হয়ে যায়। আজকাল মাছ পাওয়া যায় না বলে অনেক সময়ে তারা রাত পর্যন্ত না ঘুরে ফিরতেই পারে না। কয়েকদিন ধরে রাতে ফেরবার সময় তাদের অনেকে দেখেছে, দূরে সমুদ্রের জল থেকে আশ্চর্য রকমের রোশনাই উঠছে—সে আলো নাকি এমন তীব্র যে মনে হয় সমুদ্রে কে বিজলী-বাতির সার জ্বেলে রেখেছে।

হেসে বাজপেয়ী মশাইকে ইংরাজীতে বললাম,—"এ সব সর্দারের মাইনে বাড়াবার ফিকির নয় তো ?"

বাজপেয়ী মশাই বললেন, "না, এর ভেতর কিছু সত্য আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্রে মাছ দুষ্প্রাপ্য হওয়াটা তো আর ওর বানানো নয়—এটাই তো আশ্চর্য !"

সেদিন সর্দারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন জেলে যোগাড় করে দেবার চুক্তি বিনা গোলমালে হয়ে গেল। সমুদ্রের অদ্ভুত আলোর কথাও সেই সঙ্গে আমরা ভুলে গেলাম।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই যখন জেলে-নৌকোর বহর হারিয়ে গেছে সংবাদ এল এবং জল-ঝড় না থাকা সত্ত্বেও দু'দিন ধরে তাদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন বাজপেয়ী মশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে আমি যেতেই বললেন, "কালকের খবর শুনেছ তো?"

বললাম, "জেলে-নৌকোর কথা তো? শুনেছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "না হে, না; শুধু ওই নয়। যে ক'জন লোক কাল ওদের খোঁজ করতে দু'খানা নৌকো নিয়ে বেরোয় তাদেরও পাত্তা নেই।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—"না, এ কথা তো শুনি নি! এ কি ব্যাপার?"

তিনি বললেন,—"আমিও তো তাই ভাবছি।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন,—"দেখ, আমার আগেকার প্ল্যান আমি বদ্‌লালাম। আমি আজই লঞ্চ নিয়ে বেরুব। এ ব্যাপারের তদন্ত একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। তুমি আসতে পারবে তো?"

না আসবার কোন কারণ ছিল না। আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

দুপুরবেলা কক্সবাজারের জেটি থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চের সারেঙ, খালাসী ও কয়েকজন জেলে ছাড়া আরোহী মাত্র আমরা দু'জন।

লঞ্চটি যেমন মজবুত তেমনি বেগবান্। দেখতে দেখতে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আমরা অকূল সমুদ্রে এসে পড়লাম। কক্স-বাজারের পূবে মহিষখালি দ্বীপ। তারই কাছে কাছে সাধারণতঃ এই সব জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়। সেই দিকেই আমাদের লঞ্চ চলছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌঁছে আমরা হারানো জেলেদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

এবার, কি ভেবে জানি না, বাজপেয়ী মশাই লঞ্চের মুখ আরো দক্ষিণে ফিরিয়ে চালাতে বললেন। জিজ্ঞাসা করতে জানালেন, "কয়েকদিন এদিকে মাছ না পেয়ে নতুন জলের সন্ধানে জেলেদের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।"

তাঁর অনুমান যে সত্য কিছুক্ষণ বাদেই তার ভয়ঙ্কর প্রমাণ

আমরা পেলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা এগিয়েছি; হঠাৎ একজন জেলে চীৎকার করে বললে, "ওই দেখুন বাবু!"

ততক্ষণে আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেছে। দেখলাম উল্টো হয়ে জেলেদের একটি নৌকো ভাসছে। আমাদের লঞ্চ তার কাছে গিয়ে থামল। খালাসী জেলেরা সবাই রেলিঙের ধারে এসে ভীড় করে দেখতে এল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। জেলেদের নৌকোগুলি দস্তুরমত মজবুত এবং ঝড়ের ভেতরেও সহজে তা ডোবে না; তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রে থাকার দরুণ নৌকো চালানোতে তাদের জুড়ি পাওয়া ভার। সুতরাং তাদের নৌকো অকারণে এমন উল্টে যাওয়া আশ্চর্য নয় কি? নৌকোর আশেপাশে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না।

খানিক বাদে আবার লঞ্চ ছাড়া হ'ল। এবারে আমরা যত এগিয়ে যেতে লাগলাম, ততই এক এক করে হারানো বহরের নৌকো একটি একটি করে দেখা দিতে লাগল। তাদের সবগুলিই কোন অজানা কারণে একই ভাবে উল্টে গেছে এবং কোথাও জেলেদের একটু চিহ্নও নেই।

সত্যিই এবার আমার ভয় করছিল। আগের দিন হারানো জেলেদের খোঁজ করতে যারা এসেছিল তাদেরও কি পরিণাম হয়েছে স্মরণ করে বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে উঠছিল। খালাসী ও জেলেদের সবার মুখেই দেখলাম ভয়ের ছায়া; শুধু বাজপেয়ী মশাই সমস্ত ভয়ের ওপরে থেকে অত্যন্ত তন্ময় ভাবে কি চিন্তা করতে করতে ডেকের ওপর পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

ভাবছিলাম বাজপেয়ী মশাইকে লঞ্চ ফেরাবার আদেশ দিতে অনুরোধ করব কিনা, এমন সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে রমানাথ বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বললেন, "সুধীর, শীগ্‌গির আমার দূরবীনটা দাও।"

দূরবীনটা তাঁর হাতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা দেখেছেন তাও চোখে পড়ল।

আশ্চর্য ব্যাপার! কিছু দূরে সমুদ্রের কালো জলে মনে হ'ল কে যেন মোটা একটা সবুজ পেন্সিল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লাইন টেনে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় রমানাথ বাবু দূরবীন হাতে করতে না করতেই সে লাইন মিলিয়ে গেল। তিনি হতাশ হয়ে দূরবীন নামিয়ে বললেন—"দেখেছ তো?"

বল্লাম,—"হ্যাঁ। ওই দেখুন, ডানদিকে আবার সেই রকম দেখা যাচ্ছে!"

এবার আমাদের লঞ্চের ডানদিকে অতি অল্প দূরেই—লাইনের মত নয়, খানিকটা ধাবড়ার মত ওই সবুজ রং দেখা গেল। ঠিক যেন খুব খানিকটা সবুজ কালি কে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আমাদের চারিধারেই এবার এইরকম সবুজ রং দেখা দিতে লাগল।

রমানাথ বাবু লঞ্চ থামাতে বললেন। দূরবীন চোখে নিয়ে সেই সবুজ ছোপ দেখতে দেখতে তাঁর মুখ, কেন জানি না, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর তন্ময়তা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করলাম না।

লঞ্চ কয়েক মিনিট মাত্র থেমেছে, এমন সময় সেটা অত্যন্ত দুলে উঠল এবং বেশ টের পেলাম, হঠাৎ লঞ্চ একদিকে হেলছে। সেই মুহূর্তেই সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখলাম।

লঞ্চ হেলে পড়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে সমুদ্রের পানে চেয়ে-ছিলাম। মনে হ'ল ঠিক আমাদের ডেকের কাছে সমুদ্রের জলের কিছু নীচেই অমনি খানিকটা সবুজ রঙ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই সবুজ রং আরো স্পষ্ট হয়ে এল এবং তারপর যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকেই প্রথমতঃ বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ল। দেখলাম, ছোটখাট শুশুকের মত একটি সবুজ জীব; কিন্তু তা শুশুক তো নয়ই —সমুদ্রের যত প্রাণী মানুষের চোখে এ পর্যন্ত পড়েছে তার কোনটির

সঙ্গে তার মিল নেই। পেছনের দিকে খানিকটা শুশুকের মত হলেও সামনে তার অনেকটা অক্টোপাসের মত গুটি চারেক শুঁড় বেরিয়েছে। সবচেয়ে ভীষণ সে জীবটির দাঁতালো প্রকাণ্ড মুখ, আর সাপের মত নিষ্ঠুর চোখ। দেখতে দেখতে সেটা ডুবে গেল, কিন্তু তারপরেই দেখলাম আমাদের লঞ্চের চারিধারে ক্ষুধিত নেকড়ের পালের মত অসংখ্য এই জাতীয় জীব ঘিরে এসেছে। আমাদের চারিধারের জল সবুজ হয়ে গেছে তাদের ভীড়ে।

লঞ্চের সবাই এখন বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে সেইদিকে চেয়েছিল। সারেঙ একটা বালতিতে খানিকটা নোংরা এঞ্জিনের তেল বাইরে ফেলতে এসে বললে,—"লঞ্চ ভয়ানক হেলছে কেন বুঝতে পারছি না বাবু!"

লঞ্চ যে হেলছে এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলুম কিন্তু তাতে বিশেষ ভয়ের কিছু আছে এতক্ষণ আমাদের মনে হয় নি। সারেঙের কথায় আমরা চমকে উঠলাম। লঞ্চ হেলার সঙ্গে এই জীবগুলির কোন সম্বন্ধ নেই তো? আর সকলের কথা জানি না, আমার মনে ওই রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

রমানাথ বাবুর ধ্যান তখনও ভাঙ্গে নি। ডেকের নীচে যেখানে সারেঙের ফেলা ময়লা তেলটা ভাসছিল সেইদিকে চেয়ে তিনি তখনও একমনে কি ভাবছিলেন। লঞ্চ তখন এতটা হেলে পড়েছে যে আমরা ভয়ে ভয়ে অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। জেলেদের মুখ, দেখলাম, শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে। সর্দার আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাতে সে মগ—শুকনো মুখে "ফয়ার" নাম করে সে বললে, "আজ আর নিস্তার নেই বাবু, জেলের বহরের যে দশা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে। সমুদ্রে দানো উঠেছে আমি তো আগেই বলেছিলাম।"

তার কথার উত্তর দিলাম না। সামনের দিকে তখন দেখছিলাম কালো সমুদ্র সবুজ করে বহু দূর থেকে এই সামুদ্রিক নেকড়ের পাল

আসছে। তাদের আসা সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ঠিক শিক্ষিত সৈন্যের মত সার বেঁধে ছাড়া তারা চলে না। মাছের ঝাঁক অনেক সময়ে একসঙ্গে চলে, কিন্তু তাদের ভেতর এমন শৃঙ্খলা নেই। এদের প্রত্যেক সারে একটির বেশী দু'টি প্রাণী পাশাপাশি নেই। কেউ কাউকে এগিয়েও যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা সাপ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে আসছে ; তবে এঁকে-বেঁকে নয়, একেবারে তীরের মত সোজা।

এর মধ্যে লঞ্চ ক্রমশঃ এতটা হেলেছে যে আর একটু বাদেই সমুদ্রের জল ডেকের ওপর উঠবে। সারেঙ ভীত হয়ে রমানাথ বাবুর আদেশ না নিয়েই লঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু নীচের স্ক্রু তখন ভালো করে আর জল পায় না, লঞ্চ কাৎ হয়ে এগুতে গিয়ে আরো বেশী জল ডেকে উঠে পড়বার সম্ভাবনা হ'ল।

আমি ভয়ে একরকম উন্মত্ত হয়ে রমানাথ বাবুর কাছে গিয়ে চীৎকার করে বললাম,—"লঞ্চ যে ডোবে তা দেখতে পাচ্ছেন ?"

ভয়ে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। এমন কি এই বিপদের ভেতর আনবার জন্যে রমানাথ বাবুর ওপর রাগই হচ্ছিল। তিনি কিন্তু অবিচলিত ভাবে আমার দিকে ফিরে জলের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্লেন,—"দেখতে পেয়েছ ?"

সারেঙের ফেলা তেলটা ভাসছে। এ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বললাম,—"আপনি পাগল হয়ে গেছেন। লঞ্চ ডুবছে তা খেয়াল আছে ?"

রমানাথ বাবু এবার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকে উঠে ডাকলেন, —"সারেঙ !"

সারেঙ কাছেই ছিল। শুকনো মুখে বললে, "আর আশা নেই বাবু !"

সে কথায় কান না দিয়ে রমানাথ বাবু পাগলের মত জিজ্ঞেস করলেন,—"কত পেট্রোল আছে স্টোর রুমে ?"

সারেঙ আমারই মত অবাক্ হলেও উত্তর দিলে, "তা অনেক

আছে বাবু, দু'দিনের আসা-যাওয়ার মত তেল কেনা হয়েছিল।"

"শীগ্‌গির সব বার করে নিয়ে এসে লঞ্চের চারধারে ঢাল। শুধু ফিরে যাবার মত তেল থাকলেই চলবে।"

রমানাথ বাবুর কথা বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আবার জলের দিকে আমাকে তাকাতে বলে বললেন, "এখনও বুঝতে পার নি? আমাদের চারিধারে সব জল সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

সত্যিই সমস্ত জায়গা সেই প্রাণীর ভীড়ে সবুজ হয়ে গেলেও সেই

জলের তলায় নিয়ে গেল।

তেলটুকু যতখানি স্থান জুড়ে ভাসছিল তার ত্রিসীমানায় সবুজ রঙের আভাস ছিল না।

লঞ্চ তখন একেবারে হেলে পড়ে একদিকের ডেক জলের প্রায় সমান হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি আমি রমানাথবাবুকে টেনে না নিলে একটি জানোয়ার শুলো বাড়িয়ে আর একটু হলেই তাঁকে ধরে ফেলেছিল আর কি! খালাসীরা রমানাথ বাবুর আদেশের তাৎপর্য

না বুঝলেও ইতিমধ্যে চারধারে পেট্রোল ঢালতে সুরু করেছে। কিন্তু তাতে যে কিছু হবে আমার আশা ছিল না। পরমুহূর্তেই আমাদের চোখের উপর যে ব্যাপার ঘটল তাতে আশা হারানো অস্বাভাবিকও নয়। একজন জেলে তেল ঢালবার জন্যে রেলিঙের একটু বেশী রকম কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চীৎকার শুনে দেখি দু'-তিনটে জানোয়ার তাদের চাবুকের মত শুলো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা তার সাহায্যে যেতে না যেতেই তারা তাকে চক্ষের নিমেষে টেনে একেবারে জলের তলায় নিয়ে গেল। লোকটা একবারের বেশী চীৎকার করবার অবসরও পেল না। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের সকলেরই ওই দশা হবে জেনে গভীর হতাশায় আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু সেদিন প্রাণ নিয়ে অক্ষত শরীরে কক্সবাজারে ফিরে-ছিলাম। না ফিরলে এই গল্প তোমাদের শোনাতে পারতাম না। বেঁচেছিলাম শুধু রমানাথ বাবুর বুদ্ধিতে সে কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। চারধারে পেট্রোল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রের মত কি করে যে সেই ভীষণ সামুদ্রিক নেকড়ের পাল সরে গেল তখন বুঝতে পারি নি। স্টীমার একটু সোজা হতেই সারেঙ সেদিন প্রাণ-পণে এঞ্জিন চালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রমানাথবাবু নিজে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এসেই অবশ্য নিশ্চিন্ত হন নি। তাঁরই চেষ্টায় ও পরামর্শে অনেক গড়িমসির পর শেষ পর্যন্ত কক্সবাজারের পুলিশ রাজী হয়ে কয়েকটি জলে তেল ছড়াবার স্টীমার পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ঝড়ের সময় যেমন করে কোন কোন জাহাজ চারিধারে তেল ছড়ায় তেমনি করে ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিচরণ-ক্ষেত্র যুড়ে কয়েক দিন ধরে তেল ছড়ানো চলে। তার ফলে আশ্চর্য ভাবে কয়েক দিনের ভেতর তারা অন্তর্ধান করেছে। কক্সবাজারে এখনও সামুদ্রিক মাছ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আশা করা যায় আর বছরের ভেতর আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে।

কয়েক দিন বাদে রমানাথ বাবুকে এই অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর রহস্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন,—"ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য বটে, কিন্তু সমুদ্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা অনেক দিন আগেই এমন ঘটা যে সম্ভব তা অনুমান করে রেখেছেন। মানুষ এ পর্যন্ত সামুদ্রিক যে সব জীবজন্তুর সন্ধান পেয়েছে সেগুলি সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত ওপরের স্তরের। কিন্তু সমুদ্রের গভীর তলায় যে কি আছে মানুষ তার কিছুই জানে না। সমুদ্রের তলা তো বড় কম কথা নয়! হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গটিকে উল্টো করে যদি ডুবিয়ে দেওয়া যায় তা হলেও তল পাওয়া যায় না—এমন গভীর সমুদ্রও আছে। সেখানে মানুষের কোন জালই পৌঁছয় না। আর যদি বা পৌঁছত তা হলেই বা হ'ত কি? সমুদ্রের এ পর্যন্ত কতটুকু আর মানুষ খুঁজে দেখেছে? বৈজ্ঞানিকেরা তাই অনেকদিন আগেই অনুমান করেছেন সমুদ্রের গভীর স্তরে আমাদের অজানা অনেক অদ্ভুত জীব থাকা সম্ভব। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে সত্যি তাই প্রমাণিত হয়ে গেল। যে জীব আমরা দেখেছি, সমুদ্রের কোন গভীর স্তরে এদের বাস। এরা এত দিন ওপরে ওঠে নি বলেই মানুষ এদের পরিচয় পায় নি। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এদের বুদ্ধি আর শৃঙ্খলা।

"সমুদ্রের তলায় কোন প্রাণী যে এতখানি বুদ্ধি, এ রকম দলবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারে এ কথা কেউ ভাবে নি। জেলেদের নৌকো উল্টানোর ব্যাপার থেকেই এদের অসামান্য বুদ্ধির আমি প্রমাণ পাই। সার বেঁধে আক্রমণ করার শৃঙ্খলা তো তুমিও দেখেছ।"

বললাম, "আমাদের লঞ্চও তো উল্টোতে বসেছিল, কি করে তা এখনও বুঝতে পারি নি।"

"এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়, শুধু একটা সামুদ্রিক প্রাণীর মাথায় এসেছে এইটেই আশ্চর্য। নৌকো ও আমাদের লঞ্চের তলার

মেরুদণ্ডে মুলো জড়িয়ে এদের গোটা কতক প্রাণী একদিকে টানবার চেষ্টা করলেই তো কাৎ হয়ে পড়বে। কাৎ হবার পর সামনে থেকে মুলো জড়িয়েও নীচে টানা যায়। একটু কাৎ হলেই জল উঠে উল্‌টোতে কতক্ষণ ? অবশ্য এতে ভীষণ শক্তিরও দরকার।"

জিজ্ঞাসা করলাম,—"কিন্তু এরা হঠাৎ নীচের স্তর ছেড়ে উপরেই বা উঠল কেন ?"

রমানাথ বাবু বললেন, "প্রথমে আমিও তা ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তার পরেই মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে কাছাকাছি সমুদ্রের তলায় এক জায়গায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। সেই আলোড়নেই হয় তো,—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই,—এরা স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে এদিকে এসে পড়েছে। এসে প্রথমতঃ সমুদ্রের মাছ অর্দ্ধেক খেয়ে সাবাড় করেছে। বাকি অর্দ্ধেক এদের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। মাছের যখন অভাব তখন ক্ষিদের জ্বালায় এদের নজর গেছে মানুষের ওপর এবং তার জন্যে বুদ্ধি যা খাটিয়েছে তা অপূর্ব। দৈব পথ না দেখালে এতদিনে আমরাও তাদের পেটে হজম হয়ে যেতাম। সারেঙ যদি সেই সময় জলে ময়লা তেল না ফেলত, আমার যদি সেই দিকে চোখ না পড়ত তা হলে আমরা তো মারা যেতামই, আরো কি সর্বনাশ যে মানুষের ওই জীব থেকে হ'ত কে জানে ? সামান্য পেট্রোলের তেল কেন যে ওদের অসহ্য তা এখনও ভাল করে বুঝি না, এবং দৈব সহায় না হলে শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে এ ওষুধের সন্ধান কখনো পেতাম কিনা সন্দেহ।"

আমি বললাম, "এ সব তো বুঝলাম, কিন্তু জেলেদের সর্দার রাত্রে সমুদ্রে যে আলোর কথা বলেছিল সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যা ?"

রমানাথ বাবু হেসে বললেন, "সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। রাত্রে যে আলো জেলেরা দেখেছিল সে এই প্রাণীগুলিরই গায়ের আলো এবং এরা যে সমুদ্রের গভীর স্তরের জীব এই আলোই তার আর একটা প্রমাণ। সমুদ্রের গভীর তলায় একেবারে অমাবস্যার রাতের মত

অন্ধকার। সূর্যের আলো জলের রাশি ভেদ করে অত দূর পৌঁছতে পারে না। সেখানে যে সব প্রাণী থাকে প্রকৃতির আশীর্বাদে তাই তাদের আলো তারা নিজেদের দেহ থেকেই বার করবার ক্ষমতা পেয়েছে।"

খানিক চুপ করে থেকে রমানাথ বাবু আবার বল্‌লেন, "আমরা এই দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি, কিন্তু অসীম অতল সমুদ্রের ভেতর আরো কত রহস্যময় প্রাণী আছে কে জানে? পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ স্থলে যদি মানুষের মত বুদ্ধিমান্ জীবের উদ্ভব সম্ভব হয়, তা হ'লে এই বিশাল জলের জগতে নতুন ধরণের বুদ্ধিমান্ কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হবে না কে বলতে পারে?"

যতদিন আমাদের মহাপুরুষদের আমরা উপযুক্ত ভাবে সম্মান করিতে না শিখি ততদিন এ বাঙ্গালীর—এ ভারতের উদ্ধার নাই।

—নেতাজী

টেরিলিন ও তার আবিষ্কারক হুইনফিল্ড

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

তোমরা জান আমাদের জামাকাপড়, পোষাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরী করা হয় তুলো, পশম, রেশম ও এই ধরনের কোন আঁশ বা সুতো তাঁতে ফেলে। আমাদের সুতির পোষাকগুলি সাধারণতঃ তৈরী হয় তুলো থেকে, গরম কাপড়গুলি তৈরী হয় পশম থেকে আর পোষাকী কাপড়-চোপড় তৈরী হয় রেশম থেকে। তুলো পাওয়া যায় কার্পাস গাছের ফল থেকে, পশম পাওয়া যায় ভেড়ার লোম থেকে আর রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকার লালা থেকে।

শার্দোনে নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানীর ধারণা জন্মায় গবেষণাগারে রেশমের মতন চক্‌চকে সুতো তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু কাজটা কি সোজা? —মোটেও নয়। গুটিপোকা প্রকৃতির সৃষ্টি। রেশমকে বলা চলে প্রকৃতির এক আশ্চর্য অবদান' তাকে নকল করে সুতো তৈরী করতে হবে গবেষণাগারে? সে যে এক তাজ্জব ব্যাপার হবে!

কিন্তু সত্যি সত্যি সেটা করা সম্ভব হল একদিন। আর ঐ সুতো দেখতে অনেকটা রেশমের মত হল বলে তার নাম দেওয়া হল কৃত্রিম রেশম। তার মানে কৃত্রিম রেশম হচ্ছে আসল রেশমের নত নরম, চক্‌চকে ও অত্যন্ত মসৃণ।

তবে দুঃখের বিষয় এ সুতো আসল রেশমের মতো টেকসই হল না। তার মানে তেমন শক্ত হল না—বিশেষ করে ভিজে অবস্থায়।

এটা বৈজ্ঞানিকদের ভারী নিরাশ করে তুললো। কিন্তু দেশ-বিদেশের জনসাধারণ এ আবিষ্কারে মুগ্ধ। তার কারণ হাজার হলেও এ একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কীর্তি ও পোষাকপরিচ্ছদ তৈরীর ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব্ব অবদান। সেজন্য পৃথিবীময় শার্দোনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। আর সকলে বিজ্ঞানের জয়গান করতে লাগল।

শার্দোনের মত আরোও কয়েকজন বিজ্ঞানী এ ধরনের সৃষ্টিমূলক কাজে হাত দেন ও কেউ কেউ অনেকটা এই ধরনের কৃত্রিম সুতো তৈরী করে ফেলেন। শার্দোনে তৈরী করেন কাঠের গুঁড়ো বা তুলো থেকে, আর তাঁদের ভিতর কেউ তৈরী করেন কাগজ থেকে, কেউ কাঠ থেকে, কেউ দুধ থেকে, কেউ সয়াবিন নামে এক ধরনের শিম থেকে। ক্রমশঃ এই ধরনের কৃত্রিম সুতো তৈরী হল পনেরো রকম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলির ভিতর কোনটাও তুলো, রেশম বা পশমের মত উপযোগী হয় নি। বলা বাহুল্য, এটা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষ এত উন্নত কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির কাছে সে এত ছোট হয়ে থাকবে এ কেমন কথা ?

পরিশেষে এ অভাব দূর হয়। আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক তৈরী করে ফেলেন নাইলন। এ সুতো দেখতে যেমন সুন্দর, চকমকে ও মসৃণ তেমনি সেটা শক্ত, টেকসই ও পোষাকপরিচ্ছদ তৈরী করার উপযোগী। এ ছাড়া এ সুতো বা সুতোর তৈরী কাপড় সহজে আগুনে পোড়ে না, পোকায় কাটে না, জলে বা ঘামে পচে না। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন তাঁদের স্বপ্ন এতদিনে সার্থক হয়েছে।

এরপর আবিষ্কৃত হয় টেরিলিন। এ সুতোও নাইলনের মতো নানা-গুণে ভরা। তবে টেরিলিন বা নাইলনের দোষও আছে। এগুলির ভিতর সব চাইতে বড় দোষ হল এই যে নাইলন বা টেরিলিনের জল বা ঘাম শুষে নেবার ক্ষমতা খুব কম। এর দরুন এগুলির তৈরী পোষাক পরে ঘামলে সে ঘাম অনেকখানিই কাপড়ে সুতোর উপর জমে থাকে, সুতোর ভিতরে শুষে যায় না। ফলে, ঐ অবস্থায় শরীরের সঙ্গে ঐ পোষাক লেগে থাকলে যে মানুষ ঐ পোষাক পরে থাকে সে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। এজন্য প্রথমে সুতির গেঞ্জী গায়ে দিয়ে তার উপরে নাইলন বা টেরিলিনের জামা পরতে হয়।

তবে টেরিলিন বা নাইলনের জল বা ঘাম শুষে নেবার ক্ষমতা যে কম তার ভালো দিক্‌ও আছে। টেরিলিন, নাইলনের তৈরী পোষাক ধুয়ে শুকিয়ে দাও, দেখবে তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ও সেটা চটপট

শুকিয়ে গেছে। এই সুবিধার জন্য বর্তমান কর্মব্যস্ত জগতে টেরিলিন ও নাইলনের পোষাকের অত্যন্ত আদর।

এখানে একটা মজার কথা বলব। টেরিলিনের যে ঘাম শুষে নেবার ক্ষমতা কম তার সংশোধনের একটা পন্থাও আবিষ্কৃত হল। সেটা কি ভাবে হল জান? টেরিলিনের সুতোর সঙ্গে তুলোর সুতোও ব্যবহার করা হল পোষাকপরিচ্ছদ তৈরীর ক্ষেত্রে। তুলোর সুতোর ঘাম শুষে নেবার ক্ষমতা যথেষ্ট কিন্তু টেরিলিনের খুব কম। সুতরাং কাপড়ে দু'রকম সুতো থাকার দরুণ ঐ কাপড়ের ঘাম শুষে নেবার ক্ষমতা মাঝারি রকম হয়ে দাঁড়াল। এ ধরনের কাপড়ের নাম দেওয়া হয় 'টেরিকট'। 'টেরিকট' শব্দটি এসেছে টেরিলিন ও কটন (তুলোর ইংরেজী) এ-দু'য়ের মিশ্রণরূপ থেকে।

এবার টেরিলিন কি কি জিনিস থেকে তৈরী হয় সে কথা বলি। ঐ জিনিসগুলির সম্পুর্ণ নাম বললে সেটা তোমাদের কাছে বিদ্‌ঘুটে ও উদ্ভট বলে মনে হবে। সে নাম যেমনি লম্বা তেমনি দাঁতভাঙা বা কটমট ধরনের। তবে তোমরা এটুকু জেনে রাখ যে পেট্রোল ও কয়লার ভিতর যে সব মৌলিক উপাদান আছে ঐগুলি থেকেই টেরিলিন তৈরী হয়। আরও সহজ ভাষায় বলব, ঐ সুতো তৈরী হয় কার্বন বা অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগপদার্থ থেকে।

টেরিলিন আবিষ্কৃত হয় ইংল্যাণ্ডে,— ১৯৪১ সনে। এর আবিষ্কর্তা দুইজন,—জে. আর. হুইন্‌ফিল্ড্ ও জে. টি. ডিক্‌সন্। তবে এঁদের ভিতর হুইন্‌ফিল্ড্‌ই প্রধান, ডিক্‌সন্ তাঁর গবেষণামূলক কাজের প্রধান সহায়ক।

হুইন্‌ফিল্ডের বিদ্যাশিক্ষা সুরু হয় ইংল্যাণ্ডের একটি স্কুলে ও পরে তিনি কেম্ব্রিজের একটি কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বলাভ করতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় কর্মজীবনে। ঐ সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রিস্‌-এ চাকরী করতেন। ঐ কারখানার গবেষণাগারেই তিনি টেরিলিন আবিষ্কার করেন।

ঐ আবিষ্কারের পর তাঁর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সকলে দেখতে পায় নাইলনের মত টেকসই আর এক ধরনের সুতো দেখা

দিয়েছে। এ সুতো দিয়ে শুধু পোষাকপরিচ্ছদের উপযোগী উৎকৃষ্ট ধরনের কাপড়ই তৈরী করা যায় না,—খুব শক্ত দড়ি, মাছ ধরার জাল, নানা রকমের শক্ত সুতো ও আরও বহু সামগ্রী তৈরী করা যায়। এ সব বিষয়ে টেরিলিন নাইলনের প্রায় সমকক্ষ।

বিজ্ঞানের যুগে খুব কম জিনিসই এক দেশের বৈশিষ্ট্য রূপে বেশীদিন থাকে। টেরিলিনের বেলায়ও তেমনি ঘটেছে। শীঘ্রই দেখা গেল অন্যান্য বহু দেশও টেরিলিনের অনুকরণ করে ঐ ধরনের সুতো তৈরী করতে সুরু করেছে। আজ সারা পৃথিবীতে প্রায় শ'খানেক কারখানা ঐ ধরনের সুতো তৈরী করছে। এগুলির ভিতর ভারতবর্ষও একটি।

১৯৬৩ সনে হুইন্‌ফিল্ড্‌ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শোনা যায় তাঁর কাজের নেশা এত বেশী যে নিজের বাড়ীতেও তিনি ছোট একটি গবেষণাগার তৈরী করে সেখানে বসে কাজ করেন।

টেরিলিন আবিষ্কারের কিছুদিন পরে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। একটি চলচ্চিত্র বা সিনেমা পর্ষৎ তাঁকে বলেন, তিনি গবেষণাগারে কাজ করছেন এমনি অবস্থায় তাঁরা একটা ছবি তুলতে চান। শুনে আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক বিব্রত হয়ে পড়েন ও বলেন,—'বলেন কি, শেষ পর্যন্ত আমাকে অভিনেতার ভূমিকায় নামিয়ে ছাড়বেন!' এতে পর্ষৎ-এর লোকেরা বলেন,—'কেন, আপনি কি অতি উচ্চাঙ্গের অভিনেতার মত এক চমকপ্রদ অবদান ঘটান নি?' শুনে বৈজ্ঞানিক হেসে ফেলেন। তিনি ঐ পর্ষৎ-এর লোকদের নির্দেশমত অতি স্বাভাবিক ভাবে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করে যান ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবি তুলে নেওয়া হয়।

শোনা যায় ছবিটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে ও বৈজ্ঞানিক মহলে এটা মাঝে মাঝে দেখানো হয়। বলা বাহুল্য, দর্শকেরা ছবিখানি মুগ্ধ হয়ে দেখেন ও মনে মনে ঐ আবিষ্কারকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুতপ্ত সন্তান

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

দোহাই বাবা, রাগ ক'রো না,
ফিরে চল ঘরে,
তরকারি ভাত ঠাণ্ডা হ'ল,
মায়ের আঁখি ঝরে।

টানবো না আর লেজটি ধরে
মারবো নাকো লাফ,
দাঁত-খিঁচুনি মুখ-ভ্যাঙানি
এবার করো মাপ।

বলবে যা, তা করবো আমি
হব বেজায় সৎ,
দোহাই বাবা, পায়ে ধরছি
দিচ্ছি নাকে খৎ!

বইটি নিয়ে পড়বো ব'সে
সারা সকাল বেলা,
একেবারে ভুলবো আমি
কিষ্কিন্ধ্যার খেলা।

খাবার পরে ঢুলবে যখন
নাক ডাকাবে ক'সে,
গায়ের উকুন, পাকা চুল
বাছবো ব'সে ব'সে।

দোহাই বাবা, রাগ ক'রো না
খিদেয় মলুম জ্বলে,
এইবারটি ক্ষমা করো
অবোধ শিশু ব'লে।

———

রামসুক তেওয়ারী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসেছিল এই দেশে রামসুক তেওয়ারী
অধিবাসী হবে বুঝি বুন্দী কি রেওয়ারি।
বুক ছিল কি দরাজ, কি গভীর পেটটি!
ভুট্টার ছাতু খেত সের দুই লেট্টি।
আধসের চানা খেত চিবাইয়া দন্তে,
সিদ্ধির সরবৎ কুস্তির অন্তে।

বাংলায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা।
প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত।
কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার,
ভুঁড়ি তার কমে গেছে, বেড়ে গেছে নাক তার।
খায় দাদখানি চাল, ডুমুরের ঢেঁচকী,
তবু ওঠে উদ্‌গার, কভু ওঠে হেঁচ্‌কী।
বড়াবড়ি, ট্যাবলেট, পর্পটী চূর্ণ,
অনুপান, অবলেহে ঘর তার পূর্ণ।
ভাঁজিবার মুদ্‌গর—শৌর্যের উৎস
দূরে পড়ে; খোঁজে আজ মদ্‌গুর মৎস্য।
ভাবে নি সে হবে তার এত বড় 'চেঞ্জ'-ই,
পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া
দেশ থেকে ধেয়ে এল দেশোয়ালী ভাইয়া।

করে দিল প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ,
বে-ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ।
ভোরে ঘোরে খোলা মাঠে রামসুক সাথে সে,
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে।

পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি

চা ছাড়িয়া রামসুক উঠলো যে মুটিয়ে,
অড়হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটি হে।
চা খেলেই তাড়া করে, করে নাকো কেয়ারই,
খাসা আছে, সুখে আছে রামসুক তেওয়ারী।

সামান্য দর্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শেয়ালগুলো রোল তুলে সব পিছন পিছন ধায়,
হাতী চলে আপন মনে ফিরেও নাহি চায়।
পথের কাঁটায় ব্যথা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় হাতী,
শেয়াল ভাবে তাদের ঠেলায় লাগল বুঝি দাঁতি।

যদি-ই মেঘের ডাক শুনে সে চাহে পিছন পানে,
লেজ তুলে সব শেয়ালগুলো পালায় যে কোন্‌খানে।
হুক্কাহুয়া—হুক্কাহুয়া বিফল তবু নয়,
বনের বাকী শেয়ালগুলো উল্লাসে গায় জয়।

মাছ ধরার কৌশল

শ্রীআশা দেবী

নিধিরাম মুন্‌সি
পাঁয়তারা কষলেন—
"মাছ আজ ধরবই,
ভুরিভোজ করবই".
এই বলে পুকুরেতে
ছিপ নিয়ে বসলেন।

রুইমাছ ভাজা খাব
নিধিরাম হাসলেন ;

ছিপ ফেলে চার নিয়ে
লোকজনে সার দিয়ে
উৎসাহে ভরা প্রাণ
নিধিরাম কাশলেন।

মাছগুলো ভারি ঠ্যাঁটা
মনে মনে রুষলেন ;
বসে আছি ছিপ ফেলে
কোন ট্যাঁটা নাহি গেলে,
পাই যদি দেই জেলে
নিধিরাম তুষলেন।

ওই ওই ঘাই বুঝি !
নিধিরাম হাঁকলেন ;
জোর করে দিতে টান
মাচা ভেঙ্গে খান খান,
ঝুপ করে পড়ে গিয়ে
জলে তিনি থাকলেন

হায়—হায় হাঁকে সবে,—
নিধিরাম উঠলেন ;
ভুঁড়ির ভাঁজের ফাঁদে
দেড়মণী রুই কাঁদে,
তাই নিয়ে মহাসুখে
বাড়ী পানে ছুটলেন।

আত্মমর্যাদা

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

ডায়োজিনিসের মত পণ্ডিত জন্মে নি ম্যাসিডনে,
শুনলে তাঁহার অদ্ভুত কথা বিস্ময় জাগে মনে।
শহর অন্তে বনের প্রান্তে করতেন তিনি বাস,
একটি কাঠের টবের ভিতরে নিত্যই বারোমাস।
লোকে বলে তাঁর আসবাব সব তাও সে টবেতে থাকে,
সেকেন্দরের ইচ্ছা প্রবল দেখতে যাবেন তাঁকে।
"কারো সাথে তিনি ক'ন নাকো কথা—লোকটাই অদ্ভুত!"
এই মজাদার খবর জানাল ফিরে এসে রাজদূত।

কৌতুকবশে সেথা একদিন গেলেন সেকেন্দর,—
সঙ্গে তাঁহার শান্ত্রী, সেপাই আরো কত অনুচর।
রাজকীয় ছাঁদে ঘোষিল চারণ, "শুনুন হে পণ্ডিত!
আপনার দ্বারে ম্যাসিডন-রাজ স্বয়ং উপস্থিত।"
শুনেও ঘোষণা পণ্ডিত যেন পান না শুনতে কানে,
একবার শুধু মুখটি ফিরায়ে তাকান আকাশ-পানে।
তখন সরায়ে সেপাইশান্ত্রী, লোকজন, অনুচর,
পরিচয় দেন গ্রীক সম্রাট্, "আমিই সেকেন্দর।
এখন বলুন করতে কি পারি শুধু আপনার তরে?"
ঘাড়টি বেঁকিয়ে পণ্ডিত ক'ন মৃদু অবহেলা ভরে,
"আপাততঃ এই রোদটুকু ছেড়ে সরে দাঁড়ালেই বাঁচি,
এর চেয়ে বেশি চাই নে কিছুই,—দিব্যি এখানে আছি।"

নাম সার্থক

শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

হারাধন হার মানে ম্যারাথন রেসে,
কাশীনাথ শেষকালে মরে কেশে কেশে।
কালীময় রং কালো, নেই তাতে রাগ,
সুরমার চোখে দেখ সুর্‌মার দাগ
বনমালী হল শেষে বাগানের মালী,
আলের উপরে শোয় মনসুর আলি।
মিনতি সে কথা বলে নাকের সুরেতে,
ঝর্ণা যে ঝরে যায় চলে যেতে যেতে।
বাণীকণ্ঠ ভাঙ্গে গলা চেঁচিয়ে বলাতে,
মালা কার হার হয়ে ঝুল্‌লো গলাতে।
হংসধ্বজ বাবু পোষে বহু পাতিহাঁস,
বাতাসিয়া হাড়ে তার লাগাল বাতাস।
এই সব দেখেশুনে বলে যত লোক
হয়েছে এদের কিন্তু নামটা সার্থক।

কৈফিয়ৎ

শ্রীরাজারাম চৌধুরী

পূবের আকাশ রাঙা করে
সোনার থালায় সূর্য্য ওঠে,
শরৎ-প্রাতের শিউলি ফুলে
আগমনীর বার্ত্তা ছোটে।
ঢাকের বাদ্যে পূজার ধুম—
খুকুমণির ছুটল ঘুম।
মায়ের কাছে করে খোঁজ
পূজা কেন হয় না রোজ?

শঙ্খিনীর পাক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

তারিণী বাবু বললেন,—হুজুর, এ অঞ্চলে যে কাহিনীটা প্রচলিত আছে সেটা আপনার কাছে নিবেদন করছি।

এই শঙ্খিনী নদীর এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ ভাটিতে একখানা গ্রাম ছিল। ঘটনাটা যেদিনকার সেদিন দুপুরে ঐ গ্রামের সাধুচরণের ছোট ভাইয়ের ছেলে বৃন্দাবন ক্ষেত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে,—'শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির। পশ্চিম দিক্ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে।'

খবরটা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মত সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তারা পালাবে কোথায়? গ্রামের তিন দিক্ জুড়ে ক্ষেত ও মাঠ, একদিকে এই নদী শঙ্খিনী।

বর্গীরা আসছে ঘোড়ায়।

কয়েকজন গ্রামের বাইরে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে পশ্চিম দিক্‌টা লক্ষ করতে লাগল। হাঁ, ঐ—দূরে ধুলো উড়ছে। একজন সেখানে শুয়ে মাটিতে কান দিয়ে শুনলে। শব্দ হচ্ছে দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌। বোধ হয় একসঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী আসছে।

তারা আর কেউ দাঁড়াল না, 'পালাও পালাও—' বলে চীৎকার করতে করতে গ্রামের ভেতর ছুটল। সকলের একমাত্র ভরসা শঙ্খিনী নদী। নদীর ও-পারে কিছুদূরে খানিকটা জলা। তার চারধারে ঘন শরবন। নদীটা সাঁতরে পার হয়ে বনটার মধ্যে গা-ঢাকা দিলে প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে সময়ও লাগবে অনেক।

সকলে ঘর-বাড়ী ফেলে নদীর দিকে ছুটল। শিশু ও নারীরা ভয়ে কাঁদছে। বৃদ্ধেরাও প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লাগল। বর্গীরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ—কারুকেই নিষ্কৃতি দেয় না। তারা যদি কেবল যুবক ও প্রৌঢ়দের ওপর অত্যাচার করত! কি ঘোর অন্যায়!

দেখতে দেখতে শঙ্খিনীর তীরে ভয়ার্ত গ্রামবাসীদের ভীড় জমে গেল। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ও-পারের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পরাণও গেল তাদের সঙ্গে।

ঘাটে তিন-চারখানা ডিঙি ছিল। যাদের ডিঙি তারা আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে ডিঙিতে উঠে ও-পারে রওনা হ'ল।

সাধুচরণের মেয়ে ভবানী তখনও কাঁদছে। সাধুচরণ দেখলে, তাদের দু'জনের পালাবার উপায় নেই। এ বয়সে সে আর শঙ্খিনী সাঁতরে পার হ'তে পারবে না। ভবানী গ্রামের মেয়ে; সাঁতার জানে বটে কিন্তু নদী পার হবার শক্তি তার নেই। সিকি ভাগ গিয়েই সে তলিয়ে যাবে। পালাবারও শক্তি চাই।

সে ভবানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—'কাঁদিস নে। ভয় নেই, চল্ আমার সঙ্গে।'

তখনও অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তারা যখন দেখলে নদী পার হবার আর কোনই উপায় নেই তখন নদীর তীর ধ'রে ছুটতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায়? ক্ষেতগুলিতে তখন ধানগাছের ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে মাত্র। তারা আশ্রয় দিতে পারে না, নিজেরাই পায়ের তলায় প'ড়ে প্রাণ-ভিক্ষা করে।

ভবানীর এক হাত ধ'রে সাধুচরণ তাকে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। ভবানীরও মনে সাহস এল। সে আর এক হাতে চোখের জল মুছল।

যেতে যেতে সাধুচরণ বললে,—'আমি বুড়ো মানুষ, ওদের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করে নেব। কিন্তু ভয় তোর জন্য। তোকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। হয়তো আমার চোখের সামনেই তোকে কেটে ফেলবে, কি আগুন পোড়াবে।'

সাধুচরণের গলা ধরে এল। ভবানীর বয়স দশ বছর। দেখতে চমৎকার। সাধুচরণ ঠিক করেছিল, সেবারই বিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হ'ল।

বাপের কথাগুলো শুনতে শুনতে ভবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সাধুচরণ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল,—'কাঁদিস নে। তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব—'

ভবানী বললে,—'আর তুমি?'

'আমি কিছু দূরে বসে তোকে পাহারা দেব। ওরা চলে গেলে তোকে সেখান থেকে বার করে নেব। ঐ যে আমাদের বাড়ী।'

সেখান থেকে গ্রামের বাইরেটা দেখা যায়। সাধুচরণ ভবানীর হাত ধ'রে সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিক্‌টায় তাকিয়ে দেখতে লাগল। ধূ-ধূ করছে মাঠ। আর ঐ ধুলো উড়ছে, যেন কালো মেঘ!

সে ভবানীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে বললে,—'তুই এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।'

ভবানী বাপের কথামত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুচরণ বড় ঘরখানার বারান্দায় উঠে গেল। একধারে একখানা কোদাল ছিল। সাধুচরণ সেখানা হাতে নিয়ে উঠোন দিয়ে ঘরের পিছনে বাগানের দিকে চলে গেল। তারপরই সে শুনতে পেল মাটি কাটার শব্দ হচ্ছে—ধপ্‌—ধপ্‌।

কিছুক্ষণ পরে সাধুচরণ ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রান্নাঘরে উঠে গেল। তারপর চালশুদ্ধ বড় ডোলটা মেঝেতে উপুড় করে ফেলে সেটা খালি ক'রে টানতে টানতে উঠোনে নামিয়ে ভবানীকে বললে,—'আয় আমার সঙ্গে।'

ভবানী তার পিছন পিছন গিয়ে দেখে, ঘর থেকে হাত চার-পাঁচ দূরে যে গর্তটা ছিল সাধুচরণ সেটাকে কোদাল দিয়ে কেটে আরও বড় ও আরও গভীর করেছে।

সাধুচরণ গর্তের ধারে এসে বললে,—'এইখানে দাঁড়া। ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' ব'লেই সে ডোলটা গর্তর মধ্যে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করলে,—'এটা দিয়ে কি করবে?'

'তোর ঘর। ভয় নেই। তুই শীগ্‌গির ওর মধ্যে নেমে গিয়ে ব'স্‌। আমি দু'খানা তক্তা আনছি। যা—শীগ্‌গির। ঐ শব্দ

শোনা যাচ্ছে।' বলতে বলতে সাধুচরণ ভবানীকে হাত ধ'রে টেনে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিলে।

ভবানী ডোলটার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাধুচরণ ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'খানা তক্তা এনে বললে,—'ব'স্ ব'স্, ভয় নেই। আমি তোর বাপ। তুই আমার বড় আদরের জিনিস। আমার আর কেউ নেই। ডাকাতগুলোর কাছ থেকে লুকিয়ে না রাখলে আবার তোকে তুলে নেবে। ব'স্ -ব'স্ -'

বর্গীবাহিনী তখন মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা দিয়েছে।

ভবানী ভয়ে ডোলটার মধ্যে জড়সড় হয়ে বসতেই সাধুচরণ ডোলের মুখ তক্তা দু'খানা দিয়ে বন্ধ করে দিলে। কেবল বাতাস যাবার জন্য আঙ্গুল চারেক ফাঁক রইল। তারপর সাধুচরণ সেই তক্তা দু'খানার ওপর ক্ষিপ্র হাতে মাটি চাপা দিতে লাগল, আর তক্তার ফাঁকে মুখ রেখে মাঝে মাঝে বলতে লাগল,—'নড়িস্ নে, শব্দ করিস্ নে।'

মাটি দেওয়া হয়ে গেলে চারপাশ থেকে শুক্‌নো ডালপালা কুড়িয়ে এনে সাধুচরণ সেগুলোকে মাটির ওপর চাপা দিলে। তারপর তক্তার ফাঁক-বরাবর মুখ রেখে বললে,—'ভবানী, ভয় নেই। ওরা চলে গেলেই তোকে তুলব। আমি কাছেই রইলাম।'

মাটির নীচে থেকে চাপা আওয়াজ উঠ্‌ল,—'আমাকে শীগ্‌গির তুলে নিও বাবা!'

'আচ্ছা—' বলেই সাধুচরণ কোদালখানা বাগানের কোণে ঝাঁট-জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে হাত-পা ধুয়ে, গামছা দিয়ে মুছে, ঘরে ঢুকে কাপড়-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তার একটু পরেই বর্গীবাহিনী গ্রামে এসে ঢুকল। জনশূন্য গ্রামে বর্গীরা বাড়ীতে বাড়ীতে ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। জিনিসপত্র উল্টে, বাসন-তৈজস ও সিন্ধুক-চৌকি ভেঙে, গোলা-মরাই কেটে, কাপড়-বিছানা ছিঁড়ে, শস্য ছড়িয়ে, জায়গায় জায়গায় মাটি খুঁড়ে, নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল। জন চারেক সাধুচরণের ঘরে ঢুক্‌ল।

একজন বিনা বাক্যব্যয়ে বর্শার আগা দিয়ে তার গা থেকে কাপড়খানা তুলে নিল। একজন তার কাঁধে তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে বললে,—'রূপেয়া—'

সাধুচরণের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে তবুও শুয়ে শুয়ে হাতযোড় ক'রে বললে,—'বাবারা, বুড়োমানুষ আমি। বড় অসুস্থ। আমার কিছুই নেই—।'

বর্গীরা তবুও কথা শোনে না; তারা দয়া-মায়াহীন। একজন সাধুচরণের পাঁজরায় বর্শার একটা খোঁচা দিয়ে চড়া-গলায় বললে,—'রূপেয়া—'

আর একজন সাধুচরণের যন্ত্রণা আর না বাড়িয়ে তলোয়ারের এক কোপে মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। বাকী সকলে হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর তারা সাধুচরণের ঘরখানা বেশ ভালো করে খুঁজে বেরিয়ে এল। কোথাও কিছু পেল না। সেই সময় বর্গীবাহিনীর অধিনায়কের তূর্য গম্ভীর শব্দে বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ বর্গীরা ঘোড়ায় উঠে মশাল জ্বালিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সাপের মত ফণা তুলে অগ্নিশিখা ঘরের চালে চালে নাচতে লাগল। বর্গীরাও আর দাঁড়াল না, শঙ্খিনীর তীর ধ'রে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। সেদিকে যারা পালিয়েছিল, বর্গীরা তাদেরও রেহাই দিল না, সকলকেই হত্যা করল।

এদিকে সারা গ্রাম পুড়ছে। ধোঁয়ায় আকাশ কালো। হঠাৎ চাল থেকে এক লাফে ভবানীর গর্তটার মুখে শুক্‌নো ডালপালার ওপর পড়ে আগুনটা চারধারে ছড়িয়ে গেল। ভবানী সেই সময়ে ভয়ে আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠল,—'বাবা গো, আমায় তুলে নাও। ও বাবা—বাবা গো—!'

সাধুচরণের দেহটি তখন পুড়ছে।

ভবানীর শেষ ডাকটি মিলাতে না মিলাতে তার পাশের ঘরখানার জ্বলন্ত চাল গর্তটার ওপর ভেঙে প'ড়ে শব্দটাকে যেন মাটির সঙ্গে চেপে ধরল।

এই ঘটনা প্রায় দু'শ বছর আগেকার। শঙ্খিনীও পথ বদ্‌লে সেই গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে এবং সেখানে একটি বড় পাক দেখা যায়। যে সব নৌকো নিশীথ রাতে ঐখান দিয়ে যায় তাদের দাঁড়ি-মাঝিরা শুনতে পায়, পাকের মধ্যে থেকে যেন শব্দ উঠছে—'বাবা গো, আমায় তুলে নাও। ও বাবা—বাবা গো— !'

এই শব্দ আমিও শুনেছি।

শেষের শব্দটা অবশ্য স্পষ্ট হয় না, জলধারার শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। এই কারণে একটু রাত হলেই শঙ্খিনীর পাকের পাশ দিয়ে কোন নৌকো যেতে চায় না।

এখন মাঝিদের ওপর আপনার যা হুকুম হয়।"

বললাম,—"অগত্যা রাতটা এখানেই কাটাব।"

তারিণী বাবুরা আমার কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু খুসী হলেন কি না বলতে পারি না। সে রাতে চোখের পাতা দু'টো একবারও বন্ধ করতে পারলাম না ; শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম —"সত্যিই কি ঐ পাকের নীচে আজও ভবানীর দেহাবশেষ আছে ?"

বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের সামর্থ্য আছে, অন্তর্জ্ঞান আছে, এইসব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ

ডাকু
শৈল চক্রবর্তী

ছোটদের রেস্তোঁরা
সস্তা দর
ভাল খাবার
'ভালর একটুও ভাল'

একটা কাটলেট চাই !

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি!

কাটতে হলে আগেত চোখে দেখতে হবে !

পাখী-ধরা

শ্রীসুকুমার দে সরকার

মনুভাই একজন জিওলজিষ্ট। লোকটা একদিন শিকারী ছিল। আজ সে শুধু শিকার করে বন্দুকের বদলে ক্যামেরা দিয়ে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, উপত্যকায়, মালভূমিতে তার অনেক গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত কেটে গেছে।

সেবার তাকে যেতে হয়েছিল লাইমষ্টোন, মানে চুণে-পাহাড় খোঁজ করতে মধ্যপ্রদেশের একটা পাহাড়ী বনে। পিঠে তার বিলিতী থলিটায় নিয়মমাফিক যন্ত্রপাতি, শুকনো খাবার আর কাপড়চোপড় বাঁধা ছিল তো বটেই, তার ওপর হাতে তার রাইফেল আর বুকে একটা মুভি ক্যামেরা ঝোলানো ছিল।

জঙ্গলটায় মিষ্টি ছায়া। পৃথিবী সেখানে, কোনও বিস্মৃত যুগের আদিম আগ্নেয় ভূমিকম্পে, পাগলা নেচে নেচে পাহাড় হয়ে গেছে। একটু নীচে তাকালে সবুজ হীরের মত রোদ-ঝলসানো বন ঝিম্ ঝিম্ করতে করতে দূর দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে—যেখানে সাতপুরা পর্বতমালা রিলে রেস করে এসে বিন্ধ্য পাহাড়শ্রেণীকে ছুঁয়ে গেছে।

মরকত মণি রঙের একটা পাখী ঢেউ খেলিয়ে উড়ে চলে গেল। যেতে যেতে যেন শিকারীকে ঠাট্টা করে বলে উঠল,—তুয়ো, তুয়ো। মনুভাই রাইফেলটা পিঠে ফেলে মুভি ক্যামেরা চোখে দিয়ে দাঁড়াল। রাইফেলটা আত্মরক্ষার অস্ত্র শুধু আজ। শিকারী সে, একদিন অনেক মেরেছে। আজ শুধু শিকার তার মুভি ক্যামেরা দিয়ে।

পাখীটাকে ক্যামেরার চোখে পেল না মনুভাই। উড়ে গেল। উড়ন্ত পাখীর পাখা আর মাটির মানুষের ক্ষিপ্রতায় অনেক তফাৎ আছে যে।

হঠাৎ মনুভাইয়ের মনে হলো, কে যেন অদৃশ্য ভাবে তাকে দেখছে।

কোথায় কে? বাঘ নয় তো? কই, কোথাও কেউ নেই তো। মনের ভুল হলো কি? কিন্তু মনুভাই স্পষ্ট অনুভব করেছিল, যেন একজোড়া চোখ তার পিঠের দিকে তাক করে আছে। জীবনের এইসব না-জানা, জানাও বা, অনুভূতি অনেকবার তার জীবন বাঁচিয়েছে।

ভুলই হবে,—ভাবল মনুভাই।

পাকদণ্ডী পথ নেমে গেছে টিলায় টিলায়। মহুয়া, কুর্চি, শাল, পিয়াশাল, বাদাম আর সেগুন গাছ ভয়ে-নির্ভয়ে নীল মহাশূন্যে মাথা তুলে দিয়েছে। হঠাৎ, বুনো সবুজের ভেতর, আগুন ধরে গেছে বনে। লালে লাল। শিমুল ফুটেছে। মোটা মোটা লাল পাপড়িগুলো যেন সজীব জোয়ান হাসিমুখ।

আর ঠিক সেই সময় মহারাজ তার লঙ্গুর বাঁদরের দল নিয়ে হুপ হাপ করে, গাছের শাখায় দুলতে দুলতে শিমুল গাছটার মাথায় এসে গেল।

লঙ্গুর বাঁদরদের লাফ, যেন লাফান নয় তো ওড়া,—একটা ডাল ছুঁতে না ছুঁতেই ডিগবাজী খেয়ে আর এক লাফ। ল্যাজগুলো নৌকোর হালের মত, এদিক্ ওদিক্ স'রে বাতাসে দিক্ ঠিক করে নিচ্ছে।

মহারাজ বাঁদরটার দেখবার মত চেহারা বটে! দেশী লোকেরা গোদা লঙ্গুরদের মহারাজ বলে। এই দলের গোদা লঙ্গুরটা যেন সত্যিই মহারাজ। প্রকাণ্ড গড়ন, গায়ে কদম ফুলের রোঁয়ার মত সাদা সাদা লোম, জোয়ান কাঁধ। আর গলাটা ঘিরে সাদা সাদা লোমের ওপর গোল করে একফালি পাঁশুটে ডোরা। ঠিক যেন মায়ের হাতে জড়ানো একটা কমফর্টার। মহারাজের মুখখানা যেমন টুকটুকে, কুচকুচে কালো, তেমনি ফুর্তিবাজ।

শিমুল ফুল লঙ্গুরদের প্রিয় খাদ্য। মহারাজ তাই দলকে নিয়ে এসেছিল ফুটন্ত ফুলের লোভে।

মনুভাই তার মুভি ক্যামেরাটা চোখে তুলে মোটর চালিয়ে দিল। এমন উড়ন্ত লঙ্গুরদের ছবি নিতে হবে বৈকি! কিন্তু অভিজ্ঞ দলপতি মহারাজ, সেই একটু অস্বাভাবিক কিং কিং আওয়াজটাও তার কান এড়ালো না। একটা সাবধানী ডাক ডেকে উঠল মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে, লাফাতে লাফাতে, উড়তে উড়তেই যেন লঙ্গুরেরা গাছের ডালে ডালে মিলিয়ে যেতে লাগল। শুধু মহারাজ হঠাৎ শূন্যে তার লাফটা ঘুরিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, অদ্ভুত একটা আক্রমণের মুখভঙ্গী করে তেড়ে এল মনুভাইয়ের দিকে।

দলপতি সে, দলকে বাঁচান তার দায়িত্ব।

মনুভাই নিমেষে ক্যামেরা বন্ধ করে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল।

"খবরদার!"

পেছনে কড়া আওয়াজ শুনে চমকে উঠল মনুভাই, আর সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

ও মা! মোটা একটা কালো কালচে দেহাতী বুনো লোক! লোকটার পরনে হাঁটু অবধি কাপড়, গায়ে ফতুয়া গোছের একটা রঙীন হাতকাটা জামা, আর পায়ে কাঁচা চামড়ার একজোড়া শুঁড়-তোলা প্রকাণ্ড নাগরাই জুতো! ও হোঃ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম,—লোকটার মুখে একজোড়া গালপাট্টা প্রচণ্ড মেরজাই গোঁফ আর হাতে তার সরু একটা লম্বা পাকা বাঁশ।

"মহারাজকে মারছিলে বাবুজী?"

"তোমার কি?" মনুভাইয়ের রাগ হয়ে গিয়েছিল।

লোকটার গালপাট্টা গোঁফজোড়া নেচে উঠল—"বাবুজী, বান্দর মেরে খাবে?"

মনুভাই বলে উঠল, "দূর, বাঁদর আবার খাওয়া যায় নাকি?"

"তবে মারছিলে কেন?"

মনুভাই তখনও রেগে আছে, "মারলেই কি খেতে হবে নাকি?"

লোকটার গোঁফজোড়া আবার খুশীতে নেচে উঠল, "ঠিক বাৎ বাবুজী! কিন্তু না খেলে মারবে কেন?"

মনুভাই থমকে গিয়ে বলল, "আমি ওই গোদা বান্দরটাকে মারি নি তো, ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

লোকটা চোখে চোখ রেখে বলল, "তুমি ভয় পেয়েছিলে বুঝি?"

মনুভাই বলল, "জঙ্গলের বুনো জানোয়ার তেড়ে এলে একটু ভয় করে বৈকি! আমি শুধু তস্‌বীর উঠাই, জানোয়ার মারি না। তা বলে মরতেও ভয় পাই না কিন্তু।"

নিমেষে লোকটা তার হাতের সেই প্রকাণ্ড বাঁশটা ঘুরিয়ে, প্রায় মনুভাইয়ের মাথাটা লক্ষ্য করে, এক ঘা চালিয়ে দিল। আর বিদ্যুতের মত মনুভাই মাটিতে শুয়ে পড়তে পড়তে কেঁচোর মত গা হেলিয়ে, সামলে, রাইফেলটার ঘোড়া টিপে দিল।

লোকটার লাঠি মনুভাইয়ের মাথা এড়িয়ে গেল। মনুভাইয়ের গুলি লোকটার মাথা ঘেঁষে চলে গেল। এইবারে মনুভাই গর্জ্জে উঠল, "খবরদার!"

রাইফেলটা তার লোকটার বুকের ওপর তাগ করা ছিল।

বাঁশটা ফেলে দিয়ে লোকটা গালপাট্টা গোঁফ কাঁপিয়ে হেসে উঠল হো-হো করে। তার পরে বলল, "তুম কৌন হো? তুমি কে বাবুজী?"

মনুভাইয়ের তখন রাগ চড়ে গেছে। মনুভাই বলল, তুমি কে হে?"

"পাখী-ধরা।"

"তার মানে? তুমি পাখী ধরো?"

"হাঁ, হাঁ, বাবুজী!"

"পাখী ধরো, না মারো? অত বড় বাঁশটা দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে পাখীও মারা যায়, গাছের ফলও পাড়া যায় আর মানুষের মাথাও ফাটান যায়।" একটু থেমে আবার মনুভাই বলল, "তুমি তো প্রায় আমার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছিলে। তুমি তো একটা ডাকু।"

"না বাবজী!"

"না মানে? আমাকে মারতে চাও নি?"

"না বাবুজী! মারতে চাইলে আমার হাত ফসকাতো না। তেমনি তুমিও তো গুলি করেছিলে আমাকে মারবার জন্যে। মারবার ইচ্ছে থাকলে তোমারও গুলি কি ফসকাতো? একটু দেখছিলাম বাবুজী! বনের ভেতর হঠাৎ কোন্ দিক্ থেকে চোট আসবে কেউ বলতে পারে না। আমরা বুনো মানুষ। বনে থেকেই বেঁচে থাকি। এই যে সরু বাঁশ দেখছ, এর ওপর আঠা মাখিয়ে পাখী ধরি,—জীয়ন্ত পাখী। মৌ জোগাড় করি বাবুজী! খুঁজে দেখি কোথায় মৌমাছিরা চাক বেঁধেছে। এই বাঁশের ডগায় আগুন জ্বেলে মাছি তাড়িয়ে, চাক ভেঙ্গে আনি। খুব সহজ কাজ বাবুজী?"

মনুভাই ভাবতে থাকে, উত্তর দেয় না।

লোকটা বলে চলে, "মাছির কামড়ে কামড়ে কখনও কখনও সমস্ত বদন্ (মানে শরীর) ফুলে যায়। কিন্তু বাবুজী, সব চেয়ে ভয় হলো কালা শের। আমার মন যখন পাখী ধরতে কিংবা মধুর চাক ভাঙ্গতে তৈরী আছে তখন ওই কালো বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে। বড় হুঁশিয়ার হয়ে তৈরী হতে হয় বাবুজী! আর হাতের লাঠিটাও তৈরী রাখতে হয়।"

মনুভাই হেসে বলল, "তাই বুঝি আমাকে শের মনে করে লাঠিটা চালিয়েছিলে?"

"না বাবুজী! আমি দেখছিলাম হঠাৎ চোট থেকে তুমি কতটা সাবধান থাকো!"

"কি দেখলে?"

"তুমি হুঁশিয়ার লোক বাবুজী! কিন্তু কালা শের আউর ভি চালাক। তুমি খাওয়ার জন্যে মারো না, কিন্তু কালা শের তো খাওয়ার জন্যেই মারে। তাই তো আমরা মহারাজকে আগলে রাখি। মহারাজ গাছের ডাল থেকে কালা শেরকে দেখলেই দাঁত্ কিচ্‌মিচ্ করে আগে থেকে আমাদের জানিয়ে দেয় যে বিপদ্ আসছে। আমরা ভয় করি কালা শেরকে আর সর্পরাজকে।"

মনুভাই বলল, "এই বনে কি বাঘ আছে নাকি? আর সর্পরাজ কি বলছ?"

"হাঁ বাবুজী, বাঘও আছে। আর সর্পরাজ? তোমায় কি বোঝাব? ইয়া মোটা, একটা অশত্থ্ গাছের ডালের মত। চুপ্ চাপ তোমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে জড়িয়ে, পেঁচিয়ে তোমার দম বন্ধ করে পিষে ফেলবে।"

মনুভাই হেসে বলল, "ভয় দেখাচ্ছ?"

গালপাট্টা গোঁফ কাঁপিয়ে হেসে লোকটা বলল, "তুমি কি ভয় পাবার লোক বাবুজী?"

"তোমার নাম কি?" —মনুভাই বলল।

এক মিনিট চুপ করে থেকে লোকটা বলল, "আমার নাম চান্দ সর্দার। তোমার নাম কি বাবুজী?"

"লোকে বলে মনুভাই।"

মনুভাই গিয়েছিল চান্দ সর্দারের সঙ্গে পাখী ধরা দেখতে। ঢেউ খেলান উঁচুনীচু পাহাড়ে জমি, দূর থেকে ভেসে আসে জলপ্রপাতের আওয়াজ। বনের সবুজ চাঁদোয়া ভেদ করে মাঝে মাঝে নীল আকাশ উঁকি দেয়। মাঝে মাঝে পাল-তোলা মেঘ পাখীদের বুনো ভাটিয়ালি গান শুনতে শুনতে ভেসে যায়।

চমকে দাঁড়াল মনুভাই। "কি একটা বিদ্যুতের মত চলে গেল না?"

"কোথায়?" চান্দ রুখে দাঁড়িয়ে বলল।

"ওই যেন কালো বনের ভেতরে ভেতরে!"

তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে দেখে, গালপাট্টা গোঁফজোড়া নাচিয়ে হো হো করে হেসে চান্দ সর্দার বলল, "বাবুজী আজ চঞ্চল আছে। ওটা তো একটা বন-তিতির পাখী! বড় হুঁশিয়ার পাখী। বাবুজী, আর কি, জোলুস! সারা বনের ভেতর পেখম-ধরা ময়ূর পঞ্ছি ভি ওর কাছে রূপে আউর রঙে হেরে যাবে। ওকেই তো ধরবার জন্ত আমি তিন সাল ঘুরছি।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বনের আকাশের ফাঁকে ফাঁকে ইন্দ্রধনু রঙ ঝলসিয়ে উড়ে চলে গেল বন-তিতিরটা। মনুভাই মুভি ক্যামেরাটা চোখে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল।

"খবরদার বাবুজী, সাবধান হও!" চান্দ সর্দার হেঁকে উঠল। পাখীটা উড়ে গেছে।

"খবরদার! খবরদার বাবুজী! বাতাসে বু আসছে।" মানে বাতাসে একটা গন্ধ আসছে।

মনুভাই ক্যামেরায় টেলিফোটো জুম লেন্সটা লাগাতে লাগাতে বলল, "ওই যে পাখীটা সেগুনের উঁচু ডালে বসেছে। অদ্ভুত ছবি হবে।"

"বাবুজী!" চান্দ সর্দার চাপা গলায় বলে উঠল, "ওই দেখ, মহারাজের দল পালাচ্ছে। বিপদ্ আসছে বাবুজী!"

"আর একটু।" মনুভাইয়ের মন তখন শিকারে। আর ঠিক সেই সময় গাছের আলো-ছায়ার ভেতর থেকে আক্রমণ করল কালো বাঘ।

কোথা থেকে যেন একটা কালো বিদ্যুৎ এঁকেবেঁকে চকিতে চমকে ঝাঁপিয়ে এল। কোনো অজানা অনুভূতি থেকে মনুভাই গড়িয়ে গিয়েছিল। বাঘের নখে তার পিঠের জামাটা ফালা ফালা হয়ে গেল।

ততক্ষণে চান্দ সর্দারের বাঁশটা বাঘের পিঠে পড়েছে। চান্দ চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ইয়া বদমাস!"

একটা হাড়-কাঁপানো গর্জন। বাঘটা বাঁশের তলা থেকে পিছলে ঘুরে লাফিয়ে পড়ল চান্দ সর্দারের ঘাড়ে।

এর পর দেখা গেল রক্তমাখা দেহে একটা লোককে ঘাড়ে করে মনুভাই চলেছে সহরের দিকে।

বন-তিতির উড়ে গেছে। গাছের মগডালে পাতায় পাতায় লঙ্গুরেরা মিশিয়ে দিয়েছে নিজেদের। সজীব জোয়ান রাঙাপাখা শিমুল ফুল সবুজ আকাশে তখনও হেসে চলেছে নির্বিকার।

বর্মার দাদামশাই

রবিবার ; ইস্কুল ছিল না। 'হাফ্-এ-ডজন' মামার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম বাজার করতে। 'হাফ্-এ-ডজন' মানে ছ'জন মামা নয়। মামা একটিই ; ওটা তাঁর একটা বিশেষণ। মধ্যপ্রদেশের কোন এক রাজ-এষ্টেটে মামা বড়দরের চাকুরে। সেখানে শালবনের মধ্যে কোন জিনিষই পাওয়া যায় না। সেইজন্য ফি বছর শীতকালে মামা কলকাতা এসে বছরের মত বাজার করেন। তাঁর নিয়ম হচ্ছে, যা কিছু কিনবেন—জুতো, জামা, ছাতা, ঘড়ি—সব অন্ততঃ হাফ্-এ-ডজন। কোন ক্ষেত্রেই এ নিয়মের নড়চড় চলবে না। মামীমার একদিন চালকুমড়ো খাবার সাধ হ'য়েছিল ; মামাকে জানাতেই হাফ্-এ-ডজন বড় বড় চালকুমড়ো চ'লে এল। আর একবার সংসারের জন্য শীল-নোড়া আর বঁটি কেনার দরকার হয়েছিল ; পরদিনই বাজার থেকে হাফ্-এ-ডজন শীল-নোড়া আর হাফ্-এ-ডজন বঁটি এসে হাজির।

এবার হল্ অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের দোকানে মামার জুতোর অর্ডার ছিল। ছ' জোড়া জুতো পছন্দ করে প্যাকিংএর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় তাকিয়ে দেখি ওদিকের একটা চেয়ারে আমাদের সুধীর—একটা বেশ দামী জুতো পায়ে ঢোকাচ্ছে। সঙ্গে তার বাবাও আছেন। প্রথমেই মনে হ'ল ভুল দেখছি। সুধীরের বাবাকে আমরা চিনি তো! সেবার সরস্বতী পুজোর জন্য চার আনা চাঁদা আদায় করতে চার দিন হাঁটাহাঁটির পর পাওয়া গেল পাঁচ পয়সা, এবং সেই সঙ্গে দু'চারটে কথা, যা শোনবার পরে বাকী এগার পয়সার দুরাশা আর রাখি নি।

সেই ভদ্রলোক জুতো কিনতে ঠনঠনে কিংবা চীনে-বাড়ী না গিয়ে এসেছেন সাহেব-বাড়ী! কাছে গিয়ে দেখব ভাবছি, এমন সময় সুধীর নিজেই এগিয়ে এল। হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স ; ভেতরে, বললে, সুট্—র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীতে তৈরী।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি রে ?'

সুধীরের মুখ উজ্জ্বল ; বললে, 'শুনিস্ নি বুঝি ? বর্মার দাদামশাই এসেছেন যে ! দেখা করতে যেতে হবে।'

এক কথায়ই সব বোঝা গেল। এই বর্মার দাদামশায়টির নাম অন্ততঃ পঁচিশবার শোনে নি এমন লোক সুধীরের পরিচিত-মহলে নেই। এঁকে আমরা দেখি নি, কিন্তু তৈমুর লঙ বা ভাস্কো-ডি-গামার মত এঁর ইতিহাস আমাদের কণ্ঠস্থ। বর্মায় কোন সহরে কিসের ব্যবসা করে কত লাখ টাকা তিনি জমিয়েছেন, সব এক নিঃশ্বাসে ব'লে দিতে পারি। এই লাখপতি দাদামশায়ের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সুধীর—কেননা তাঁর আর কেউ কোথাও নেই। সুধীর এ কথা অনেক দিন আমাদের শুনিয়েছে। সেজন্য পরীক্ষায় বার বার ফেল ক'রেও দমে যায় নি। পণ্ডিত মশায়কে আশ্বাস দিয়েছে যে সম্পত্তিটা পেলেই তাঁকে নিজের বাড়ীতে একটা টোল ক'রে দেবে। এর পর থেকে পণ্ডিত মশায় আর কোন গোলমাল করেন নি।

বল্লাম, 'তোর দাদামশায় কোথায় উঠলেন। তোদের বাড়ীতে ?'

সুধীর চোখ কপালে তুলে বললে, 'বলিস্ কি ? আমাদের বাড়ী ! অত বড় সাহেব মানুষ ? উঠেছেন বালীগঞ্জে। বাবা বল্লেন, প্রথম দিন একটা ভালো সুট পরে যাওয়াই ভালো। তা না হ'লে হয়তো চটেই যাবেন। সাহেব-সুবোর মেজাজ তো, বলা যায় না !'

পরদিন ইস্কুলে সুধীরের দেখা পাওয়া গেল না। ছুটীর পর বাড়ী ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ছি, নিধে চাকর এসে বললে, 'একটি সাহেব বাবু এসেছেন দেখা করতে। তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি—সুধীর। পায়ের নখ থেকে মাথার ডগা পর্যন্ত নিখুঁৎ সাহেবী পোষাকে মোড়া।

বললাম, 'হ্যালো মিষ্টার রয়, আই অ্যাম্ সো গ্ল্যাড্'।

'থাম্, থাম্, চল্ বেরিয়ে পড়ি।'

'বেরোবো ! কোথায় ?'

'কেন, দাদামশায়ের বাড়ী !'

'সর্বনাশ ! সেখানে আমি কি করব ?"

ীর অনুনয় করে বললে, 'না ভাই, চল্। আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না। যদি ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন, একটু সাহায্য করবি। আমার ইংরেজী-জ্ঞান তো জানিস্?'

'কিন্তু আমার যে সুট নেই!'

'সুট নেই? তা আর কি হবে? তুই পেছনে থাকিস্‌'খন।'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। যেতে হ'ল। বাড়ীর নম্বর ছিল, খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। একটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, 'মিষ্টার রসরাজ রয়ের বাড়ীটা জানেন? এ পাড়ায় নতুন এসেছেন বর্মা থেকে।'

ভদ্রলোক একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'ঐ সাদা পাঁচীল। একটু সাবধানে ঢুকবেন।'

সুধীর রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছে কোট-হ্যাট সব ঠিকঠাক করে নিলে।

বাড়ীর ভিতর থেকে খোল-করতালের আওয়াজ কানে এল। সাহেবের বাড়ীতে খোল! সুধীর বললে, 'লোকটা গাঁজা খায়, এ বাড়ী হতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'তবু যখন এত দূর এসেছি, একবার ঢুঁ মেরেই দেখা যাক্।'

ভেতরে ঢুকতেই উঠোন। সেখানে কীর্তনের আসর বসেছে। আমাদের দেখে একটি বাবাজী গোছের লোক এগিয়ে এল,—'কি চাই?'

'মিষ্টার রসরাজ রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনারা কারা?'

'আপনি চিনবেন না। উনি এ বাড়ীতে থাকেন কি?'

'থাকেন। কিন্তু এখন দেখা হবে না।'

'আচ্ছা, সে আমি বুঝব' বলে সুধীর গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে গেল। আমিও সঙ্গ নিলাম। তিন-চারজন বাবাজী 'রা রা' করে ছুটে এল। তার আগেই আমরা সামনের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়েছি। ভীষণ

অন্ধকার, প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না। অনেকক্ষণ তাকাবার পর দেখলাম, ওদিকের কোণে একটা লোক ব'সে। খালি গা, মাথা ন্যাড়া, বুকভরা বড় বড় লোম, গলায় এক বোঝা তুলসীর মালা; পরনে আট হাত ধুতি। লোকটা এমনি রোগা যে চামড়ার ভেতর থেকে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে আসছে। ভাঙ্গা গলায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে—কে—কে তোরা? কি চাই এখানে?'

আমরা হ'টে এলাম। কে একজন লোক এসে আমাদের গায়ে মাথায় কিসের খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল। হায় রে র‍্যাঙ্কিনের স্যুট! তাদের হুকুমে জুতোও খুলতে হ'ল; তার উপরেও খানিকটা তুলসী-

ফুটবলের চাঁদা আমি···
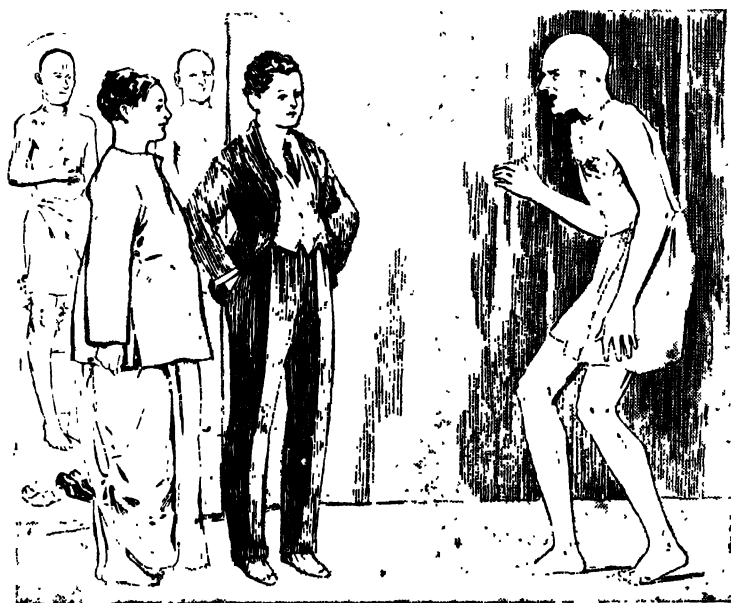
জল ঢেলে দিল। রোগা লোকটা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। সুধীর বললে, 'আমরা মিষ্টার রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই—মিষ্টার রসরাজ রয়।'

লোকটা মুখ ভেংচে বললে, 'আজ্ঞে আমিই সেই অধম।

মিষ্টার-ফিষ্টার নই, রয়-টয়ও নই। সোজাসুজি রসরাজ রায়। আপনাদের শুভাগমনের হেতুটা কি? ফুটবলের চাঁদা আমি দিই না।'

সুধীর বললে, 'আজ্ঞে সে জন্য আসি নি। আমি আপনার নাতি। বৃন্দাবন রায় মশায় আমার পিতা।'

'কোন্ বৃন্দাবন?'

'আপনার ভাইপো; উত্তরপাড়ায় ১৬নং—বসাক লেনের—'

'ওঃ, বেন্দা? তার ছেলে এমন বাঁদর হয়েছে? সাজটা তো দেখছি চমৎকার! একটা ল্যাজ লাগাও নি কেন? সুন্দর মানা'ত। তা এখানে কি মনে করে? সঙ্গে এটি কে?'

সুধীর একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম, এবং শীতের রাতে সেই ভিজে জামা-জুতো পরে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরলাম।

'দমে যাওয়া' কথাটা সুধীরের অভিধানে ছিল না। দিন সাতেক পরে রাস্তায় দেখা। চিনতেই পারি না। মাথাটা কামানো, পরনে গেরুয়া, গলায়, হাতে তুলসীর মালা, খালি পা। বললাম, 'ব্যাপার কি রে?'

সুধীর করুণ ভাবে বললে, 'এর মধ্যে আর একবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ফল সেদিনের মতই গলাধাক্কা। তবু হাল ছাড়তে পারছি না। চোখের উপর আমার মুখের গ্রাস ঐ সব ন্যাড়ামাথাগুলোর উদরস্থ হবে, কেমন করে সহ্য করি বল তো? তাই এই রাস্তা ধরলাম। তবে এইবারই শেষ। চল্ না···'

সুধীরকে এড়ানো যায় না। তা ছাড়া একটু কৌতূহলও ছিল। চললাম।

আজও কীর্তন হচ্ছিল। ভক্তবর রসরাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমি দরজার পাশে দাঁড়ালাম। সুধীর সোজা সেই দলের মধ্যে গিয়ে বস্‌ল। গানটা জমে উঠেছে; যে খোল বাজায় সে এত জোরে মাথা নাড়ছে, মনে হ'চ্ছে মাথাটা যে কোন সময়ে গলা

থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। হঠাৎ এক প্রলয় কাণ্ড! সুধীর লাফ দিয়ে উঠে ধপাস্ করে সটান মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে আকাশ ফাটিয়ে কান্না। সে কী আর্তনাদ। যেন তার একটা হাত বা পা কেউ কেটে নিয়ে গেছে! কীর্তন গেল থেমে; সবাই মিলে তাকে টেনে তুলল। রসরাজ বল্লেন, 'কি হয়েছে তোর, চেঁচাচ্ছিঁস্ কেন?'

সুধীর বুক চাপড়ে বললে, 'বুক ফেটে গেল প্রভু, বুক ফেটে গেল। শ্রীরাধার দুঃখ আর সইতে পারছি না। আমায় কৃপাকণা দিন।'

ভক্তের দল ছবির মত দাঁড়িয়ে; রসরাজ গম্ভীর ভাবে বসে; আর সুধীর শ্রীরাধার শোকে পাগল···। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলাম।

মাস তিনেক পরে দেখা। সুধীর বেচারা একেবারে আধখানা হয়ে গেছে। বললাম, 'করছিস কি? মরে যাবি যে!'

সুধীর বললে, 'আর কোন রকমে দিন পনেরো। বুড়োর হয়ে এসেছে। উইল্‌টা না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতেই হবে।'

'এখনও তেমনি হাউ হাউ করছিস প'ড়ে প'ড়ে?'

'নাঃ, ঐ একদিনের কান্নার চোটেই একেবারে প্রধান চেলা হয়ে গেছি। এখন সমস্ত কাজের ভার আমার ওপর। তামাক সাজা থেকে ওষুধ খাওয়ানো। যে রকম সেবা করছি, ঐ সিন্ধুক-বোঝাই কোম্পানীর কাগজগুলো আর কারুর ভাগে একখানাও পড়বে বলে মনে হয় না।'

তার পর একদিন শুনলাম, রসরাজ মারা গেছেন, অর্থাৎ দেহরক্ষা করেছেন। উইল্ তার আগেই হয়ে গিয়েছিল। উকিল ছাড়া আর কেউ এখনও জানে না। তবে সকলেই বুঝে নিয়েছিল প্রায় সমস্ত টাকাটা সুধীরকেই দেওয়া হয়েছে।

সেদিন উইল্ পড়া হবে। সুধীর এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ তার পায়ে পাম্প্-শু, পরনে জরিপাড় শান্তিপুরী, গায়ে মটকার পাঞ্জাবী। চেলার দল সব উপস্থিত। উকিল উইল্ প'ড়ে চলেছেন,

—'* * * যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বিগ্রহ মদনগোপালের সেবায় ব্যয়িত হইবে। শ্রীমান্ যাদব সেন তাহার সেবায়েত নিযুক্ত হইল। *** নগদ টাকা আর কোম্পানীর কাগজ নগেন, বিনোদ, ভজুয়া এবং রামাচলম্ সমান ভাগে পাইবে।

সুধীর অধীর হয়ে উঠেছিল। আর থাকতে না পেরে মাঝখানেই বলে উঠল, 'আর আমি?'

উকিল বল্লেন, 'আপনার কথাও আছে; শুনুন ঃ

'আমার প্রিয়তম শিষ্য সুধীরকুমার মহাপুরুষ; তাহাকে তুচ্ছ সম্পদের মায়ায় আবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহি না। তাহাকে আমার আশীর্বাদ আর নামকীর্তনের জন্য আমার একতারাটি দিয়া যাইতেছি।...'

সুধীর লাফিয়ে, চেঁচিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। 'আমি দেখে নেব, দেখে নেব...ভণ্ড, জোচ্চোর, পাজি শুঁটকো বুড়ো।'

সেদিন অতি কষ্টে তিন জনে মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

পৃথিবীতে ভালো করবার ভার যে কেউ নিজের উপর নিয়েছে, চিরদিনই তার শত্রুসংখ্যা বেড়ে উঠেছে।

—শরৎচন্দ্র

আশ্চর্য ধাতু টাইটানিয়াম

শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী

প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা। মেনাকানের কোনও এক জায়গায় রেভারেণ্ড উইলিয়ম গ্রিগর নামে একজন কৌতূহলী পাদ্রী সাহেব কতকগুলো কালো কালো বালির মতো খনিজ পদার্থ দেখতে পেলেন। পাদ্রী হলে কি হয়, আসলে সাহেবটির সখ ছিল ভারী মজার। হয়তো রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, সামনে চোখে পড়ল কতকগুলো নতুন ধরণের নুড়ি বা পাথর। ব্যস্, আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটাকে তাঁর কোটের পকেটে চালান করে দেবেন। এই ভাবে বহু পাথর, নুড়ি ও নানারকম খনিজ পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি হয়ে উঠলেন তখনকার দিনের একজন সেরা মিনেরোলজিষ্ট,—বাংলায় আমরা যাকে বলি খনিজ পদার্থবিদ্। মেনাকালের কালো কালো বালির মতো জিনিষটাকে দেখেই তিনি বুঝলেন যে সেটি সাধারণ খনিজ বস্তু নয়। অনেক গবেষণা করার পর এর থেকে তিনি একটা নতুন ধাতুর অক্সাইড বার করে তার নাম দিলেন—মেনাকানাইট।

এর চার বছর পরে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্লাপ্রথ একটা নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন। গ্রীক পুরাণের টাইটান থেকে তিনি এর নামকরণ করলেন—টাইটানিয়াম। কিছুদিন বাদে ক্লাপ্রথ তাঁর আবিষ্কার করা নতুন ধাতুটার সাথে রেভারেণ্ড গ্রেগরের আবিষ্কৃত মেনাকানাইটের তুলনা করতে গিয়ে দেখলেন, অবাক্ কাণ্ড। দুটোর মধ্যে একই রকম ধাতু পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্লাপ্রথের দেওয়া ধাতুটার নাম টাইটানিয়ামই লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো, আর আস্তে আস্তে মেনাকাইটের কথা ভুলে গেল

টাইটানিয়াম ধাতু আবিষ্কার হয়েছিল ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এই আবিষ্কারের একশো বছরের মধ্যেও বিজ্ঞানীরা একে কোনও কাজে লাগান নি। কেন ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

• টাইটানিয়াম অন্য আর পাঁচটা ধাতুর থেকে একেবারে আলাদা। এর গলনাংক হচ্ছে ১৬৮০° সেন্টিগ্রেড; ঘনত্বও কম এবং, সব চাইতে বড় কথা, এর খুব উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করবার ক্ষমতা আছে।

আজকাল জেট ইঞ্জিন তৈরি করতে গেলে টাইটানিয়াম না হলে চলে না। টাইটানিয়ামের ওজন ও শক্তির অনুপাত খুব কম বলে এটা দিয়ে ইঞ্জিন তৈরি করতে সুবিধা হয়। জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি ঘর, টারবাইন ব্লেড এবং এক্সহস্ট পাইপ টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরী হয় বলে এরা অস্বাভাবিক উঁচু তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। জ্বালানী ঘর থেকে খুব গরম টক্‌টকে লাল গ্যাস বেরোবার সময় তারা এই ধাতুর তৈরী জ্বালানী ঘরে অবক্ষয় ঘটাতে পারে না; কারণ টাইটানিয়ামের মতো এত চমৎকার অবক্ষয় প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুব কম ধাতুরই আছে। বছরের পর বছর তুমি একখণ্ড টাইটানিয়ামকে বাইরে রোদে-জলে রেখে দাও, দেখবে তার কিছুই হয়নি। কিন্তু একখণ্ড লোহাকে বাইরে ফেলে রাখলে তার কি দশা হয় ভাব তো! টাইটানিয়ামে মরচে তো পড়েই না বরং এ ব্যাপারে এই ধাতু স্টেনলেস স্টীলের চাইতেও ভালো। টাইটানিয়ামের উপর পাতলা অক্সাইডের পর্দা তৈরী হয়ে টাইটানিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। আর এর জন্যেই টাইটানিয়ামের গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না। ভিজে ক্লোরিন গ্যাস, নাইট্রিক অ্যাসিড, এমন কি অ্যাকুয়া রিজিয়া—যা ঢাললে সোনা পর্যন্ত গলে যায়—তাতেও টাইটানিয়াম দিব্যি টিকে থাকতে পারে। একজন বিজ্ঞানী তাই রসিকতা করে বলেছেন—যমের অরুচি।

টাইটানিয়াম দিয়ে এরোপ্লেনও তৈরী হচ্ছে আজকাল যা নাকি ঘন্টায় ২,২০০ মাইল জোরে ছুটতে পারে।

টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড সাদা রং তৈরী করতে কাজে লাগে। বেরিয়াম টাইটানেট নামে বেরিয়াম আর টাইটানিয়ামের একটা যৌগ

পদার্থ দিয়ে 'ট্রান্সডিউসার' তৈরি হয়। তুমি মোটর গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলে গেট খুলে দেবার জন্য চেঁচামেচি করার দরকার নেই। তোমার গাড়ীতে যদি একটা সুপারসনিক ট্রান্সডিউসার থাকে তার থেকে নিঃশব্দে সংকেত পড়বে গেটে, আর এমনি দরজা খুলে যাবে। আবার আপনিই সেটা বন্ধ হবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই। টাইটানিয়াম ও আমাদের হাড়ের ঘনত্ব খুব কাছাকাছি হওয়াতে ভাঙ্গা হাড় অস্ত্রোপচার করে সরিয়ে সেখানে সুকৌশলে এই টাইটানিয়াম ধাতু জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। রোগী বুঝতেই পারে না যে তার পুরানো হাড়ের জায়গায় নতুন একটা ধাতুর তৈরী হাড় লাগানো হয়েছে।

ছড়া

শ্রীঅর্ণবজ্যোতি দেব

বুদ্ধু ভুতুম পান
চলতি বাসে উঠতে গিয়ে
ছিটকে পড়ে যান।

ভীষণ অপমান!
সেই জ্বালাতে
লাল হল তাঁর
নাক মুখ চোখ কান।

তাই বাঁচাতে মান
উপায় খুঁজে পান,
বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
অশ্ববেগে যান।

অদৃশ্য সংকেত

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কয়েকদিন একটানা মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে ঝিলিমিলি রোদ উঠেছে। চৌথাম্বি শহরের পাহাড় ডিঙিয়ে তারই খানিকটা এসে লুটোপাটি খাচ্ছে রাজা তালাও-এর স্বচ্ছ জলে। বাগানের কোণে গুলবাহারী মীনাক্ষী ঝাড়ের যে ফুলগুলো কুঁড়ির ভিতর মাথা লুকিয়ে দিন গুণছিল, তারা হঠাৎ একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে আলোর ধারায় স্নান সেরে নেবে বলে। তাদের মিষ্টি গন্ধ বাতাস ঠেলে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

হয় তো সেই গন্ধেই আচমকা ঘুম ভেঙে গেল কুমার বাহাদুরের। পর্দা সরিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরের বারান্দায়। একবার তাকালেন দূরের পাহাড়গুলোর দিকে, আর একবার তাকালেন রাজা তালাও-এর ঝিক্‌মিক্‌-করা জলে। তারপর গোঁফের দু'পাশ চুমড়োতে চুমড়োতে পায়চারী শুরু করে দিলেন বারান্দায়। হঠাৎ তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু খুশির ঢেউ খেলে গেল।

তাঁর খাস ভৃত্য বদরু এই সময় কি একটা কাজে বারান্দায় এসেছিল, কুমার বাহাদুর বললেন, "এই, হরসিং আর হরিসিং দু'জনকেই খবর পাঠা তো! বলবি, কুমার বাহাদুর ডেকেছেন, জরুরী কথা আছে।"

জরুরী কথা যে কি, বদরুর তা জানতে বাকি নেই। কুমার বাহাদুরের শিকারের নেশার কথা কে না জানে? আর এ নেশায় তাঁর প্রধান সঙ্গী হরসিং আর হরিসিং। দু'জনেই কুমার বাহাদুরের প্রায় সমবয়সী, আর দু'জনেরই বন্দুকের নিশানা প্রায় অভ্রান্ত। ওদের নিয়ে তিনি কতবার ঘন জঙ্গলে গিয়ে চিতাবাঘ শিকার করেছেন, বাঘ শিকার করেছেন। নীলগাই, সম্বর, চিতল, দাঁতাল

শূয়োর যে কত মেরেছেন তার ঠিক নেই। দরবার হলে মেঝেতে, দেয়ালে, টেবিলে সাজানো তাদের চামড়া, শিং, দাঁত ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একটু পরেই হরসিং এসে হাজির হ'ল, আর তার একটু পরেই এল হরিসিং। কুমার বাহাদুর দূরের পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, "আর একবার তা হ'লে বেরিয়ে পড়া যাক, কি বল ?"

বিংশ শতাব্দী তখন সবে শুরু হয়েছে। ইংরেজ সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করে চলেছেন। আর তারই মাঝখানে গোটা ভারতের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট-বড় বেশ কতকগুলি তথাকথিত স্বাধীন দেশীয় রাজ্য – ইংরেজরা যেগুলির নাম দিয়েছেন "নেটিভ স্টেট্‌স্"। নামে কিছুটা স্বাধীন হলেও আসলে এঁরা সব্বাই-ই ইংরেজের তাঁবেদার। তবে নিজের নিজের এলাকায় কিছুটা কর্তৃত্ব করার সুযোগ এদের দিয়েছেন বৃটীশ-রাজ। অগাধ টাকা! স্ফূর্তি করে, আমোদ করে এদের দিন মন্দ কাটছে না। চৌখাম্বি এই রকমই একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। হ্যাঁ, রাজা যখন, তখন রাজধানীই বলব,—যদিও শহর হিসেবে চৌখাম্বি এমন একটা কিছু কেষ্টবিষ্টু শহর নয়।

মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ দিক্ দিয়ে বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকলে তবেই চৌখাম্বি পৌঁছানো যেতে পারে। শহর হিসেবে বড় না হলেও প্রাকৃতিক দৃশ্যে জায়গাটি মনোরম। পাহাড় আর হ্রদ একত্র মিলেমিশে বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছবি। রাজ্যের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ বনভূমি। এইসব বনজ সম্পদ্ থেকে স্টেটের আয়ও কম নয়। তা ছাড়া নানা রকম বন্য প্রাণীতে ভর্তি এই জঙ্গলগুলো শিকারীদেরও পরম লোভনীয়। বিদেশ থেকে কোন ইংরেজ রাজপুরুষ এলে মহারাজ তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করেন 'শিকার খেলবার' জন্য। মহারাজের বয়স হয়েছে। এককালে তিনিও

ভালো শিকারী ছিলেন, এখন তাঁর জায়গা নিয়েছেন যুবরাজ অর্থাৎ কুমার বাহাদুর। শিকারে তাঁর ভারি নেশা।

হরসিং আর হরিসিংকে নিয়ে কুমার বাহাদুর যথা সময়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। প্রকাণ্ড একটা হাতীর পিঠে চড়ে চলেছেন তাঁরা। সঙ্গে আরও কয়েকটা হাতী রয়েছে, তাতে সাঙ্গোপাঙ্গ দল।

একটা ছোট নদী পার হতেই সুরু হ'ল ঘন জঙ্গল। এবার চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হচ্ছে। আচম্‌কা কখন কোথা থেকে কোন্ জানোয়ার বেরিয়ে পড়ে ঠিক নেই তো! কুমার বাহাদুর চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছেন, তাঁর দু'পাশে বন্দুক বাগিয়ে বসে রয়েছে হরসিং আর হরিসিং। যখনকার কথা বলছি তখনও চৌখাম্বি এতটা আধুনিকতার ছোঁয়া পায় নি। শিকারীদের হাতেও তাই সে যুগের গাদা বন্দুক। তাতে বারুদ ঠেসে তার পর গুলি ছুঁড়তে হয়।

ঘন অন্ধকারে হেলতে-দুলতে চলেছে হস্তিরাজ। দু'পাশে বড় বড় ঘাসবন। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও আছে। তিন জনেই শাণিত দৃষ্টিতে চারদিক্ লক্ষ করতে করতে চলেছেন। একটা গাছের পাতা কাঁপলেও তা নজর এড়াচ্ছে না কারুর। কিন্তু কই, আজ আর কোন জন্তু সাহস করে এগুচ্ছে না তো!

কুমার বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, কি একটা রসিকতা করতে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মাথার ওপরকার একটা মোটা ডাল থেকে বিদ্যুতের মত কি একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতীর মাথায়। পর মুহূর্তেই দেখা গেল হরসিং নীচে হাতীর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়েছে, আর তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা দুর্দান্ত চিতা।

চকিতে কাউকে ভাববার অবসর না দিয়ে গর্জে উঠল হরিসিং-এর বন্দুক। চিতাটা একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে ঠিকরে পড়ল পাঁচ হাত দূরে। তার পর ঝাপটাঝাপটি করতে লাগল মাটির ওপর।

হরিসিং তখুনি লাফিয়ে পড়ল হাতীর পিঠ থেকে। বাঘটা তখনও মরে নি, আর আহত বাঘ যে কি ভীষণ চীজ তা কে না জানে? কিন্তু হরিসিং-এর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। একবার বন্ধু হরসিং-এর দিকে চকিতে তাকিয়ে, বন্দুকে বারুদ ঠেসে নিয়ে সে ফের গুলি করল বাঘটাকে। চিতা দু'বার কেঁপে এবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, আর পড়েই স্থির হয়ে গেল।

ততক্ষণে হরিসিং সযত্নে তুলে নিয়েছে হরসিং-এর মাথাটা নিজের কোলে। কুমার বাহাদুরও নেমে পড়েছেন, পেছনের সঙ্গীরাও এসে পড়েছে। সকলে মিলে ধরাধরি করে তোলা হ'ল হরসিংকে ফের হাতীর পিঠে। তার পর শিকারযাত্রা বন্ধ করে হাতীর মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। গুলি-খাওয়া চিতাটা ওখানেই পড়ে রইল। তার কথা কারও আর খেয়ালই হ'ল না।

আঘাত খুব গুরুতর নয়। শুশ্রূষার ভার হরিসিং নিজে নিয়েছিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সে বন্ধুর সেবাশুশ্রূষায় মন দিল এবং মাস খানেকের মধ্যেই তাকে সুস্থ করে তুলল। কুমার বাহাদুর তো বটেই, খোদ মহারাজও হরিসিং-এর এই বন্ধুপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

বাস্তবিক হরসিং আর হরিসিং-এর বন্ধুত্বের কথা চৌখাম্বিতে প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলত "হরিহর-আৎমা"। কুমার বাহাদুরও মাঝে মাঝে এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতেন। ওরাও সে হাসিতে যোগ দিত, তবে লজ্জা পেত না। ওদের বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ ইঙ্গিত করলে ওরা গর্ব'ই বোধ করত।

কিন্তু তা বলে ওদের মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি হ'ত না তাও নয়। দু'জনেই ছিল বদ্‌মেজাজী। সামান্য ব্যাপারে কথা-কাটাকাটি যখন তখনই হ'ত। সময় সময় দু'জনেই এত উত্তেজিত হয়ে পড়ত যে তখন বিশ্বাস করা দায় হ'ত যে ওদের মধ্যে অত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

আর এই ঝগড়া নিয়েই হ'ল কাল।

কুমার বাহাদুর আবার শিকারের আয়োজন করছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার দিকে তারই ব্যবস্থার জন্য হরসিং হরিসিং দু'জনকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাত আটটা পর্যন্ত কেউই এল না। এমনটা তো কখনও হয় না! কুমার বাহাদুর বিরক্ত হলেন, আশ্চর্য হলেন তার চেয়েও বেশি। শেষে আর থাকতে না পেরে বদরুকে বললেন কাউকে পাঠিয়ে খবর নিতে কি ব্যাপার।

খবর এল—ব্যাপার গুরুতর। অবিশ্বাস্যও বলা যায়। হরসিং আজ বিকেলে চারটে নাগাদ মারা গেছে। মারা গেছে মানে, তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। আর, হত্যাকারী আর কেউ নয়,—তারই বন্ধু হরিসিং। প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা অকাট্য। হরি-সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে।

শুনে কুমার বাহাদুর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যথা সময়ে বিচার সুরু হ'ল। জেরার ফলে ঘটনা যা জানা গেল তা এই :

কয়েক দিন থেকেই হরিসিংএর সঙ্গে হরসিংএর একটু মন-কষাকষি চলছিল। ঘটনার আগের দিন কি কারণে সেটা বেশ বেড়ে ওঠে। ঘটনার দিন দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই রোদ অগ্রাহ্য করে হরিসিং অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় হরসিং-এর বাড়ী যায়। ঘরের দরজা ভেজিয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলে। মাঝে পরস্পর পরস্পরকে এমন ভাবে শাসাচ্ছিল যেন এ ওকে মেরেই ফেলবে। বাইরে থেকে বাড়ীর লোকে যে তা শুনতে পায় নি তা নয়, কিন্তু দরজা ভেজানো থাকায় আর দু'জনের মেজাজের কথা জানা থাকায় কেউ আর ভিতরে গিয়ে থামাবার সাহস পায় নি। কিছুক্ষণ পরেই হরিসিং গট্ গট্ করে বেরিয়ে যায়।

এর দু'ঘণ্টা পরেও হরসিং ঘর থেকে বেরুচ্ছে না দেখে বাড়ীর লোকে ব্যস্ত হয়ে তার ঘরে ঢুকে দেখে বিছানার ওপর রক্তাক্ত দেহে সে পড়ে আছে। একটা বন্দুকের গুলি তার মাথা ভেদ করে চলে

গেছে। অদূরে বেশ কিছুটা দূরে একটা বন্দুক পড়ে আছে। ঐ বন্দুকের গুলিতেই যে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বন্দুকটি অবশ্য হরসিংএরই।

কিন্তু, তাই বলে, আত্মহত্যার ব্যাপার নয় এটি। কারণ বন্দুকের গুলি যে ভাবে হরিসিংএর মাথা থেঁৎলে দিয়ে বেরিয়ে গেছে তাতে গুলি বেরোবার পর বন্দুকটা টেবিলে রেখে তার পক্ষে অত দূরে বিছানায় এসে শোয়া অসম্ভব। আর বন্দুকটা বিছানা থেকে এত দূরে ছিল যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে বন্দুকের ঘোড়া টেপা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

শেষ হরিসিংকেই দেখা গেছে তার ঘরে। তার পরে আর কেউ সে ঘরে ঢোকে নি। পরস্পরের বাদানুবাদ এবং তারপর রাগত অবস্থায় হরিসিংএর গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে যাওয়া একই কথা প্রমাণ করে। মাঝে একটা আওয়াজও শুনেছিল বাড়ীর লোকেরা। তবে তা যে বন্দুকের আওয়াজ আর হরসিংএরই ঘর থেকে এসেছিল তা কেউ বুঝতে পারে নি, ভাবতেও পারে নি। কারণ, সামনেই শিবজীর পূজা—এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। দেওয়ালীর মত কয়েকদিন আগে থেকেই পটকা, বাজি এখানে-সেখানে বাচ্চারা হামেশাই ফাটাচ্ছে।

হরিসিং কিন্তু সমস্ত দোষ অস্বীকার করল। যদিও সে স্বীকার করল যে হরসিংএর সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটি খুব বেশি রকমই হয়েছিল। দু'জনেই খুব উত্তেজিত ছিল কিন্তু বন্দুক সে ছোঁড়ে নি। বন্দুক তার প্রিয় সাথী হলেও সঙ্গে সে বন্দুক নিয়ে ঘোরে না; আর ও বন্দুকটাও তার নয়—হরসিংএরই। সেটা টেবিলের ওপর বরাবরই শোয়ানো ছিল। সেটায় গুলি ভরা ছিল কিনা তাও সে জানে না। তা ছাড়া হরসিংই বরঞ্চ তাকে গুলি করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল, তবে গুলি করে নি। আর যতই রাগারাগি করুক, মুখে যাই বলুক, তাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা ছিল তাতে সত্যি সত্যি কেউ যে অপরকে গুলি করতে পারে এ কথা কে

বিশ্বাস করবে? শহরের সবাই তাদের চেনে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে রাগ করে বেরিয়ে আসে। তারপর কি হয়েছে সে কিছুই জানে না।

তা এ রকম তো সকলেই বলে। সমস্ত আসামীই নিজেকে নির্দোষ বলবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ হরিসিংএর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ এত নিখুঁত যে অপরাধটা যে সে-ই করেছে সে বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবার কথা নয়। জজেরও হ'ল না, জুরিদেরও না। হয় তো প্রবল উত্তেজনার মাথায় হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হয়ে সে এ কাজ করে থাকবে, বন্ধুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা হয় তো তার ছিল না; কিন্তু তা বললে তো আর আইন শুনবে না। এ রকম অপরাধে ফাঁসি হবারই কথা, কিন্তু জজ, কি মনে করে, ফাঁসির হুকুম না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন। জানি না কুমার বাহাদুরের কোন অদৃশ্য হাত এর পেছনে ছিল কি না।

হরিসিং জেলে চলে গেল। তারপর একটি একটি করে কত বছর যে কেটে গেল তা তার খেয়ালই নেই। পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু জেলের ভিতর কে তার খবর রাখে বল?

বাইরের জগৎ সম্বন্ধে হরিসিংও তাই কোন খবর রাখে না। জেলখানাই তার ঘরবাড়ী, হয় তো এখানেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। বুড়ো তো হয়ে এল, কতদিন আর বাঁচবে?

এদিকে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বুড়ো মহারাজ আর নেই, কুমার বাহাদুরই এখন মহারাজ হয়েছেন। লোকে আর কুমার বাহাদুর বলে না—বলে রাজা বাহাদুর। রাজ্যের লোকেরাও ইতিমধ্যে সেয়ানা হয়েছে। নানা ব্যাপারে তাদের অধিকার নিয়ে প্রায়ই আন্দোলন চলছে। কুমার বাহাদুর অবশ্য এদিক্ দিয়ে বাপের চেয়ে অনেক উদার। রাজ্যের আইন-কানুনে অনেক সংস্কার করেছেন তিনি, অনেক পরিবর্তনও মেনে নিয়েছেন।

জেলখানাও আর আগেকার মত নেই। তারও সংস্কার হচ্ছে। একজন নতুন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছেন, নাম ডক্টর গুপ্ত। ভারী চমৎকার লোকটি। সকলের প্রতি সমান সহানুভূতি। তা ছাড়া লোকটি নাকি খুব পণ্ডিত; অনেক পড়াশুনা করেছেন, অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন। কয়েদীদের সুখসুবিধার প্রতিও তাঁর প্রখর নজর। যখন তখন জেলের মধ্যে টহল দেন তিনি আর কয়েদীদের ডেকে ডেকে তাদের সঙ্গে নানা সুখ-দুঃখের আলোচনা করেন। কেন তারা এ পথে এল, সত্যি কি ঘটেছিল, এখন ভুল বুঝতে পারছে কিনা, জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে—এই রকম নানা কথা।

হরিসিংএর কাছেও একদিন তিনি এসে হাজির হলেন। ও যে নামকরা শিকারী এবং একদা বর্তমান রাজা বাহাদুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিল এ খবর তিনি আগে পেয়েছিলেন। একদিন তাই ভালো করে আলাপ করতে এলেন।

হরিসিং বলল, "হ্যাঁ, হরসিং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। খুবই অন্তরঙ্গ। তার মৃত্যু আমাকেও কম বিচলিত করে নি। কিন্তু সত্যি আমি নির্দোষ। ওকে আমি মারি নি, মারার কথা কল্পনাও করতে পারি না। কি করে কি ঘটল আমি কিছুই জানি না—বুঝতেও পারছি না। অথচ সাক্ষ্য প্রমাণ সব এমন ভাবে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াল যে আমি যদি আমি না হয়ে অন্য লোক হতাম তা হলে আমিও হয় তো বিশ্বাস করতাম যে হরসিংকে আমিই মেরেছি। কিন্তু আজ এতদিন পরে মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই। ক'দিন আর বাঁচব? এই জেলখানাতেই তো বিশ বছর কেটে গেল। এখানেই আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে এ বেশ বুঝতে পারছি।"

ডক্টর গুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে আরও নানা রকম প্রশ্ন করলেন। হরিসিং অকপটে জবাব দিয়ে গেল। বিদায় নেবার সময় বলল, "আমাকে বিশ্বাস করুন স্যর, এ আমার নিয়তি—আমার অদৃষ্ট। নইলে এমনটি কেন হবে?"

ডক্টর গুপ্ত নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কারও সঙ্গে আর কথা বললেন না, ওঁকে বেশ একটু চিন্তিতই মনে হ'ল।

এর পর আর দিন কয়েক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুপ্তকে জেলখানার ভিতর টহল দিতে দেখা গেল না। কখনও দেখা গেল তিনি অফিসের পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন, কখনও বা স্টেট

এ আমার নিয়তি—আমার অদৃষ্ট

লাইব্রেরীতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। এখানে-ওখানে চিঠি লেখালেখি চলছে। একদিন রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ ধরে কি আলাচনাও করে এলেন।

হরিসিং আপন মনে তার ছোট্ট খাটিয়ার ওপর কম্বল পেতে বসে ছিল। জীবনটা এই ভাবেই তা হলে নষ্ট হয়ে গেল।

বাইরের সবুজ পৃথিবীর কথা যেন মনেই পড়ে না। আঃ, কতকাল চোখে পড়ে নি চৌখাম্বির চারদিকে পাহাড়ের ওপর ঘন মেঘের লুকোচুরি, তুপুরে রাজা তালাওএর জলে রোদের ঝিকিমিকি খেলা। এখন যেন সে সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। সামনে এখন শুধু পাথরের দেয়াল আর লোহার গরাদে ছাড়া কিছুই নেই। পাশে সঙ্গীন-খাড়া বন্দুক-কাঁধে সদাজাগ্রত প্রহরী। অথচ এই বন্দুক নিয়েই একদিন বনে বনে কত কাণ্ডই না সে করে বেড়িয়েছে আর এই বন্দুকের ছলনাতেই তার আজ এই অবস্থা।

হঠাৎ সামনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন জেলার সাহেব। বললেন, "আপনাকে এখনই একবার বাইরে আসতে হবে—আদালতের হুকুম এসেছে। চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নিন।"

হতবুদ্ধি হরিসিং উঠে দাঁড়াল। তৈরি হবার আর কি আছে? জেলের পোষাক তো পরাই আছে, মাথায় পাগড়ীটা জড়িয়ে সে সেপাইএর পিছু পিছু বেরিয়ে এল।

ফটকের বাইরে একটা কয়েদী গাড়ী অপেক্ষা করছিল। হরিসিং একবার বিস্মিত ভাবে বিশ বছরের হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবীকে যেন চোখ ভরে দেখে নিল, তারপর গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসল।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? শহর যে অনেক বদলে গেছে! রাস্তাঘাট দেখে কিছুই চেনা যায় না।

কিন্তু গাড়ী গিয়ে যেখানে থামল সে জায়গাটি তার বিশেষ চেনা। আজ বিশ বছরেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। এই-খান থেকেই সে বিশ বছর আগে একদিন রাগে গট্‌গট্‌ করতে-করতে বেরিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, এই সেই হরসিংএর বাড়ী।

ঘরে ঢুকে দেখে অবাক্ কাণ্ড। হরসিংএর মৃত্যুর দিন ঘরের যে দৃশ্য সে দেখেছিল, এখনও সেটি সেই ভাবে রয়েছে! অর্থাৎ সেই ভাবে ফিরে সাজানো হয়েছে। যে খাটে হরসিংকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানে একটি খড়ে মোড়া কাপড়ের

পুতুল শোয়ান রয়েছে। পুতুলটা মানুষেরই মত বড়। বালিশে মাথা রেখে পুতুলটা শুয়ে আছে—ঠিক যেমন হরসিংকে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। দূরে, জানালার ধারে টেবিল পাতা। তার ওপর একটি গাদা বন্দুক। তার মধ্যে নিশ্চয়ই গুলি ভরা আছে।

ঘরের মধ্যে আরও অনেক লোক। আদালতের লোক, স্বয়ং জজ্ সাহেব, পুলিশের লোক আর ডক্টর গুপ্ত। এক কোণে চেয়ার টেনে কুমার বাহাদুরও বসে আছেন। এখন তিনি রাজা বাহাদুর। অনেক বুড়িয়ে গেছেন, তবু হরিসিংএর চিনতে কষ্ট হ'ল না।

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "হরিসিংজী, আসুন তো! দেখুন, বন্দুকটা সেদিন এই ভাবে টেবিলের ওপর পড়ে ছিল তো? আর জানালাটা? ওটা কতখানি খোলা ছিল মনে আছে আপনার?"

অভিভূতের মত হরিসিং টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ বন্দুকটির দিকে তাকিয়ে থেকে সেটা একটু সরিয়ে কাৎ করে দিল। বন্দুকের নল এবার বিছানায় শায়িত পুতুলটার ঠিক মাথার দিকে তাগ করা রয়েছে। হরিসিং জানালার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল, যেন কি মনে করতে চাইছে। তার পর আস্তে গিয়ে শার্সিটা আরও একটু খুলে দিল। জানালার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়ল বন্দুকের ওপর। হরিসিং-এর মনে হ'ল আজও যেন সেদিনকার মতই প্রচণ্ড গরম।

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "যান, এবারে ওদিক্‌টায় গিয়ে দাঁড়ান।"

দু'মিনিট—চার মিনিট করে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। ঘর শুদ্ধ লোক অধীর আগ্রহে কি দেখছে? বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলো তখনও ম্লান হয় নি। একটু একটু করে সরে আসলেও বন্দুকের ওপর থেকে সরে যায় নি। বন্দুকের বারুদখোপটা ঝক্‌মক্ করছে সেই আলোয়।

হঠাৎ—

হঠাৎ দুম্ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে

বন্দুক থেকে একটা গুলি আচম্‌কা ছুটে বেরিয়ে এল আর খাটের ওপর শোয়ানো সেই পুতুলটার মাথা ভেদ করে ঢুকে গেল তার ভিতরে।

স্নিগ্ধ তৃপ্তির হাসিতে ডক্টর গুপ্তের মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে দেখছে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা।

ডক্টর গুপ্ত একবার জজ্‌ সাহেব, আর একবার রাজা বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন হরিসিংজী নির্দোষ। ঘটনাচক্রে এই অপরাধের বোঝা আশ্চর্য ভাবে তাঁরই ওপর চেপেছিল। আসল আসামীকে ধরবার উপায় ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন আমাদের সূর্যদেব—আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনিই হরসিংএর মৃত্যুর কারণ—হরিসিং ন'ন।"

একটু হেসে আবার বললেন ডক্টর গুপ্ত, "হরিসিংজীর কথা শুনে আমার কেমন ধারণা হয়েছিল তিনি নির্দোষ। কিন্তু কি করে প্রমাণ করব? কয়েকদিন ধরে চিন্তায় আমার ঘুম আসছিল না। যদি উনি না হ'ন তা হলে কে? তৃতীয় কোন ব্যক্তি তো আসে নি ঘরে! বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা সন্দেহ জাগল। মনে হ'ল সেকালকার গাদা বন্দুক, ওর মধ্যে বারুদ ঠেসে গুলি ছুঁড়তে হয়। বারুদ জিনিসটা কি?—না, সোরা বা পটাসিয়াম্‌ নাইট্রেট, গন্ধক আর কাঠকয়লা। বারুদ গরম হলে তার ভিতর বিস্ফোরণ হয় অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে,—তৈরি হয় গ্যাস। সেই গ্যাস ফেঁপে উঠে বন্দুকের গুলিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড সেই ধাক্কা খেয়ে গুলিও প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরিয়ে আসে বন্দুক থেকে। বন্দুকের ঘোড়া টিপে ঘর্ষণের সাহায্যে বারুদকে গরম করা হয়। কিন্তু ধরা যাক, যদি ঘোড়া না টিপেও অন্য কোন ভাবে বারুদটা হঠাৎ গরম হয়ে যায়, আপনা-আপনিও হতে পারে—কারো সাহায্যে,—তা হলেও তো ঐ ব্যাপার ঘটতে পারে! কিন্তু এ ভাবে কে গরম করবে? কে করবে আর, স্বয়ং সূর্যদেবই করতে পারেন। প্রখর সূর্যালোক যদি বেছে বেছে বেশ খানিকটা

সময় বন্দুকের বারুদখোপের :ওপর পড়ে তাকে তাতিয়ে দেয় তা হলে এক সময় সেটা এত গরম হয়ে যেতে পারে যে তার ফলে ভিতরের বারুদে বিস্ফোরণ অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রেও কি তবে তাই হ'ল ?

"ছুটলাম এখানকার কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডক্টর বালকিষেণের কাছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অসম্ভব নয়। তাঁর ল্যাবরেটরীতেই পরীক্ষা করা হ'ল। ফল যা দাঁড়াল তা আমার যুক্তির স্বপক্ষে। ছুটলাম রাজা বাহাদুরের কাছে। শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কারণ হরিসিংজী যে ওরকম একটা অপরাধ করতে পারেন তা তিনিও বিশ্বাস করতে চান নি। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ তার বিরুদ্ধে এত পরিষ্কার যে কিছু বলার উপায় ছিল না। আমার পরামর্শে তিনি আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাই থেকেই আজকের এই অভিনয়। কিন্তু অভিনয়ের ভিতর দিয়ে যে এত বড় একটা সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে তা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল ?"

হরিসিংএর চোখ ছলছল করছিল। রাজা বাহাদুর উঠে এসে আস্তে তার কাঁধে হাত দিলেন। কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

বলা বাহুল্য হরিসিংকে আর জেলখানায় ফিরে যেতে হ'ল না। জজ্ মুক্তির পরোয়ানা সেখানে বসেই লিখে দিলেন। দেশীয় রাজ্যের আইনকানুনে এ সব সুবিধা বরাবরই ছিল। ভুলের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার সুপারিশও ছিল তাতে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'টাই সবচেয়ে বড় কথা। ডক্টর গুপ্তই মৃদুস্বরে স্মরণ করিয়ে দিলেন সে কথা। হরিসিং তার স্বাধীনতা ফিরে পেল ঠিকই, কিন্তু তার জীবনের হারিয়ে-যাওয়া কুড়িটা বছর—যা নাকি মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—সেটা তো কেউ আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।*

*সত্য ঘটনার ছায়া নিয়ে।

মেণ্ডেল ও তাঁর আবিষ্কার

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

সকালে যেখানে বসে চা খাচ্ছিলাম তার সামনের বারান্দায় টবে একটা বোগেন-ভেলিয়া ফুলগাছে কয়েক থোকা ফুল ধরেছে। গাছটা তেমন বড় নয়—ফুট দুই উঁচু হবে। লক্ষ্য করলাম, চার থোকা ফুলের মধ্যে দুই থোকার রং বেশ লালচে বেগুনী, এক থোকা একেবারে সাদা ধবধবে, আর এক থোকা একেবারে লাল। যে গাছের ফুল লাল, সে গাছে লাল ফুল ধরবে এটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু একই গাছে লাল এবং সাদা ফুল, কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। যতদূর মনে পড়ে যে গাছটার ডাল কেটে ওই টবটায় লাগিয়েছিলাম সে গাছটায় কখনো সাদা ফুল ধরতে দেখি নি। চা খেতে খেতে ভাবছিলাম কথাটা।

ক'দিন আগের কথা মনে পড়ল। আমার এক নিকট আত্মীয়ের একটি পুত্র-সন্তান লাভ হয়েছে। বড় মেয়ে সে আত্মীয়ের বাড়ী থেকে এসে খবর দিল, শান্তদার ছেলেটা হয়েছে একেবারে শান্তদারই মতো। বাচ্চাটার মুখখানা একেবারে শান্তদার মুখখানা কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কি!

খুবই স্বাভাবিক কথা। কারো সন্তানাদি হলে আত্মীয়-বান্ধবদের বলতে শোনা যায়; ছেলেটি হয়েছে যেন হুবহু বাপের মতো!

আমার ছোট ভাই ছোটবেলা ভারী রাগী ছিল। বয়সটয়স বাড়লে সে রাগ এখন আর নেই। ভাইপো নান্টুও হয়েছে অসম্ভব রাগী। যখন ভালো করে কথা বলতে শেখে নি

তখনই তার রাগের পরিচয় যা আমরা পেয়েছি তা রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল আমাদের। এখন বয়স বছর সাতেক হয়েছে। রাগ এখনো আছে রীতিমত, তবে সে রকমটি নয়।

• তা হলে আমরা বলতে পারি, পিতামাতার দোষগুণ, চেহারা, গায়ের রং এবং অন্যান্য দেহগত এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কমবেশী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায়। যদি তাই হয় তবে আমার জানা অন্য এক ভদ্রলোকের ব্যাপারটা তো ব্যাখ্যা করা যায় না! ভদ্রলোক গুণী এবং সুপণ্ডিত, গায়ের রং বেশ ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো। এক কথায় সুপুরুষ, তবে বড্ড বেঁটে। ভদ্রলোকের স্ত্রীও বেশ সুন্দরী। যেমন গায়ের রং, তেমনি স্বাস্থ্য; লম্বায়ও বেশ। এঁদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা তেরো। ভাইবোনদের কারো কারো চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা প্রভৃতির বিচারে একদম মিল নেই। আবার কারো কারোর মধ্যে অদ্ভুত রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। তা ছাড়া ভাইবোনদের কেউ কেউ হয়েছে দেখতে মায়ের মতো, কেউ কেউ বাবার মতো। অন্য দিকে বাবা-মা কারোর সঙ্গেই কোন সাদৃশ্য নেই কোন কোন ভাইবোনের।

আমার বোগেনভেলিয়া ফুলের কথায় আর একবার ফিরে আসা যাক। যে গাছটার ডাল থেকে এ গাছটার জন্ম সে গাছটায় কখনো সাদা ফুল ধরে নি, তবে সে গাছটার ফুলগুলো ছিল টক্‌টকে লাল। কিন্তু আমার গাছটার ফুলগুলো পুরো লাল যে নয় সে কথা তো আগেই বলেছি। তার মানে আমার গাছটার চারটে ফুলের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ হয়েছে পুরো লাল, এক ভাগ হয়েছে পুরো সাদা এবং বাকি দু'ভাগ হয়েছে সাদাও নয় বা লালও নয়, মাঝামাঝি একটা রং—লালচে-বেগুনী।

ব্যাপারগুলো বাস্তবিকই অদ্ভুত লাগলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু এর অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলে।

কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। কোষের বাইরে রয়েছে একটি আবরণ, আর ভেতরে রয়েছে কাদা কাদা জেলির মতো খানিকটা পদার্থ যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভেসে রয়েছে একটি গোলাকার প্রকোষ্ঠ যার চারিদিকে আছে আর একটি আবরণ। একে বলা হয় নিউক্লিয়াস। এর ভিতরে ঘন ভাবে সাজানো আছে খুব সরু সরু সুতোর জাল—যার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম ভেসে আছে অন্য একটি পদার্থে। এই ক্রোমোজোম বংশগত ধর্ম বহন করে নিয়ে যায় সন্তানসন্ততিদের মধ্যে।

নতুন কোষ তৈরি হয় আপনা-আপনি কোষগুলো ভাগ হয়ে হয়ে। ব্যাপারটা ভারী মজার। প্রথমে নিউক্লিয়াসের বাইরের আবরণটি যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে মনে হবে। এ সময় ভেতরকার ক্রোমোজোম সংকুচিত হয়ে বেশ ঘন হয়ে একগোছা সুতোর আকার ধারণ করে। ক্রোমোজোমের প্রতিটি সুতোর গায়ে অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা মালার আকারে সজ্জিত হয়ে পড়ে। মনে হয় একগাছি পুঁতির মালা। এর পরে এই কণিকাগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তার মানে প্রতিটি সুতোর মালা আড়াআড়ি দু'গাছি মালায় পরিণত হ'ল।

এদিকে নিউক্লিয়াসের বাইরের আধ-ঘন পদার্থও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তারপর ক্রোমোজোম এবং কোষের অন্যান্য পদার্থের আকার-আকৃতির চলে আরো নানারকমের পরিবর্তন। শেষ পর্যন্ত এক সময় কোষটি সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দেখা যায় যে উভয় কোষের মধ্যে ক্রোমোজামের সংখ্যা এবং ক্রোমো-জোমের ভেতরকার কণিকার সংখ্যা যে কোষটি ভেঙ্গে নতুন কোষ দুটি তৈরী হয়েছে তারই সমান।

আগেই বলেছি, প্রতিটি ক্রোমোজোমে অনেকগুলো করে ছোট ছোট কণিকা মালার আকারে সাজানো থাকে। এই কণিকা-গুলোর নাম দেওয়া হয়েছে জীন। প্রতিটি জীনের রাসায়নিক

গঠনবিধি আলাদা আলাদা। তা ছাড়া প্রতিটি জীন ক্রোমোজোমের ভেতরে একটা নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, জীনরাই হল প্রাণী এবং উদ্ভিদরাজ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী। মানুষের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে আছে ২৩ জোড়া ক্রোমো-জোম। এর ২৩টি এসেছে মায়ের দেহ থেকে, বাকী ২৩টি এসেছে বাবার দেহ থেকে। ক্রোমোজোমের ভেতরকার কতগুলো জীন রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার জন্যে দায়ী, কতগুলো দায়ী চোখের মণির রং-এর জন্য, কতগুলো দায়ী নাকের গঠনের জন্যে, কতগুলো চুলের বৈশিষ্ট্যের জন্যে। কোন্ কোন্ জীন কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী তার বিস্তৃত বিবরণ বা ক্রোমোজোম চার্ট ইতিপূর্বেই স্থির করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের ক্রোমোজোমের জীন সম্বন্ধে এমনি ধরনের কাজও সুরু হয়ে গেছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নাম সকলেরই জানা। এই সব নিয়ে গবেষণা করেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব কথা বলতে গেলে তা এক আলাদা মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে।

উপরে যে-সব কথা বলা হ'ল তা নিতান্তই আধুনিক কালের কথা। আধুনিক বিজ্ঞান কতই না উন্নত! টমাস হাণ্ট মরগান জীন আবিষ্কার করে ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এখন থেকে একশ' বছরেরও আগে, অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে অষ্ট্রিয়ার এক ধর্মযাজক 'উত্তরাধিকার বিজ্ঞানের' সূত্রগুলি আবিষ্কার করে-ছিলেন। তাঁর গবেষণার কাজ চলছিল এরও আট বছর আগে থেকে। মনে রাখতে হবে যে সে সময় ক্রোমোজোম বা জীন সম্বন্ধে সামান্য ধারণাও ছিল না বিজ্ঞানীদের। এসব তো হাল-আমলেরই আবিষ্কার। বিষয়টা ভাবলে অবাক্ না হয়ে পারা যায় কি?

যে ধর্মযাজক বিজ্ঞানীর কথা বলছি তিনি হলেন মেণ্ডেল— পুরো

নাম গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল। জন্ম তাঁর ১৮২২ সালে এক কৃষক পরিবারে। মোরাভিয়ার হাইনজেনডর্ফ গ্রামে। মোরাভিয়া ছিল সেকালে অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত ; এখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ-বিশেষ।

বাবা ছিলেন পাকা চাষী। কাজেই ছোটবেলা ক্ষেতে চাষের কাজে সাহায্য করতে হ'ত বাবাকে। এমনি ভাবে মেণ্ডেলের চাষ-বাসের কাজে উৎসাহ আসে। চাষের বাগানে বসে বালক ভাবত, কত রকমের গাছ, তাদের কত রকমের ফলের আকার, আকৃতি। নানা রংএর ফুল! কোন ফুল লাল, কোনটা বা হলদে, কোন ফুল বা সাদা! আবার এমন ফুলও তো দেখা যায় যার একের ভেতরে রয়েছে নানা রংএর মিশ্রণ। কিন্তু কেন এমনটি হয়? কোত্থেকে আসে বিভিন্ন রং, বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য? রীতিমত ভাবিয়ে তুলত বালককে।

হাইনজেনডর্ফের একটি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল বালক মেণ্ডেলকে। ওয়ালডবুর্গের জমিদার-গিন্নীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি ছিল খানিকটা আকর্ষণ। তিনি তাই জমিদারীর সব প্রাথমিক স্কুলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অবশ্য স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টরের ছিল ঘোরতর আপত্তি এ ব্যবস্থায়। সে যাই হোক, বালক মেণ্ডেলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হাতে খড়ি এখানেই। এখানকার পড়া শেষ করে মেণ্ডেল ভর্তি হলেন নিকটবর্তী সহর ট্রোপ্পুর হাই স্কুলে। এখানে বছর ছয়েক পড়াশুনা করার পর মেণ্ডেল পড়লেন অসুস্থ হয়ে। তাছাড়া সংসারে অর্থকষ্টও দেখা দিল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মেণ্ডেলের পড়াশুনা বুঝি বন্ধই হয়ে যায়। এ সময়ে মেণ্ডেলের বাবা পড়লেন এক বিপদে। একদিন বাগানে একটা গাছ কাটতে গিয়ে তার মোটা ডাল হঠাৎ এসে পড়ল মেণ্ডেলের বাবার ওপর। তিনি প্রানে বেঁচে গেলেন বটে, তবে চিরদিনের জন্যে চাষবাসের কাজে অকেজো হয়ে গেলেন। এর ফলে তিনি তাঁর খেতখামার

বিক্রী করে তার টাকা পয়সা ভাগ করে দিলেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে। মেণ্ডেলের ছোট বোন থেরেসিয়া তার অংশের সব টাকা দিয়ে দিলেন মেণ্ডেলকে তাঁর পড়াশুনা চালাবার জন্যে। নিজের টাকা এবং বোনের দেওয়া টাকাপয়সায় মেণ্ডেল এর পরে ওলমুট্জ ইনষ্টিটিউটে আরও চার বছর পড়াশুনা করেন। পরবর্তীকালে মেণ্ডেল কিন্তু কোনদিনই ছোট বোনের ওই দানের কথা ভোলেন নি। বোনের ছেলেদের স্কুল কলেজের পড়াশুনার ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছেন পরবর্তীকালে।

পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি ভাবতে লাগলেন কোন কাজ তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হবে। অসচ্ছলতা কাকে বলে তা তিনি জানেন। কাজেই এমন বৃত্তি তাঁকে গ্রহণ করতে হবে যাতে খাওয়া পরার ভাবনা যেন চিরদিনের জন্যে দূর হয়। মেণ্ডেলের একজন অধ্যাপক মাইকেল ফ্রানজ পরামর্শ দিলেন গীর্জার চাকুরী গ্রহণ করতে। সেকালের নিয়ম অনুসারে এ চাকুরীতে যেমন অর্থ আছে তেমনি আছে মানসম্মান। কাজেই সবদিক বিবেচনা করে ১৮৪৩ সালে মেণ্ডেল অলটব্রুনের অগস্টানিয়ান গীর্জায় কাজে যোগ দিলেন। নিজের নামের আগে যোগ করে নিলেন গ্রেগার। এ সময় মেণ্ডেলের বয়স একুশ বছর।

বিরাট গীর্জা। প্রকাণ্ড তার বাগান। এখানে নানা ধরনের চাষের কাজ হত, হত উদ্ভিদবিদ্যার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দেখাশুনা করতেন ফাদার অরিলিয়াস থেলার নামে গীর্জার এক পাদরী। ফাদার থেলার উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মেণ্ডেল গীর্জার কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন আগে ফাদার থেলার দেহত্যাগ করেন। কাজেই গীর্জার এই প্রকাণ্ড বাগানের কাজকর্ম তদারক করার ভার পড়ে মেণ্ডেলের ওপর। মেণ্ডেল এখানকার কাজকে স্বর্গের দান হিসেবেই গ্রহণ করলেন। তাঁর অবসর সময়ের সবটাই কাটত এই বাগানে। কোন গাছের জন্ম থেকে তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সব রকমের পরিচর্যা করতেন মেণ্ডেল

নিজের হাতে; বিভিন্ন সময় তাদের পরিবর্তন, তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের বৈচিত্র্য সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করতেন তিনি; তারপর তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। গীর্জার আরও কয়েকজন সহকর্মী তাঁকে এ কাজে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়টা ছিল ইয়োরোপের এক নবযুগ। নানা রকমের নতুন চিন্তাধারার জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন অংশে। প্রকৃতপক্ষে মেণ্ডেলের সহকর্মীদের কেউ কেউ গীর্জার কাজ ছেড়ে দিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

মেণ্ডেলের ছিল যে কোন কাজে অদম্য উৎসাহ এবং অফুরন্ত কর্মক্ষমতা। গীর্জার কাজ এবং বাগানের কাজ সে তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ সব কাজ সারার পর যে সময়টা হাতে থাকে সে সময়ে স্বচ্ছন্দে কোন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করা যেতে পারে। বাগানে হাতে-কলমে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তা স্কুলের ছেলেদের শেখাতে পারলে মন্দ হয় না। তাছাড়া ছেলেদের পড়াতে গেলে পুঁথিগত বিদ্যাটাও ভাল করে রপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি স্থানীয় স্কুলে বদলী শিক্ষকের পদে দরখাস্ত করলেন। কাজটা পেয়েও গেলেন। তবে স্থায়ী শিক্ষকরা যে মাইনে পান, বদলী শিক্ষকরা পান তার শতকরা ষাট ভাগ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ মেণ্ডেলের কাজে অসন্তুষ্ট নয়। কাজেই তিনি স্থায়ী পদ পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। এ জন্যে যে পরীক্ষা দিতে হত সে পরীক্ষাও দিলেন। কিন্তু কপাল মন্দ! পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারলেন না। সে এক মজার ব্যাপার!

১৮৫০ সালের বসন্তকালে মেণ্ডেল মাননীয় পরীক্ষকদের সামনে পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল যে, পরীক্ষকরা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, পরীক্ষার্থী বিষয়টা ভালভাবে

রপ্ত করেন নি। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার যোগ্যতা তাঁর নেই।

আশা-ভঙ্গ হল বটে কিন্তু তিনি দমে গেলেন না। বেশ কয়েক মাস ধরে চলল আবার পড়াশুনা। দিলেন দ্বিতীয়বার পরীক্ষা। এবারকার পরীক্ষার ফল আরও খারাপ। পরীক্ষকরা লিখলেন, পরীক্ষার্থীর প্রাইমারী স্কুলেও পড়াবার যোগ্যতা নেই।

ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে!

অতএব অস্থায়ী শিক্ষকের কাজে বহাল থেকেই খুশী হতে হল মেণ্ডেলকে।

গির্জার কাজ, অস্থায়ী শিক্ষকের কাজ এবং অবসর সময়ে বাগানের কাজ—এ সব নিয়েই দিন ভালই কাটছিল। বেশ হাসিখুশী ধরনের লোক ছিলেন মেণ্ডেল। সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ আনন্দেই ছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্রুসিয়ানরা অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করে। এ সময় অষ্ট্রিয়ানদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল তা দেখে তিনি ব্যথিত চিত্তে লিখেছিলেন, ভগবান এ পৃথিবীকে রূপে-রংএ সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে কদর্য করার জন্যে মানুষ যেন উঠে পড়ে লেগে গেছে।

যুদ্ধ এবং অত্যাচারের পর আবার সব শান্ত হয়ে এল; মেণ্ডেলের মনেও শান্তি ফিরে এল। তিনি আবার গীর্জার বাগানে তাঁর পরীক্ষার কাজ নিয়ে মেতে উঠলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগে মানুষের মধ্যে কতই না বৈচিত্র্য। নানা ধরণের প্রাণী এবং গাছপালার মধ্যেও রয়েছে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশ। এর ব্যাখ্যা কি? কেন এসব হয়? এমনি ধরনের নানা প্রশ্নের উদয় হল তাঁর মনে। বাগানের একখণ্ড জমিতে তিনি মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষার কাজ সুরু করে দিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। তিনি বলতেন, অতি সাধারণ জিনিস থেকেই পরম সত্যের সন্ধান মেলে।

প্রথমে মটর বীজ এবং গাছের নানা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিলেন মেণ্ডেল। তিনি দেখলেন কোন কোন মটর গাছ বেশ লম্বা, কতগুলো বেঁটে, কতগুলো গাছের পাতার আকার-প্রকৃতি আলাদা, কোন কোন গাছের ফুলের রংও যেমন আলাদা, আকারেও সেগুলো ছোট-বড়; কোন গাছের বীজ বেশ সবুজ, কোন গাছের বীজ আবার হলদে ইত্যাদি। এমনি ভাবে মটর গাছ তার বীজ, ফুল, পাতা প্রভৃতি একুশ রকম বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেলেন মেণ্ডেল। তিনি এর থেকে আট রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটর নিয়ে পরীক্ষার কাজ আরম্ভ করলেন। যেমন ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা গাছ এবং ৯ ইঞ্চি থেকে দেড় ফুট লম্বা গাছের মিশ্রণে গাছ উৎপন্ন করা হল। দেখা গেল, গাছগুলোর কতগুলো হয়েছে লম্বা, কতগুলো হয়েছে বেঁটে। তিনি লম্বা এবং বেঁটে গাছের মিশ্রণে প্রথমবারে ১,০৬৪টি গাছ উৎপন্ন করেছিলেন; দেখা গেল এর মধ্যে ৭৮৭ টি হয়েছে লম্বা, আর ২৭৭ টি হয়েছে বেঁটে। মোটামুটি বলা যায়, চার ভাগের তিন ভাগ লম্বা, আর এক ভাগ হয়েছে বেঁটে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়েও তিনি কয়েক শত গাছ উৎপন্ন করলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেল, পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে এসে গেছে ৩ : ১ অনুপাতে।

এরপরে চলল দ্বিতীয় পুরুষের পরীক্ষা। তারপর তৃতীয়-পুরুষের। এমনি ভাবে হাজার হাজার গাছ উৎপন্ন করে তাদের নানা বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল আট বছর ধরে। ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল সম্বন্ধে গবেষণাপত্র পড়ে শোনান স্থানীয় একটি বিজ্ঞান সভায়। গবেষণা পত্রটি ছাপাও হল স্থানীয় একটি পত্রিকায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী মহলের নজর এড়িয়ে গেল মেণ্ডেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কারের ৩১ বছর পর পৃথিবীর তিনটি দেশের তিনজন বিজ্ঞানীর নজর পড়ে মেণ্ডেলের কাজের দিকে। তাঁর প্রদর্শিত পথে কাজ করে অসাধ্য সাধন করা

সম্ভব হয়েছিল সেদিন। অথচ অলটক্রুন সোসাইটিতে যেদিন মেণ্ডেল তাঁর আবিষ্কারের কথা বলেন, সেদিন তাঁর "শ্রোতারা ভদ্রভাবে শুনলেন, বক্তৃতা শেষে নিরুত্তাপ উৎসাহ প্রকাশ করলেন এবং তারপর সব কিছু নিঁখুত ভাবে ভুলে যেতে সমর্থ হলেন।"

মেণ্ডেলের দীর্ঘদিনের অসংখ্য পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

(১) তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, লম্বা মটর গাছের বীজ থেকে লম্বা গাছই জন্মে পর পর কয়েকপুরুষ ধরে; আবার বেঁটে গাছের বীজ থেকে পাওয়া যায় বেঁটে গাছই। এদের বলা হয় বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য বা পিওর ক্যারেক্টার। এবারে লম্বা গাছ এবং বেঁটে গাছের মিশ্রণে যে গাছ উৎপন্ন হল দেখা গেল তার সব গাছই হয়েছে লম্বা, অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষে লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রয়েছে। এ নিয়মটির নাম দেওয়া হল ল অফ ডোমিনেন্স।

(২) এবারে নেওয়া হল দ্বিতীয় পুরুষের এই লম্বা গাছের বীজ। এ বীজ থেকে যে গাছ পাওয়া গেল তার হিসেব নিয়ে দেখা গেল যে, প্রতি চারটি গাছের মধ্যে তিনটি হয়েছে লম্বা, একটি হয়েছে বেঁটে। তার মানে এ পুরুষেও লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। বেঁটে হওয়ার বৈশিষ্ট্য সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে গেছে।

(৩) এর পরের পুরুষে কিন্তু বেঁটে হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দু'ধরণের আলাদা বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছের বীজের মিশ্রণে যে সঙ্কর বীজ পাওয়া গেল তাদের মধ্যে আবার মিশ্রণ ঘটালে যে মটর গাছ পাওয়া যাবে তার অর্ধেক হবে মিশ্রিত গাছ অর্থাৎ শঙ্কর, পিতামাতার পুরো বৈশিষ্ট্য থাকবে এখানে অবর্তমান, চার ভাগের এক ভাগ হবে বিশুদ্ধ লম্বা এবং চার ভাগের আর এক ভাগ হবে বিশুদ্ধ বেঁটে। এ নিয়মটির নাম হল ল অফ সিগ্রিগেসন।

মেণ্ডেল এমনিভাবে আট রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে পরীক্ষার কাজ করে গেছেন সেকথা তো আগেই বলেছি।

আজ আমরা উচ্চফলনশীল ধান তাইচুং, আই আর এইট প্রভৃতির কথা শুনি। কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না যে, এ সবের গোড়াপত্তনই করে গেছেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেল কাজ করেছেন মটর গাছ নিয়ে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য বহু উদ্ভিদ এবং পশুপাখীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়ে মেণ্ডেলের নিয়মের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

এবারে তাহলে আমার বোগেনভেলিয়া ফুল কটির রংএর একটা ব্যাখা খাড়া করা অসম্ভব হবে না।

নিজের আবিষ্কারের প্রতি বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞায় মেণ্ডেল খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তবে ক্লাশে এবং গীর্জার কাজে তিনি যথেষ্ট সম্মানই পেয়েছিলেন। ছাত্রদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। মৌমাছি পালন, পাখী ও ইঁদুর পোষা ছিল তাঁর হবি। এ সব দেখবার জন্যে তিনি প্রায়ই ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করতেন। সহরে সার্কাসের দল এলে তিনি ছাত্রদের নিয়ে সার্কাসের পশুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাতে এগিয়ে যেতেন। একবার তো একটা হনুমান তাঁর চশমা কেড়ে নিয়েছিল তার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার ফলে। যে সব ছাত্র পড়াশুনায় একটু কাঁচা তাদের তিনি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে বিনে পয়সায় পড়াতেন। পরবর্তীকালে তাঁকে অবশ্য শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কারণ এ সময় অলটব্রুন গীর্জার অধ্যক্ষের পদে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বোনের তিন ছেলের স্কুল-কলেজের সব খরচ পত্তর তিনি বহন করতেন সেকথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়বান্ধব-দের অনেককেই নানাভাবে অর্থসাহায্য তিনি করতেন। তার ওপর ছিল চেনাঅচেনা বহু লোককে সাহায্যের তহবিল। অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর মাইনে ছিল মোটা অঙ্কের। উৎসবের দিনে খাওয়ানোদাওয়ানোর জন্যে তিনি নিজের তহবিল থেকে অনেক টাকা খরচ করতেন।

শেষের কটা বছর মেণ্ডেলের সুখে কাটে নি। গীর্জার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দেশের সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে বিরোধ মেটে নি।

১৮৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারী দেহ রাখলেন মেণ্ডেল। দেশের সব লোক দুঃখ করল, তাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী পাদ্রী চলে গেলেন চিরতরে; ছাত্রেরা দুঃখ করল, তাঁদের একজন ভাল মাষ্টারের দেহরক্ষা হল; কিন্তু কেউই শোক প্রকাশ করল না। সেদিন একজন মহান বিজ্ঞানী এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

আশায় আশায়

শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

ঐ দেখো ঐ সূর্য ভোরের লাল
অল্প বেগনি পাড় দিয়ে রেখা টানা,
আজ যাহা শাদা—বর্ণবাহার কাল,
আজ চোখ মেলে কাল যাহা ছিল কানা!

ঐ দেখো ঐ সাগরে হাজার ঢেউ,
তীরে তার শুধু বালি সেথা নেই কেউ;
আজ যা শূন্য কাল তাহা ভীড়ে ভীড়,
জাহাজের বাঁশি কাঁপায় নতুন তীর।

ঐ দেখো ঐ দুঃখের দিন শেষ—
আসছে সোনালী মেহনতী মাঠে ফুল,
দল বেঁধে গড়ো মহামানবের দেশ
এসো ভাইবোন—চঞ্চল চুলবুল!

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

টোটো একটা টাকা পকেটে নিয়ে গেছে রথের মেলায়।

হরেক-রকম দোকানের সামনে দিয়ে পাশ দিয়ে ঘুরতে বেশ মজা লাগে। পুতুলের দোকান, খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, ওদিকে নাগরদোলা, এ পাশে বন্দুক ছুঁড়ে বেলুন ফাটানোর খেলা! ম্যাজিক, টকিং ডল কত রকমই না বসেছে, আর মেলার আবহাওয়া জমিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ টোটোর গলা শুকিয়ে কাঠ। সরবতের দোকানের পাশ কাটাল বলেই বোধ হয় হঠাৎ তার গলা শুকিয়ে গেল। ঠাণ্ডা সরবত খেলে হয়! না, তার চেয়ে ঐ বোতল ভরা কমলা-রঙের অরেঞ্জ স্কোয়াশ। বেশ বরফ থেকে তুলে দেবে।

সে বুক-পকেটে টাকাটায় হাত দিয়েছে এমন সময় তার পাশে এসে দাঁড়াল একজন অদ্ভুত লোক। ওর দিকেই তাকিয়েছে। চেনা বলে ত মনে হয় না। তবে ওর দিকে তাকিয়ে কেন? কি মতলব তার ঠিক নেই, হঠাৎ একটা কাগজ রোল করে পাকিয়ে টোটোর সামনে ধরল।

ওমা, লোকটা পাগল নাকি? পকেটমারও হতে পারে। কিন্তু একি! চোখের নিমেষে সেই রোল-করা পাকানো কাগজটা একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল হয়ে গেছে। টোটোও অজান্তে কখন হাতটা বাড়িয়েছে সেটা নেবার জন্যে। কিন্তু অমনি ভোঁ-ভাঁ! কোথায় বোতল? লোকটা হাতের চেটো খুলে পাঁচটা আঙুল দেখাচ্ছে।

লোকটা এবার কথা বলল। তার একরাশ কালো গোঁফ-

দাড়ির মধ্যে থেকে সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখা গেল। সে বলল ঐটা তোমায় কিনতে হবে, যেটা এইমাত্র দেখলে।

তার মানে? কোনটা কিনতে হবে?

ঐযে, অরেঞ্জ স্কোয়াশ। বলল লোকটা; দু'টো বোতল কিনবে। একটা তোমার জন্যে, একটা আমার জন্যে। আমারও ভারী তেষ্টা পেয়েছে কিনা?

আহা, কি আবদার! মনে মনে এ কথা বললেও টোটো কিন্তু পাশের দোকান থেকে এক টাকা দিয়ে দু'টো বোতলই কিনল। পকেট থেকে পয়সা নিয়ে জিনিস কিনে কাউকে খাওয়াতে বেশ মজা লাগে। মনে হয় যেন কাকা-বাবার মত সেও খরচ করতে পারে।

একটা বোতলে স্ট্র গলিয়ে সে দিল সেই লোকটাকে।

আচ্ছা, তুমি কি করে বোতল দেখালে কাগজ থেকে? স্ট্র দিয়ে টানতে টানতে বলল টোটো। তুমি কি যাদুকর নাকি?

লোকটা হাসল। হাসিটা বেশ মিষ্টি। টোটো তার সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে দেখছে তখন। একটা বেগুণী রঙের হাঁটু অবধি ঝোলা লম্বা পাঞ্জাবী। আর তার নীচে কালো পা-জামা। পায়ে একটা বাহারে নাগরাই জুতো। পিঠে একটা আকিবুকি ছাপা কাপড়ের ব্যাগ স্ট্র্যাপ দিয়ে ঝোলানো।

ঠিকই ধরেছ, বলল লোকটা। অবাক হয়ে গেছ তাই না?

হবই ত, বলল টোটো। অরেঞ্জ তৈরী করে আবার ভ্যানিস করলে কেন? দু'টো তৈরী করলে দু'জনে খেতে পারতুম, আমার টাকাটাও খরচ হত না।

তা কি হয়? যাদুর সরবৎ কি খাওয়া যায়? খেতে হলে কিনতেই হবে। আর কিনতে হলে খরচ হবেই।

তবে টাকা তৈরী করতে পার? বলল টোটো। তা দিয়ে কেনা যায়?

তাও হয় না। যাতুর টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আমার কাছে একটিও পয়সা নেই, তাই ত তোমার কাছে চেয়ে খাচ্ছি।

টোটো বলল, জানো, আমাদের স্কুলে একজন ম্যাজিকওলা এসেছিল। সে একটা টাকা থেকে এই এতগুলো টাকা করেছিল। দু'হাত ভর্তি করে তারপর সেগুলো মেঝেয় ফেলেছিল ঝন্‌ঝন্‌ করে।

সে ত আমিও পারি, বলে উঠল যাতুকর।

ছাই পার! আমি ম্যানড্রেকের গল্প পড়েছি। সে কত কি অদ্ভুত জিনিস করতে পারে। তুমি আসলে কিন্তু ভাল যাতুকর নও।

এবার হাসল যাতুকর।

ঠিক এমনি সময় হৈ-হৈ করে একটা ভীষণ সোরগোল উঠল। বাঁশীর শব্দ, নাগরদোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, ফেরিওলাদের হাঁকডাক, অ্যাম্‌প্লিফায়ারের হেঁড়ে আওয়াজ—এই সব ছাপিয়ে রব উঠল 'জয় জগন্নাথ'। ভীড়টা যেন উথলে উঠল। রাস্তা ভরা মানুষ, ছেলে-বুড়ো-মেয়ে চেপ্টে দলা পাকিয়ে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। হয়ত রথে টান পড়েছে। হবেও বা তাই, দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

এই ঠেলাঠেলির মধ্যে সেই অদ্ভুত লোকটি কোথায় যেন ছিটকে পড়েছিল। টোটো এদিক-ওদিক নজর চালিয়ে কোথাও তার টিকিও দেখতে পেল না। পাবেই বা কি করে? নিজেকে সামলানোই শক্ত। ভীড়ের মধ্যে নিজেই হারিয়ে যেতে হয়।

ভীড়ের দাপাদাপি থেকে একটু ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াল টোটো। সেটা ফুটপাত। আর পাশেই একটা হরেক রকম মুখোশের দোকান। আর ঠিক সেই সময় একটা বেগুণী পাঞ্জাবীও এসে দাঁড়াল তার কাছে। টোটো ভাবল, তার কাছে আর একটাও পয়সা নেই। আর কিছু কিনতে পারবে না সে। ও চাইলেও না।

ভীড়ে হারিয়ে গিছলে? বলল যাতুকর। তোমাকে খুঁজছিলুম

একটা জিনিস দেব বলে। এই বলে সে তার ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট আয়না বার করে টোটোর হাতে দিয়ে বললে, এইটা দিতে এলুম তোমায়।

• টোটো দেখল একটা ছোট্ট আয়না, তার হাতের চেটোর মত হবে।

কি হবে এটা ?

একটা ছোট্ট আয়না

রেখে দাও, কাজে লাগতে পারে। বলেই লোকটা সেই যে পেছন ফিরল আর এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে দেখা গেল না। ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য।

টোটো আয়নাটা আবার দেখল। কাঁচটা একটু সবজে রঙের,

গড়নটা মন্দ নয়। সে ভাবল বড়দির সাদা হাত-ব্যাগে আয়না থাকে। বড়দিকেই এটা দিয়ে দেব যদি বড়দির পছন্দ হয়। তারপর সে ভীড় ঠেলে বাড়ির পথ ধরল। পথে চেনা দু'-চার জনের সঙ্গে দেখা হল কিন্তু সেই বেগুণী জামার টিকিও দেখতে পেল না সে। ছোট্ট আয়নাটা পকেটে রেখে হাত দিয়ে চেপে সে বাড়ি ফিরল।

এই বাবু এতক্ষণ পরে বাড়ি ঢুকলেন। সেজ-কাকার উচ্চকিত অভ্যর্থনা কানে এল তার।

কে যেন বলে উঠল টো-টো করে ঘুরতে পেলে আর কিছু চায় না ও।

তা কি করবে, আবার সেজ-কাকা আওয়াজ ছাড়েন, ওর নামের সদ্ব্যবহার করবে ত!

লেখাপড়ায় টোটোর সুনাম ছিল না বলে সে প্রায়ই তার নামের সঙ্গে মুখ্যু গাধা দিগ্‌গজ ইত্যাদি বিশেষণ উপহার পেত।

টোটোর দিদি মিমি একটা ধাঁধার পাতায় চোখ রেখে বললে, এই টোটো, আচ্ছা বলত,—লচমাহি কথাটার মানে কি? এটা ইতিহাসে আছে না ভূগোলে আছে? তারপর বল রীবদাগো, থনারসা কারিমেআ।

কি ভাষা রে ওগুলো? সেজকাকা আবার হাঁক ছাড়েন।

টোটো পাশের ঘরে এই সময় পকেট থেকে আয়নাটা বার করে দেখছিল। সে ওটা হাতে নিয়েই দিদির কাছে এল।

মিমি বলল, বল দেখি থনারসা জিনিষটা কি?

টোটো আয়নার দিকে তাকিয়েই মুখে আওড়াল থ-না-র-সা? হঠাৎ তার চোখে পড়ল আয়নার মধ্যে একটা লেখা, সে পড়ল 'সারনাথ'। আয়নার সামনে উল্টো লেখা ধরলে যেমন সোজা হয়ে যায় তেমনি হল যেন।

মিমি বলল, ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, রীবদাগো?

টোটো আয়নায় পড়ে বলল, গোদাবরী। এমনি করে লচ-মাহি আর কারিমেআকে পড়ে বলল, হিমাচল, আমেরিকা।

বেশ টপ্‌. টপ্‌. করে বললিত! মিমি অবাক না হয়ে পারে না।

সেজকাকা দালান থেকে বললেন, টোটোর মাথা খুলেছে দেখছি। আচ্ছা বলত, ২৭ কে ১১ দিয়ে গুণ করলে কত হবে?

টোটো আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে একটা অঙ্ক লেখা রয়েছে ২৯৭। সে বলে উঠল, দু'শ সাতানব্বই।

বাঃ! ঠিক বলেছিস। আচ্ছ, বল দেখি ব্রেজিলের রাজধানীর নাম কি? এটা আর বলতে হচ্ছে না।

টোটো কি জানি কেন মনে মনে প্রশ্নটা করতে করতে আয়নার দিকে তাকাল। আর তাতে কি একটা লেখা রয়েছে। সেটা পড়ে সে বলল, রিও-ডি জেনিরো।

ঠিক এমনি সময় টোটোর মা রান্নাঘর থেকে হাঁক দিলেন, এই, তোরা সবাই আয়, খেতে দিয়েছি।

টোটো যেন মজা পেয়েছে। ছোট্ট আয়নাটিকে সে রাখে কাছে কাছে। বড়দের কাছে গেলেই ত প্রশ্ন। হরেক রকম প্রশ্ন। দেবু জ্যাঠা একদিন বললেন, টোটো নাকি খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছে—আমি একবার ওকে টেস্ট করব। আচ্ছা, বলতে পারবি রকি পর্বতমালা কোথায়?

টোটো ঘাড় নীচু করে বলল, উত্তর আমেরিকায়।

আচ্ছা, মোটর গাড়ী প্রথম কে আবিষ্কার করেন?

টোটো বলল, অটো।

বারে এত ঠিক বলছে! আচ্ছা, ভারতবর্ষে এখন লোক সংখ্যা কত?

টোটো তার ছোট্ট মেড-ইজি দেখে বলল, চুয়াম্নকোটি সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শ পঁয়ত্রিশ।

হলো না, দেবু জ্যাঠা বলে উঠল, আমার যেন মনে হচ্ছে পঞ্চান্ন কোটিরও বেশী হবে।

সেজকাকা বললেন, না না, ও ত ঠিকই বলেছে, এবারের সেন্সাসের ফিগার।

টোটো সেবারে ক্লাশে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তার পকেট বন্ধুটিকে নিয়ে গেল। প্রশ্নপত্র থেকে লেখবার সময় আয়নাটা পাশে রাখত। স্যারেরা ভাল করে দেখলেন আয়নার ওপরে পিছনে কোথাও কিছু টোকা নেই। সুতরাং ঐ নিরীহ জিনিষটিতে তাঁদের আপত্তি হল না।

পরীক্ষার ফল বেরুতে টোটো প্রায় পুরো নম্বর নিয়ে প্রথম হয়ে এল। সবাই অবাক। হঠাৎ টোটো এত ভাল হয়ে গেল কি করে?

দেবু জ্যোঠা বললেন, ওরে ওরকম হয়। ব্রেনের মধ্যে সব থাকে ত। যত সব বুদ্ধি প্রতিভা সব ডালা চাপা থাকে। ডালাটা খুলে ফেল্লেই হল। ঐ যে বলে না, মাথা খুলে যায়। আমার লাইফেই ত হয়েছে। ক্লাশ সিক্স থেকে উঠতে পরীক্ষায় অঙ্কেতে পেলুম থারটি ফোর। ভারী রাগ হল নিজের ওপর। তারপর এইসা খাটতে লাগলুম যে হাফইয়ারলিতে অঙ্কের নাম্বার চড়াক করে উঠে গেল এইটিফাইভে।

সেজকাকা বললেন, তুমি ত ইংরেজি আর সংস্কৃতে কাঁচা ছিলে শুনেছি।

দেবুজ্যাঠা পট করে বললেন, আরে সে ত মাষ্টাররা হিংসে করে নম্বর দিত না আমায়—।

টোটোর বন্ধু জয় ওর পাশে বসে। কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হলে টোটো বলে দেয়। আর সে যা বলে তাই হয় কারেক্ট। আর ঠিক এই জন্যেই অন্য ছেলেরা জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়। সবাই ঘিরে ধরে টোটোকে।

আঃ কি যে করিস! বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে টোটো। যাঃ, তোদের কাউকে কিছু বলব না। যত সব মুখ্যুর দল!

টোটোর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। টিচাররা পর্যন্ত টোটোকে রীতিমত সমীহ করেন। শক্ত গোলমেলে প্রশ্ন এসে গেলে তাঁরা টোটোর মুখের দিকে তাকান। এ হেন টোটো বন্ধুদের মুখ্যু বলবে না কেন? সবাই বলে, টোটোর কী গুমোর!

সত্যিই তাই। সেও জানে যে সে সবার চেয়ে পণ্ডিত। কেউ তাকে ঘাঁটাতে চায় না। কেউ কেউ বলে টোটো কালে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে উঠবে। কেউ বলে প্রোফেসার বা ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া ওর কাছে কিছু নয়। হাইকোর্টের জজ হওয়াও সম্ভব। কেউ আরও এগিয়ে যায়। বলে দেশের প্রধান মন্ত্রী হওয়াই বা বিচিত্র কি? সবই যার জানা, সবই যার নখ-দর্পণে তার আর বাধা কি? ও তো যত খুশী বড় হতে পারে।

টোটোও মনে মনে এই রকম বিশ্বাস করে। কিন্তু ঐ ছোট্ট আয়নাটাকেই ওর ভয়। ওর যাদুক্ষমতা যদি চলে যায়? কিংবা যদি ওটা চুরি যায়? বন্ধুদের কেউ কেউ যে ষড়যন্ত্র করছে না তা নয়। সন্দেহ করে ঐটার মধ্যে কিছু আছে। কিংবা যদি সেই যাদুকর হঠাৎ কোনোদিন এসে পড়ে। আর এটা ফেরৎ চেয়ে বসে?

টোটো মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছে। সমবয়সী ছেড়ে বড়দের মধ্যেই তার খাতির বেশী। কেন না তারাই ওকে বলে—সবজান্তা।

কেন, আমি কি সত্যিই সবজান্তা নই? যে কোনো সমস্যা, যে কোন প্রশ্ন কে পারে উত্তর দিতে? আচ্ছা, আমি তাহলে পৃ-থি-বীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী—তাই না?

কেমন যেন সন্দেহ হয় টোটোর। এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? অন্যে যদি বলে তবেই তো।

কেন? ঐ আয়নাকেই তো জিজ্ঞেস করা যায়। সে যদি বলে তাহলে আর সন্দেহ থাকে না। সে তো সত্যি ছাড়া বলে না।

টোটো একদিন নিভৃতে এই রকম প্রশ্নপত্র নিয়ে আয়নার সামনে হাজির হল। সে বলল, আয়না, আমি কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পণ্ডিত নই ?

প্রশ্নের উত্তরপত্রও দেখা গেল। কিন্তু তা দেখে টোটোর চোখ বড় বড় হয়ে যায়। আয়নায় তার ছবিই সে দেখল, শুধু কান-ছুটো লম্বা হয়ে গাধার কানে দাঁড়িয়েছে। মুখশ্রীও গর্দ্দভের চেয়ে বিশেষ ভাল নয়। আর ঐ শ্রীমুখের তলায় লেখা আছে "তুমি একটি আস্ত গাধা!"

এত বড় কথা! রাগে বিষম ক্ষেপে গিয়ে আয়নাটা সবেগে ছুঁড়ে ফেলল টোটো। সে যে বোকামি করেছে ভাববার আগেই সে দেখে আয়নাটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

রবীন্দ্রনাথ

তথাস্তু

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

কথক	নারদ
পরীক্ষিৎ	শিব
শুকদেব	ব্রহ্মা
বৃকাসুর	বিষ্ণু (নারায়ণ)

[মাইক প্লে বা রেডিও প্লের মতন অভিনয় করতে হবে।

কথকের পার্ট যিনি করবেন তিনি কথকতার ঢংএ বা গল্প বলার মতন করে অভিনয় করলে ভালো হবে। বাকি অভিনেতারা সহজ স্বাভাবিক ভাবে পার্ট বলবেন।

অভিনয় যে কোন জায়গায়, যেমন হলে, বারান্দার উঠানে বা ঘরের ভেতর হতে পারে। পার্ট মুখস্থ না থাকলেও কোন অসুবিধে নেই। বই দেখে বললেও চলবে। মাইক পেলে ভাল হয়, না হলে মাইক ছাড়াও চলতে পারে]

কথক—ভাগবতের অমৃত মধুর কথা শুনতে শুনতে রাজা পরীক্ষিৎ এক সময় শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন :

পরীক্ষিৎ—প্রভু ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে প্রকৃত দয়াময় কে ?

কথক—প্রশ্ন শুনে শুকদেব মহা খুসি। তিনি বললেন :

শুকদেব—অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন মহারাজ ! এরূপ প্রশ্ন আপনারই যোগ্য। একটি মজার ঘটনা বলি শুনুন তবে—

বৃকাসুর নামে শকুনির এক পুত্র ছিল। একবার তার মনে খেয়াল হলো যে সে মুনি-ঋষিদের মত বনে গিয়ে তপস্যা করবে। তপস্যা তো করবে কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কাকে ছেড়ে কার তপস্যা করবে তা সে কিছুতেই স্থির করতে পারলো না। বিরল-

বদনে বসে বসে তপস্যার কথা ভাবছে এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে উপস্থিত। দেবর্ষিকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বৃকাসুর বললে :

বৃকাসুর - ঋষিরাজ আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েছি।

নারদ—কি মুস্কিল বাবাজি ?

বৃকাসুর—মুনি-ঋষিরা যেমন বনে গিয়ে তপস্যা করেন, আমারও তেমনি তপস্যা করতে মনে বাসনা হয়েছে।

নারদ—আরে! এ ত' খুব ভালো কথা। এতে আর মুস্কিলের কি আছে ?

বৃকাসুর—প্রভু! অল্প তপস্যায় কোন্ দেবতা খুশী হন সেটা যদি আমায় বলে দেন ত' বড়ই উপকার হয়। আমি তা হলে কালবিলম্ব না করে তাঁর তপস্যা সুরু করে দিই।

নারদ—কি বললে বাপু! অল্প-তপস্যায় সন্তুষ্ট ?

বৃকাসুর—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! জানেন ত' কি বিশ্রী মেজাজ আমার। বহুকাল ধরে তপস্যা-টপস্যা করা আমার পোষাবে না।

নারদ— তুমি তা হলে শিবের তপস্যা করো। শিব অতি অল্পেই সন্তুষ্ট। তাই লোকে তাকে আশুতোষ বলে। অমন প্রাণখোলা দয়াময় দেবতা অমরমণ্ডলে আর কেউ নেই।

কথক—এই বলে নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন। বৃকাসুরের আর তর সয় না। সে তখনি হিমালয়ের পথে যাত্রা করলো। সেখানে পৌঁছে একটি নির্জন মনোরম স্থান বেছে নিয়ে সুরু করে দিল শিবের তপস্যা। সেই ঘোর তপস্যা চললো সাত দিন সাত রাত্রি ধরে। কখন দিন ফুরিয়ে রাত্রি হচ্ছে—রাত্রি ফুরিয়ে দিন আসছে তা তার খেয়ালই রইলো না। জপ-তপ, পূজো-আচ্চা সাঙ্গ করে বৃকাসুর নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে আগুনে আহুতি দিল। কিন্তু হায়, দেব ত্রিলোচনের তখনো দেখা নেই। অদম্য ক্রোধের উদয় হল বৃকাসুরের মনে। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। বহু কষ্টে ক্রোধ দমন করে সে মনে মনে স্থির করলো এবার

নিজের মাথা কেটে আগুনে পূর্ণাহুতি দেবে। খড়্গ তুলে বৃকাসুর নিজের মাথা কাটতে যাচ্ছে এমন সময় দেবাদিদেব মহাদেবের আবির্ভাব। বৃকাসুরের হাত ধরে ফেলে শিব বললেন:

শিব—ক্ষান্ত হও বৎস, শিরশ্ছেদ ক'রো না।

কথক—পূর্ণাহুতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃকাসুর চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলো:

বৃকাসুর—কে তুমি আমার পূর্ণাহুতিতে বাধা দিলে?

শিব—আমাকে চিনতে পারলে না? আমি শিব, মহাদেব। তুমি এতদিন ধরে যার তপস্যা করছিলে আমি সেই শিব। তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি আমি, তুমি কি বর চাও তা আমাকে বলো।

বৃকাসুর—আমায় ক্ষমা কর প্রভু, আমি ঠিক চিনতে পারি নি।

শিব—আরে আরে, ঠিক আছে। তুমি কি চাও তাই আমাকে ঝট্‌পট্‌ বলে ফেলো।

বৃকাসুর—প্রভু, যদি সত্যিই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকো ত' এই বর দাও যে যার মাথায় আমার এই ডান হাতখানা ঠেকাবো সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে।

শিব—তথাস্তু।

কথক—তথাস্তু বলে শিব সেখান থেকে চলে গেলেন। এমন একখানি চমৎকার বর পেয়ে বৃকাসুর আনন্দে নেচে উঠলো। এদিকে দেবর্ষি নারদ ব্যাপারটি সব জেনে ফেলেছেন। দেবর্ষি ভাবলেন একটু মজা করা যাক, এই ভেবে বৃকাসুরের কাছে এসে তিনি বললেন:

নারদ—কি হে বাপু, তপস্যা-টপস্যা করলে কিছু?

বৃকাসুর—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নারদ—কার তপস্যা করলে?

বৃকাসুর—কেন? আপনি ত শিবের তপস্যা করতে বললেন। আমি তাই করেছি।

নারদ—বেশ, বেশ! তা শিবের দেখা পেয়েছো ত'? কি বললেন তিনি? কি বর দিলেন?

বৃকাসুর—বর দিলেন এই যে আমি যার মাথায় ডান হাতখানা ঠেকাবো সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে।

নারদ—বাঃ, খাসা বর পেয়েছো ত'। এ বর যদি সত্যি হয় তা হলে তোমার মত শক্তিমান্ ত্রিভুবনে আর কেউ থাকবে না। তা, ইয়ে—মানে বর যা পেলে সেটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছো ত'?

বৃকাসুর—কই না, তা ত' দেখি নি!

নারদ—দেখো নি? তবেই হয়েছে।

বৃকাসুর—কেন ঠাকুর? এ কথা কেন বলছেন?

নারদ—আরে বাপু! বলছি কি আর সাধে? শিবের বর আজকাল আর তেমন খাটে না। যে যা চায় ফস্ করে তথাস্তু বলে ফেলে। কারও ভাগ্যে সেটা ফলে আবার কারো কারো ভাগ্যে একেবারেই ফলে না। শিবের শ্বশুর দক্ষ শাপ দেবার পর থেকে এমনটা হয়েছে। এই ত' সেদিন আমাকে—থাক্, সে সব কথা এখন না বলাই ভাল। তাই বলছিলাম বর যেটা পেলে সেটা একটু দেখে নিলে ভালো হতো।

বৃকাসুর—তা হলে কি করি বলো ত' ঋষিরাজ?

কথক—বৃকাসুর খুব মুষড়ে পড়েছে। মুখের হাসি গেছে মিলিয়ে। মন সন্দেহে ভরে উঠেছে। ঋষিরাজ পাকা খেলোয়াড়। মনে তাঁর গোড়া থেকেই একটা বদ্ মতলব ছিল। মুখ গম্ভীর করে ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন:

নারদ—কি আর করবে বাপু! বর যেটা পেলে সেটা সত্যি না ঝুটো তা একটু পরখ করে দেখে নাও।

বৃকাসুর—পরীক্ষা কি করে করবো ঋষিরাজ?

নারদ—শিবের কাছে গিয়ে বলো যে তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে তুমি বরটি পরীক্ষা করে দেখে নেবে। বর যদি মিথ্যে হয় তা

হলে দেখবে তোমার বর পরীক্ষার প্রস্তাব শুনে শিব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে। এক নিমেষও দাঁড়াবে না।

কথক—দেবর্ষি নারদের মাথার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে ডান হাত তুলে বৃকাসুর কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, নারদ কয়েক পা সরে গিয়ে তাকে তাড়া লাগিয়ে বললেন:

নারদ—বাজে কথায় মিছে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি শিবকে ধর গে যাও, নইলে সব মাটি।

কথক—এই বলে দেবর্ষি নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান হলেন। বৃকাসুর কালবিলম্ব না করে ছুটে চললো শিবকে ধরতে। বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর দেখতে পেলো শিব চলেছেন পাহাড় ভেঙ্গে দূরে বহুদূরে। বৃকাসুর চীৎকার করে শিবকে ডেকে উঠলো:

বৃকাসুর—হে শিব। হে মহাদেব! দয়া করে একটু দাঁড়াও, আর এগিও না। তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরী একটা কথা আছে।

শিব—(জড়িত কণ্ঠে) কি কথা বাবাজী?

বৃকাসুর—তোমার বোধ হয় মনে আছে একটু আগে আমাকে বর দিয়েছো যে যার মাথায় আমার এই ডান হাতখানা ঠেকাবো সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে।

শিব—(হাসিমুখে) বাপু হে! সব কথা যদি আমার মনেই থাকবে তাহলে লোকে আমাকে ভোলা-দিগম্বর বলে ডাকবে কেন? তুমি কি বলতে চাও ও নামটা আমার মিথ্যে? তোমাকে কখন কি বর দিয়েছি না দিয়েছি তা আমার কিচ্ছু মনে নেই। যাই হোক, এখন তুমি কি চাও তাই বলো।

বৃকাসুর—তোমার মাথায় হাত ঠেকিয়ে সেই বরটা একটু পরীক্ষা করে দেখে নেবো। একটু দাঁড়াও, আর এগিও না।

কথক—এই বলে ডান হাতখানা উঁচিয়ে বৃকাসুর ছুটে চললো শিবের দিকে। বৃকাসুরের কথা শুনে শিবের ত' চক্ষু চড়কগাছ! আক্কেল গুড়ুম! নিমেষ মাত্র দেরী না করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালেন শিব। শিব ছোটেন আর ভাবেন:

শিব—কী সর্বনাশের কথা! অসুরগুলোর কি ধর্মজ্ঞান একেবারে নেই? আমি ওকে অমন চমৎকার একটা বর দিলাম আর ও কিনা সেই মারাত্মক বরটা আমারই ওপরে খাটাতে চায়? আমার মাথায় হাত ঠেকিয়ে আমাকে ভস্ম করে দিতে চায়? ভোলানো! আমারও যেমন হয়েছে! মুখের আগঢাক নেই। কোন কিছু
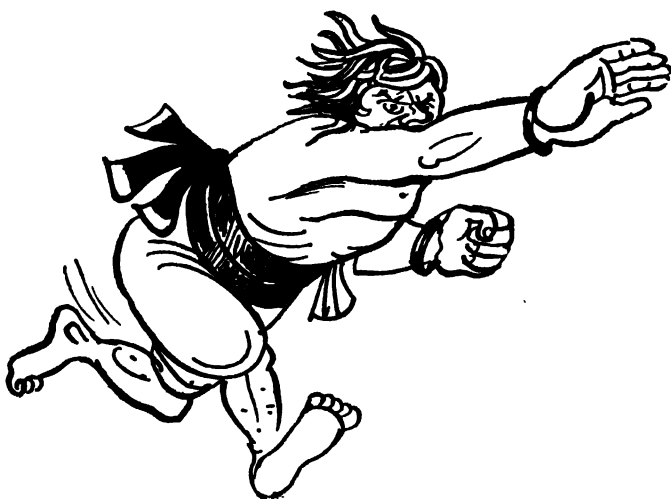
বৃকাসুর প্রাণপণে ছুটে আসছে

মনেও থাকে না। মুখে যখন যা আসে ফস্ করে তাই বলে ফেলি। তথাস্তু যেন ঠোঁটের গোড়ায় লেগেই রয়েছে। সাধে কি আর শিবানী রাগ করে যখন তখন বাপের বাড়ী চলে যেতে চান?

কথক—শিব ভাবেন আর ছোটেন, ছোটেন আর ভাবেন। এদিকে বৃকাসুর প্রাণপণে ছুটে আসছে শিবকে ধরতে। শিবের এইভাবে ছুটে পালানো দেখে সে মনে মনে বলছে:

বৃকাসুর—নারদ ত' ঠিকই বলেছিল যে বর মিথ্যে হলে শিব ছুটে পালাবে। ইস্! এত কষ্ট করে তপস্যা করার এই ফল হলো!

আমার সঙ্গে চালাকি ! ঝুটো বর দেওয়া আমাকে ? আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি কোথায় পালায় ? ও যেখানে যাবে আমিও সেইখানে যাবো। অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে পালাবে কোথায় ? এই ডান হাতখানা ওর মাথায় ঠেকিয়ে বর পরীক্ষা করে তবে ছাড়বো।

কথক—বৃকাসুর আরও জোরে ছুটতে লাগলো। তখন শিবও ছোটেন, বৃকাসুরও ছোটে। ছুটতে-ছুটতে ছুটতে-ছুটতে সারা জগৎটাকে বার কতক চক্কর মারা হয়ে গেল। কিন্তু হায় ! কোথাও লুকোবার সুবিধে হলো না। হঠাৎ শিবের ব্রহ্মার কথা মনে পড়ে গেলো। ব্রহ্মলোকে হাজির হয়ে তাঁর বিপদের কথা সবিস্তারে জানিয়ে শিব ব্রহ্মার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। বৃকাসুরের নাম শুনে ব্রহ্মা রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন :

শিব ভাবেন আর ছোটেন

ব্রহ্মা—ভায়া ! আমাকে আর বুড়ো বয়সে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনছো কেন ? তোমাকে এখানে আশ্রয় দিলে ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ অসুরটা কি আর আমাকে আস্ত রাখবে ? তুমি

ভাই, আমার বহুদিনের বন্ধু! তোমাতে আমাতে সেই ছেলেবেলা থেকে কত ভাব! তোমার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু ভাই, এখানে তোমার লুকোবার স্থান হবে না। তুমি শীগ্‌গির এখান থেকে পালাও, আমাকে আর বিপদে ফেলো না

কথক—এত কথা শোনার পরেও শিব ব্রহ্মার পেছনে চুপটি করে লুকিয়ে রইলেন মুখে কথাটি নেই। হাজার বকাবকিতেও নড়বার নামটি নেই। ব্রহ্মা দেখলেন মহা বিপদ্। ভুরু কুঁচকে বিড় বিড় করে বললেন :

ব্রহ্মা—ভুল করেই হোক বা রেগে গিয়েই হোক অসুরটা এসে শিবের বদলে আমার মাথায় হাত ঠেকালেই ত' কর্ম সাবাড়! মিথ্যে তর্কাতর্কি না করে সময় থাকতে এখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কথক—এমন সময় ব্রহ্মা দেখলেন বৃকাসুর ডান হাতখানা উঁচিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে, আর শিব ভয়ের চোটে পিছন থেকে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে চেষ্টা করছেন। অতি কষ্টে শিবের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্রহ্মা সে স্থান ত্যাগ করে পালালেন। ব্রহ্মার ব্যবহারে শিবের মনে যারপর নাই দুঃখ হলো। তিনি প্রাণের মায়া প্রায় ত্যাগ করেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো বিপদবারণ বিষ্ণুর কথা। এই সাংঘাতিক বিপদ্ থেকে উদ্ধার করতে একমাত্র বিষ্ণুই পারেন। তাঁরই অভয় চরণে আশ্রয় নিলে হয়ত' উদ্ধার পাওয়া যাবে। মনে মনে বিষ্ণুনাম জপ করতে করতে বৈকুণ্ঠের পথ ধরে ছুটতে লাগলেন শিব। ছুটতে ছুটতে পিছন্ ফিরে দেখলেন বৃকাসুর ডান হাতখানা উঁচিয়ে তাঁকে তাড়া করে আসছে। প্রায় ধরো ধরো অবস্থা। মহাভয়ে মহাদেব তখন মহাবেগে ছুটতে লাগলেন। ওই মোটা শরীর নিয়ে অত জোরে ছোটা তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে হাপরের মত। বিশাল বপুটি থেকে থেকে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘামে ভিজে গেছে

সর্বশরীর। বাঁ বগল ও ডান বগল বেয়ে ভাগীরথী ও সুরধুনী নির্গতা হয়ে উত্তাল তরঙ্গে কল কল ছল ছল শব্দে প্রবাহিতা হচ্ছেন। বাঘাম্বর কোথায় এবং কখন কোমর থেকে খসে পড়ে গেছে তা হুঁস নেই। একেবারে দিগম্বর বেশ। শিব ছুটে পালাচ্ছেন। প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব। আর সেই অখণ্ডমণ্ডলাকর ভুঁড়িটি চুপ্‌সে এই এতটুকু হয়ে গেছে—যেন টোপা কুলের বিচিটি।

এদিকে নারায়ণ শিবের বিপদের কথা জানতে পেরেছেন। শিবকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি বৈকুণ্ঠপুরীর সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় শিব হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে উপস্থিত। দু'হাতে চোখ ঢেকে নারায়ণ বলে উঠলেন:

নারায়ণ—আরে আরে, এ কি ব্যাপার! এ অবস্থা কেন? কাপড়চোপড় সব গেলো কোথায়?

কথক—ভীষণ ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে শিব কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নারায়ণ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজের গায়ের চাদরখানা তাঁর গায়ে ছুড়ে দিয়ে বললেন:

নারায়ণ—থাক থাক, কথা পরে হবে। আগে এইটে কোমরে জড়িয়ে নাও, তারপর যা বলবার তা বোলো।

কথক—বিপদের কথা সব খুলে বলে শিব তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। শিবকে অন্দর-মহলে লক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নারায়ণ বৈকুণ্ঠপুরীর সিংহদরজা আগলে রইলেন। একটু পরেই বৃকাসুর এসে হাজির হলো। তার চোখমুখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

বৃকাসুর—প্রভু, মহাদেব শিবকে এদিকে আসতে দেখেছেন?

নারায়ণ—কেন বাপু? তাকে তোমার কি দরকার?

বৃকাসুর—আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিনি বর দিয়েছেন যে আমি যার মাথায় আমার এই ডান হাতখানা ঠেকাবো সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে। শিবের মাথায় হাত ঠেকিয়ে তাঁর বর পরীক্ষা করার জন্যে

আমি তাঁকে খুজে বেড়াচ্ছি আর তিনি আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

নারায়ণ—লোকে যে তোমাকে বোকা আহাম্মক বলে তা দেখছি মিথ্যে নয়।

বৃকাসুর—কেন প্রভু ?

নারায়ণ—এত দেবদেবী থাকতে তুমি শিবের তপস্যা করতে গেলে কোন্ আক্কেলে ?

বৃকাসুর—আ—আমি—

নারায়ণ—আরে, তার কি আর মতিস্থির আছে ? সারা দিনরাত সে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। শ্মশানে মশানে ভূতপেতনী নাচিয়ে বেড়ায়। এটা ওটা খায়। অনেকে ত' ওকে দেবতা বলে মানতেই চায় না। যখন যা মুখে আসে ফস্ করে তাই বলে ফেলে। একটু জল আর বেলপাতা দিয়ে বর চাইলেই অমনি "তথাস্তু"। তা সে বর ফলুক আর নাই ফলুক। তুমি বাপু, এমন আহাম্মক যে আর সব দেবতাকে ছেড়ে তারই তপস্যা করে সময় নষ্ট করলে ?

বৃকাসুর—প্রভু ! আমি ত' এত সব জানতাম না। দেবর্ষি নারদ বললেন যে দেবতাদের মধ্যে শিবই সবচেয়ে অল্পে সন্তুষ্ট। তাই ত' আমি তাঁর তপস্যা করলাম।

নারায়ণ—ওঃ ! এর মধ্যে আবার নারদও আছেন ? তবে ত' সোনায় সোহাগা ! বাপু, শিবের বর যদি মিথ্যে না হবে তাহলে ভাব দেখি তোমাকে বর পরীক্ষা করতে না দিয়ে সে এমন করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে কেন ?

বৃকাসুর—আমিও ত' সেই কথাই ভাবছি।

নারায়ণ—এখন আর অত ভেবে কি করবে বাপু ! যা হবার তা ত' হয়েই গেছে। এখন আর অত ভেবে লাভ কি ? তোমার অত বড় মাথাটায় যে একফোঁটাও বুদ্ধি নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বৃকাসুর—এ কথা বার বার কেন বলছেন প্রভু ?

নারায়ণ—বলছি কি আর সাধে? শিব না হয় তোমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তোমার ঘাড়ের ওপর ওই যে অত বড় মাথাখানা রয়েছে, সেটা ত' আর তোমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না?

বৃকাসুর—(থতমত খেয়ে) আজ্ঞে না—

নারায়ণ—তবে?

বৃকাসুর—(আরও থতমত খেয়ে) তবে কি?

নারায়ণ—শিবের দেওয়া বর সত্যি কি মিথ্যে সেটা ত' তুমি নিজের মাথায় হাত ঠেকালেই বুঝতে পারবে।

বৃকাসুর—(সম্পূর্ণরূপে মোহগ্রস্ত ভাবে) ঠিক বলেছেন প্রভু! এ—এ কথাটা এতক্ষণ আমার খেয়ালই হয় নি।

কথক—এই বলে বৃকাসুর যেমনি নিজের মাথায় ডান হাতখানা ঠেকিয়েছে অমনি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো আর নিমেষের মধ্যে সে ভস্ম হয়ে গেলো। মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পেলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

বিপদ্ কেটে গেলো। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। কথা শেষ করে শুকদেব বললেন:

শুকদেব—শুনলেন ত' মহারাজ, ভক্তকে বর দিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন আশুতোষ শিব? অমন অল্পে সন্তুষ্ট ব্যোম-ভোলা দিল-দরিয়া দয়াময় দেবতা ত্রিভুবনে আর কোথাও পাবেন না।

রক্ত কেন লাল

শ্রীকালিদাস নন্দী

লাল রং তোমরা সবাই পছন্দ কর। ছোট্ট ছোট্ট ভাই-বোনেরা একটা লাল বল বা লাল পুতুল পেলে কত খুশীই না হয়! লাল গোলাপ তোমাদের সবারই খুব প্রিয়। পূজোর সময় একটা লাল পোষাক তো গর্বের জিনিস। খুব লাল হলে আমরা বলি টুক্‌টুকে লাল। আবার অনেক সময় বলি রক্তের মত লাল। রক্ত কেন লাল হয় জান? সে খুব মজার ব্যাপার!

তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে হাত-পা কেটে গেলে রক্ত ঝরে পড়ে। রক্ত জলের মত তরল, তবে জলের চাইতে একটু বেশী গাঢ়। লক্ষ করে থাকবে যদি সেই রক্ত কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকে তবে লাল জমাট-বাঁধা একটা অংশ আলাদা হয়ে পড়ে, আর তার পাশ থেকে জলের মত তরল একটা পদার্থ গড়িয়ে যায়। এই জমাট-বাঁধা লাল অংশের বেশীর ভাগ হ'ল "লাল কণিকা" এবং এদের জন্যই রক্তের রং লাল হয়। অবশ্য এই অংশে "লাল কণিকা" ছাড়া "সাদা কণিকা" এবং অন্যান্য কয়েক রকমের পদার্থও থাকে, যদিও তুলনায় তাদের পরিমাণ অনেক কম। "লাল কণিকার" জীবন-কাহিনীটাও খুব চমকপ্রদ।

আমাদের শরীরে রক্তের মাঝে কোটি কোটি "লাল কণিকা" আছে। কাজেই বুঝতে পারছ এরা কত ছোট। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের আয়তনকে অনেকগুণ বাড়িয়ে নিয়ে তবেই আমরা এদের দেখতে পাই। এরা দিনরাত আমাদের রক্তের জলীয় অংশে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায়। ভাবতে ভারি মজা লগে, তাই না? শুনলে অবাক্ হবে যে এদের এই বিরামবিহীন সাঁতারের যে পথ তার দৈর্ঘ্য ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মাইল পর্যন্ত

হয়। অবশ্য এই পথটা আদৌ সোজা নয়। এঁকেবেঁকে ঘুরেফিরে এই পথের বিস্তার।

এত ছোট হলে কি হবে? এরা সবাই কিন্তু সজীব এবং এদের জন্ম আছে, আছে মৃত্যু। শুধু কি তাই? সাধারণ ভাবে ১২০ দিন পরমায়ুর মাঝেই এদেরও আমাদের মত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য আসে। জন্ম-মৃত্যুর গড় হার প্রতি মিনিটে ৭ কোটির সামান্য কিছু বেশী, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৭ কোটির কিছু বেশী জন্মাচ্ছে এবং সমসংখ্যক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মোট সংখ্যা তা হলে কত কোটি হতে পারে ভেবে দেখতে পার। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী সবাই জন্মের সময় খুবই ছোট থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের দেহের সব রকমের আয়তন বেড়ে যায়। কিন্তু এদের বেলায় সেটা ঠিক উল্টো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের দেহের আয়তন কমতে থাকে। জন্মাবার সময় দেহের যে আয়তন থাকে পরিণত বয়সে দৈহিক আয়তন তার প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। এরা সাধারণতঃ জন্মায় হাড়ের ভিতরের মজ্জা থেকে, যাকে আমরা বলি "অস্থি-মজ্জা"। আস্তে আস্তে দেহ পরিণত হয়ে ওঠে, তারপর একদিন টুক্ করে রক্তস্রোতের মাঝে ঢুকে পড়ে সাঁতার কাটতে সুরু করে দেয়।

"লাল কণিকা" কি থেকে তার এমন সুন্দর লাল রংটি পায় তা শুনলেও তোমরা তাজ্জব বনে যাবে। লোহা তোমরা সবাই চেন। এ কথাও জান যে লোহার রং কালচে এবং দেখতে এমন কিছু ভালো নয়। এই লোহাই কিন্তু "লাল কণিকাকে" তার এমন সুন্দর টুক্‌টুকে লাল রংটি দেয়। না শুনলে কি এ কথা কখনও ভাবতে পারতে? তাই স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের খাদ্যের সঙ্গে কিছু লোহা খাওয়া দরকার। এও আর এক অদ্ভুত কথা। লোহা কি কেউ খায়? কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা লোহা খাই। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ লোহা থাকে। তা থেকেই আমাদের লোহার প্রয়োজন মিটে যায়। লোহা ছাড়া

তামা, ম্যাঙ্গানীজ এবং কোবাল্ট নামক ধাতুগুলির "লাল কণিকার"ও পুষ্টির জন্যে দরকার এবং সেগুলিও আমরা 'নানা রকম খাদ্যের সাথে পাই।

"লাল কণিকারা" শুধু খেলার ছলেই যে আমাদের শরীরের মাঝে আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায় তা অবশ্য নয়। এদের ছাড়া আমাদের জীবন অসম্ভব। তোমরা জান, অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে থাকে। আমাদের বুকের মাঝে ফুস্‌ফুস্‌ নামক যে দুইটি শ্বাসযন্ত্র আছে তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে শরীরের ভেতর বাতাস টেনে নেয়। ফুস্‌ফুসের ভেতরের বাতাস থেকে এই কণিকাগুলি অক্সিজেন শুষে নেয়। সেই অক্সিজেন তারা শরীরের প্রতিটি কোষের কাছে পৌঁছে দেয়। আবার কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস বয়ে এনে ফুস্‌ফুসের বাতাসের ভিতর ছেড়ে দেয়,— যাতে করে সেটা শরীরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। তবেই আমরা বাঁচতে পারি এবং আমাদের শরীরের কাজকর্ম্ম ঠিক ভাবে চলতে পারে। এদের গতিবিধি এবং প্রকৃতি থেকেও আমাদের শরীর সম্বন্ধে আরও অনেক রকম তথ্য আমরা পেতে পারি যার সাহায্যে নানা রকম রোগ নির্ণয় করা যায় এবং তার চিকিৎসার কিছু কিছু সুরাহা হয়।

এদের দৈনন্দিন জীবনে আরও অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে। যদিও কোটি কোটি কণিকা আছে, কিন্তু হামেশাই এই সংখ্যার নানা রকম তারতম্য হয়। প্রয়োজনে এরা দলে ভারি হয়, আবার অপ্রয়োজনে দলছুট হয়ে যায়। দল-ছুটেরা সুযোগ মত কিছুটা ঘুমিয়ে নেয় এবং দরকার হলেই ঘুম থেকে জেগে সাঁতার কাটা সুরু করে দেয়। বেশী দরকারে আবার জন্মের হার অনেক বেড়েও যায়। যখন তোমরা ছুটোছুটি করে খেলাধূলা কর, তখন এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। আর যখন ঘুমিয়ে পড় তখন এদের অনেকেও ঘুমিয়ে পড়ে। উঁচু পাহাড়ের উপর

চড়লে "লাল কণিকার" সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। পূজোর ছুটিতে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দার্জিলিং বেড়াতে যাও তবে সেখানে যাবার পর শরীরে "লাল কণিকার" সংখ্যা কিছুটা বেড়ে যাবে এবং কলকাতায় ফেরার পর সেই বাড়তিটা আবার যথারীতি কমে যাবে। এদের সম্বন্ধে জানবার আরও অনেক কিছু আছে। যখন বড় হবে তখন নিশ্চয় এ সম্বন্ধে আরও অনেক পড়বে এবং শিখবে।

ছড়া

শ্রীমানস রায় চৌধুরী

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
সব জামা হয় কি বিক্রী?
ইঁদুর কাটা দোকানদার
দোকানদারের বাঁচাই ভার।
বাঁচতে হলে জলদি বিক্রী
হোক পশরা ইকড়ি মিকড়ি।

মিকড়ি ইকড়ি চিকড়ি চাম
পোস্টাফিসে নাই রে খাম।
লিখবো চিঠি দিল্লী কাশী
দোকানদারের সন্দেশ বাসি।
খেলেই মরবে শীগ্রি শীগ্রি
চাম চিকড়ি ইকড়ি মিকড়ি।

দস্যু কেনারাম

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে

প্রাচীন পূর্ব-বাংলার দুর্দান্ত দস্যু কেনারাম। কেনারামের কাহিনী আমরা পাই মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলির মধ্যে। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকা একটি অমূল্য সম্পদ্। আজ আমরা যাকে 'বাংলাদেশ' বলি, দেশ বিভাগের আগে তাকে বলা হ'ত পূর্ববঙ্গ। গত কয়েকশো বছর ধরে এই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কতকগুলি গ্রাম্য পালাগান লোকের মুখে মুখে ভেসে ভেসে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। অধিকাংশ পালাগানগুলি ঐ সব অঞ্চলের কোন-না-কোন সত্য ঘটনা নিয়ে রচিত। এই অপূর্ব পালাগানগুলি হয়ত কালের অতল তলে তলিয়ে যেত; কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ চন্দ্রকুমার দে নামে ঐ অঞ্চলের একটি যুবক, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে, বহু পরিশ্রম করে এগুলিকে সংগ্রহ করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত স্বর্গত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগুলি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নাম দিয়ে ছাপা হয়।

শোনা যায় 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের বিখ্যাত ভক্ত-কবি ও গায়ক দ্বিজবংশী দাসের গান শুনে দস্যু কেনারামের জীবনে সহসা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। সেই কিংবদন্তী অবলম্বন করেই দস্যু কেনারামের পালা রচিত। পালাগানটি রচনা করেন প্রাচীন পূর্ববাংলার নাম-করা মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী আবার এই দ্বিজবংশীরই কন্যা।

কেনারাম ডাকাত হ'লেও তার জন্মবৃত্তান্তটি বেশ সুন্দর। বাঁকুলিয়া গ্রামের সন্তানহীন দম্পতি—খেলারাম ও যশোধরার পরম মনোকষ্টে দিন কাটে। অপুত্রক বেঁচে থাকা বৃথাই ভেবে তারা ঠিক করে যে চাঁদ-সূর্যের মুখ আর তারা দেখবে না; দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই থাকবে আর ক্রমশঃ অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে।

একদিন দুইদিন, তিনদিন কাটতে যায়। তৃতীয় দিন রাত্রে যশোধরা স্বপ্ন দেখে যে মনসা দেবী আবির্ভূতা হয়ে বর দিয়ে বলছেন—

হইবে লো পুত্র তোমার আর চিন্তা নাই সে কর।
ভক্তিযুত হইয়া লো তুমি মোর পূজা কর॥

পুলকে বিস্ময়ে যশোধরার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপরই তারা দেবীর নির্দ্দেশমত মনসা-পূজা আরম্ভ করে দেয়। এক বছরের মধ্যেই তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। দেবীর বরে পাওয়া বলে তারা পুত্রের নাম রাখে কেনারাম।

কিন্তু যশোধরার কপালে সুখ লেখা ছিল না। কেনারামের জন্মের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই যশোধরার মৃত্যু হ'ল। তখন খেলারাম বাধ্য হয়ে শিশুকে মানুষ করবার জন্য তার মামার বাড়ী দেবপুরে রেখে আসে। সেখানে কেনারাম বড় হ'তে থাকে।

ইতিমধ্যে দেশে এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশের মানুষ ক্ষিদের জ্বালায় ঘাস খেতে লাগল। খাবারের জন্যে গরু-বাছুর, ক্রমে স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত বিক্রী করতে লাগল। কেনারামের মামাও বিপদে পড়ে পাঁচ কাঠা ধানের বদলে কেনারামকে বিক্রী করে দিল।

কেনারামকে যে কিনে নিয়ে গেল, তার নাম হালুয়া। হালুয়ার সাত ছেলে ডাকাতি করে বেড়াত। ছোটবেলা থেকে তাদের সঙ্গে মিশতে মিশতে কেনারাম ক্রমে ঐ অঞ্চলের দুর্দান্ত ডাকাত হয়ে উঠল। গারো পাহাড়ের তলদেশ জুড়ে নলখাগড়ার বনে-ভরা বিস্তৃত জলাভূমিতে, কেনারাম দলবল নিয়ে ডাকাতি করে বেড়ায়।

মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জের নয় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে 'জালিয়া হাওর' নামে বিরাট বিল। সেই বিলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা নির্জন পথ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। একদিন সন্ধ্যা হয় হয়। সেই পথ দিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে, শিষ্যদের নিয়ে, গান করতে করতে চলেছেন সে যুগের বিখ্যাত সাধক কবি দ্বিজবংশী দাস। পালাগানে আছে—

খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা।
পিতার সহিত গায় শিষ্য সঙ্গে যারা॥
শ্রীঅঙ্গেতে নামাবলী সন্ন্যাসীর বেশ।
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়।
আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয়॥

হঠাৎ এমন নির্জন স্থানে সমবেত কণ্ঠের কালীনামের প্রবল জয়-ধ্বনি শোনা গেল। দ্বিজবংশী সদলবলে থমকে দাঁড়ান। বিস্মিত হয়ে দেখেন যে সামনে যমদূতের মত খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে এক দস্যুমূর্ত্তি।

দস্যু হুঙ্কার দিয়ে ব্রাহ্মণের যা কিছু আছে সব বার করে দিতে বলল। দ্বিজবংশী শান্ত ভাবে বললেন যে তিনি সকলের কল্যাণের জন্যে গ্রামে গ্রামে মনসার ভাসান গেয়ে বেড়ান—পয়সাকড়ি বিশেষ কেউ দেয় না। তারপর তাঁর ঝুলি ঝেড়ে দেখালেন যে তাতে কিছুই নেই। তখন কেনারাম বললে—

পাই বা না পাই কিছু ইথে নাহি দুখ।
মানুষ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ॥

মানুষ মারতে মারতে দস্যুর নরহত্যা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিজবংশী দস্যুকে নরহত্যা থেকে বিরত হবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু দস্যুর পাষাণ হৃদয়ে সে উপদেশ প্রবেশ করল না। সে বললে—

পাপপুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব॥

দ্বিজবংশী তখন দস্যুর নাম জানতে চাইলেন। পালাগানে আছে—

ঠাকুর কহেন দস্যু কিবা তব নাম।
দস্যু বলে চিনিলা না আমি কেনারাম॥
যার নাম শুনি লোক কাঁপে থরথরি।
শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি॥

দস্যুর পরিচয় জেনে দ্বিজবংশীর শিষ্যেরা শিউরে ওঠে ; তাদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে যায়। কিন্তু দ্বিজবংশী নির্ভীক্ ও অটল। তিনি কেনারামকে আবার সৎ উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। দস্যুর পরিচয় পেয়েও ব্রাহ্মণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না দেখে কেনারামও বিস্মিত হল। সেও কৌতূহলী হয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইল।

দস্যু বলে, চিনিলা না, আমি কেনারাম।

দ্বিজবংশী বললেন যে তিনি সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তার নাম জেনে কেনারামের কি লাভ। কিন্তু কেনারাম নাছোড়বান্দা তখন—

ঠাকুর কহিলা মোর দ্বিজবংশী নাম।
শুনিয়া চমকি ওঠে দস্যু কেনারাম ॥

কেনারাম বিস্মিত হয়ে বলে —

তুমি ঠাকুর দ্বিজবংশী যার নাম শুনি।
পাগলা ভাটিয়াল নদী বহে যে উজানী॥
পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে।
সেই দ্বিজবংশী তুমি খাগড়ার বনে॥

উত্তরে দ্বিজবংশী কেনারামকে উপলক্ষ্য করে বলেন—যে লোকে বলে বটে আমার গানে পাষাণ গলে, বনের পশুপক্ষী মুগ্ধ হয়; কিন্তু আমি মানুষের মন তো গলাতে পারলাম না।

দ্বিজবংশীর কথা শুনে কেনারাম কি যেন ভাবে। সেই সুযোগে দ্বিজবংশী আবার তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে ডাকাতির সব অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তার পাপের পথ পরিত্যাগ করা উচিত।

কেনারাম এর উত্তরে যা বলে তা ঠিক সাধারণ ডাকাতের মত নয়। সে বলে যে অর্থই অনর্থের মূল। এ ধন সে গরীবদের হাতে দেবে না; তাহলে তারা হঠাৎ ঐশ্বর্য পেয়ে লোভী হয়ে উঠবে। এ ধন সে নিজেও ভোগ করে না। মাটির ধন সে মাটির মধ্যেই পুঁতে রেখে দেয়। পালাগানে আছে—

কেনারাম বলে ঠাকুর ভোগের লাগিয়া।
ধন নাহি লই আমি পথিকে ভারাইয়া॥
না দেখে মানুষ-জন বনের পশুপাখী।
যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি॥

কথায় কথায় সন্ধ্যা নেমে আসে। কেনারাম আর দেরী করতে নারাজ। তাই—

খাণ্ডা তুলিয়া ধরে কেনারাম কয়।
শীঘ্র করি মারি সবে দেরী নাহি সয়॥

দ্বিজবংশী যখন বুঝতে পারলেন যে কেনারামের হাতে তাঁর নিস্তার নেই, তখন তিনি জীবনে শেষবারের মত তাঁর প্রিয় গান 'মনসার ভাসান' গেয়ে নেবার জন্যে একটু সময় চাইলেন—

ঠাকুর বলেন তবে শুন কেনারাম।
এইখানে গাইব আমি জন্মের শেষ গান॥
তাইতে একটু সময় দাও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য আপনার॥

কি যেন ভেবে কেনারাম অনুমতি দেয়। সন্ধ্যায় তারা-ভরা কালো আকাশের চাঁদোয়ার নীচে, ঘনশ্যাম দূর্বাদলের উপরে দ্বিজবংশী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসে প'ড়ে, 'মনসার ভাসান' গাইতে সুরু করেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। কেনারামের আদেশে ডাকাতের দল সবাই মশাল জ্বেলে ঘিরে বসল। দ্বিজবংশী তন্ময় হয়ে গান গেয়ে চলেছেন। ব্রাহ্মণের চোখ দিয়ে ভক্তির অশ্রু বেয়ে পড়তে থাকে। সমস্ত প্রকৃতি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় স্তব্ধ। দুর্দান্ত দস্যু কেনারাম গান শুনতে শুনতে কেমন বিভোর হয়ে যায়। তার কঠিন মন নরম হ'তে থাকে। 'মনসা মঙ্গল' পালাগানের 'বেহুলার ভাসান' অংশটি শুনতে শুনতে হঠাৎ কেনারামের মনে অপূর্ব পরিবর্তন এল।

যখন গাইল পিতা বেহুলা ভাসান।
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম॥

হাতের খাঁড়া ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কেনারাম দ্বিজবংশীকে বলে—

গুরু গো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাষণ্ডের প্রাণী॥

অনুতপ্ত কেনারাম তার সারা জীবনের ডাকাতির অর্থ দ্বিজবংশীর পায়ে নিবেদন করে তৃপ্তি ও মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু দ্বিজবংশী সেই পাপার্জিত ধনরত্ন নিতে পারেন না। তখন কেনারামের আদেশে ডাকাতের দল বনের মধ্যে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা সমস্ত ধনরত্ন বের করে এনে নিকটে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী নদীর জলে বিসর্জন দিল। তারপর কেনারাম তার খাঁড়া দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে দ্বিজবংশী তাকে বিরত করে বলেন—

মরিয়া ত কাজ নাই শুন কেনারাম।
দীক্ষামন্ত্র আজি তোরে করিব রে দান॥
এই গান শিক্ষা কর 'মনসা ভাসান'।
মায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ॥

এরপর কেনারাম ডাকাতির জীবন পরিত্যাগ করে দীক্ষামন্ত্র নিয়ে দ্বিজবংশীর সঙ্গে চলে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার গুরুর কাছ থেকে গানও শিখে নেয়। পালাগানে আছে—

আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্বর্গপুরে।
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে॥
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে ঝরে জল।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেন ভাবের পাগল॥

দেশের মানুষ অবাক্ হয়ে দেখে, যার নামে একদিন সমস্ত অঞ্চলের মানুষের থরহরি-কম্প আসত সে আজ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ভাবের আবেশে পথে পথে গান গেয়ে চলেছে আর তাকে দেখবার জন্যে গ্রামে গ্রামে ছোট-বড় সকলের মধ্যে কোলাহল পড়ে গেছে।

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।

—হেমচন্দ্র

নীচের ছবিতে কোন্ বিখ্যাত বইয়ের নাম লুকান আছে ?

: কেমন বুদ্ধি :

যদি ৫০ সেকেণ্ডে বলতে পার তবে তুমি খুব বুদ্ধিমান্,

যদি ১ মিনিটে বলতে পার তবে তুমি বুদ্ধিমান্.

যদি ১ মিনিটের বেশী লেগে যায় তাহলে তুমি নিজেকে যত বুদ্ধিমান্ ভাব তত বুদ্ধিমান্ নও।

[উত্তর ১৪৮ পৃষ্ঠায়]

যোজন ঝিলের অভিশাপ

শ্রীশিশিরকুমার মজুমদার

সার্ভেয়ার সুরয সিং কাজ মেটাতে এত দেরি করলেন যে সন্ধ্যের ট্রেনটা আমরা মিস্ করলাম। অজ-পাড়াগাঁ এই পাহাড়ি দেশে থাকব যে কোথায় তা ভেবে চিন্তাই হল। সঙ্গী সুরয সিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি যেন খুশিই হয়েছেন। তিনি বললেন—বঙ্কিবাস, তুমি যেন কোন্ একটা জায়গার কথা বলছিলে? এখন কি সেখানে যাওয়া যায়?

ডুমরাও গাঁয়ের প্রধান বঙ্কিবাস—সেও দেখলাম বেশ খুশি।

বলল—আপনারা বললে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এখন তো আকাশ-ভরা চাঁদ। হয় তো কেউ নৌকো নিয়ে যেতে রাজী হতে পারে।

এ কথা শুনে খুশি হয়ে সুরয সিং আমাকে বললেন—তবে তাই চলুন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব! এমন চাঁদনি রাতে আট-দশ মাইল ঝিলের বুকে নৌকো বেয়ে যাওয়া সে এক মনে রাখার মতো ব্যাপার হবে।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হল, এ সবই সার্ভেয়ার বাবুর কারসাজি। ইচ্ছা করেই দেরি করে উনি ট্রেন্ মিস্ করেছেন। যখন থেকে উনি বোধনার যোজন ঝিলের কথা শুনেছেন তখন থেকেই কেমন যেন উশখুশ করছিলেন। দু'-একবার মুখ ফুটে বলেও ছিলেন—এতদূরে এসে অমন একটা দেখবার জায়গা না দেখে গেলে পরে আপশোষ্ করতে হবে। যেতে আমারও আপত্তি ছিল না। তবে কাজ ফেলে যাওয়াটা উচিত হবে না বলেই আপত্তি করেছিলাম। কোম্পানী আশপাশের পাহাড়ে ব্লাস্টিং-এর কাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে চায়। এখানকার রিপোর্ট না পেলে সে কাজে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যখন ট্রেন্ ফেল করেছি,

আর এই চাঁদনি রাতে নৌকো যদি পাওয়াই যায় তবে এই ছোট্ট ষ্টেশনে বসে মশার কামড় খাওয়ার চেয়ে ঝিলটা দেখে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ঝিল দেখে আমাদের ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে? আমরা সকালের ট্রেন্ ধরতে পারব তো?

বঙ্কিবাস বলল—বাবু, ঝিলের মাঝের দ্বীপটা তীর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। ওখানে গিয়ে ফিরে আসতে বড় জোর তিনটে কি চারটে বাজবে। ট্রেন্ তো সেই সকাল সাতটায়। ট্রেন ধরতে কোনই অসুবিধা হবে না।

আমি অবাক্ হয়ে বললাম—ঝিলের মাঝখানে দ্বীপ আছে! কই, সে কথা তো বল নি আগে?

উত্তরে বঙ্কিবাস বলল—সেই দ্বীপেই তো সব যাত্রীরা যায় বাবু! ওখানে ডাকাত দেবীসিংহের প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দির আছে। মন্দিরের দেবী বড জাগ্রত। এ তল্লাটের সবাই তাঁকে মান্য করে। পূজা দেয়।

কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। পাহাড়ি পথ দিয়ে প্রায় মাইল খানেক উঁচুনীচু চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে আমরা যখন ঝিলের ধারের জেলেদের ছোট্ট গাঁয়ে পৌছলাম তখন রাত প্রায় আটটা। ঝিলের ধারে এসে আমরা সবাই থমকে গেলাম। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে ঝিলের দিক্ থেকে। সে বাতাসে আমাদের ক্লান্তি মুছে গেল। সামনে যতদূর দেখা যায় জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে ঝিলের জল। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চতুর্দশীর চাঁদের আলো হাজার টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে চারপাশ ঘিরে উঁচু পাহাড়ের সারি চারদিক্ থেকে ঘিরে রেখেছে ঝিলটাকে। গাঁয়ের শেষে ঝিলের ধার ঘেঁষে একদিকে ঘন বন। অন্য পাশে সমতল জমি ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে জলের ধারে। সেখানেই পোঁতা বাঁশের খোঁটায় বাঁধা সারি সারি অনেকগুলো সরু সালতি নৌকো। আমি মাইনিং এনজিনিয়ার। মাটি, পাথর, লোহালক্কড়

আর অঙ্ক নিয়েই আমার চিরকাল কাজ। সারাজীবন আমার মনকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে রেখেছিলাম। আজ কিন্তু এই নাম-না-জানা গাঁয়ের শেষে দাঁড়িয়ে ঐ ঝিলের দিকে তাকিয়ে মনে হল—এখানে না এলে আমি ভুল করতাম। তাকিয়ে দেখি সুরয সিংও যেন কেমন হয়ে গেছেন। জলের বুকে নাচা হাজার-টুকরো চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে তাকাতে দেখে কেমন যেন মোহাবিষ্টের মতো বললেন—ভারি সুন্দর তো এই জায়গাটা! তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু কেমন যেন একটা থমথমে ভয় ভয় ভাব আছে এই সৌন্দর্যের মধ্যে।

সুরয সিংকে নীরস মানুষ বলেই জানতাম। তাঁর মুখে এমন ভাষা শুনে অবাক্ হলাম। কিন্তু ভেবে পেলাম না এত সুন্দরের মাঝে উনি ভয়ের কি খুঁজে পেলেন।

বক্তিবাস গাম থেকে মাঝিদের ডেকে আনল। টাকার কথা শুনে ওরা রাজি হল। আমরা সবাই নৌকোতে ওঠা মাত্রই ওরা নৌকো খুলে দিল। দেখতে দেখতে তীর থেকে আমরা বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়লাম। সেখান থেকে চারপাশের দৃশ্য আরও অপূর্ব। যে পাহাড়গুলোকে তীর থেকে একটানা একসারি বলে মনে হচ্ছিল—হঠাৎ দেখলাম দক্ষিণে এক জায়গায় তারি মাঝে সরু একটুখানি ফাঁক। চাঁদনি রাতের আবছা আকাশ সে ফাঁকের মাঝ দিয়ে ঝিলের জলকে ছুঁয়েছে। সেই ফাঁকের দিকে তাকিয়ে থেকে সুরয সিং বললেন—দক্ষিণ থেকে আচমকা যদি জোরে একটা হাওয়া ছাড়ে তবে দেখছি এ ঝিলের জলে একটা ভয়ানক ঘূর্ণি ঝড় উঠতে পারে!

ওঁর এ সব কথা আমার কানে গেলেও আমার মন তখন ছিল অন্য দিকে। সহরে-গাঁয়ে, বনেজঙ্গলে, পাহাড়েপর্বতে জ্যোৎস্না রাত্রি আমি অনেক দেখেছি। সে সব জ্যোৎস্না রাতের সঙ্গে আজকের এ রাতের কোন তুলনা হয় না। এ রাতের রূপ অন্য। এ রূপের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া

না পেয়ে সূরয সিংও কথা বন্ধ করেছিলেন। অনেকক্ষণ আমরা দুজনে নীরবে বসে জলের বুকে আলোর খেলা দেখলাম। হঠাৎ নৌকোতে একটা ঝাঁকুনি লাগল। বোধ হয় জলে-ভেসে-আসা কোনো কিছুর সঙ্গে নৌকোর ধাক্কা লেগেছে। ভয় পেয়ে সূরয সিং জিজ্ঞাসা করলেন—মাঝি, জল এখানে কত গভীর?

—খুব বেশি নয় বাবু, তবে দেবীর মন্দিরের কাছে ডুব জল। এখানে বড় জোর পাঁচ-সাত হাত হবে। আপনি কি সাঁতার জানেন না?

—না, জানি না। উত্তর দিলেন সূরয সিং। বললেন—তাই একটু ভয় ভয় করছে! যা ছোট্ট নৌকোটা!

—এ নৌকো ডুববে না বাবু! বলল মাঝি।—তবুও আপনারা কিন্তু বেশি নড়াচড়া করবেন না। তবে হয়তো উলটে যেতে পারে।

এ কথা শুনে বেশ শক্ত হয়ে বসলেন সূরয সিং। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—নৌকোডুবি হয় এখানে মাঝি?

মাঝি বলল—এ ঝিল মায়ের খাস তালুক বাবু। মা এখানে সবাইকে রক্ষা করেন। তবে যে পাপী, তাকে শাস্তি দেন বই কি। কত পাপীর দেহ যে পোঁতা আছে এ ঝিলের পাঁকে তা কে জানে!

এ কথা শুনে আমি হেসে বললাম—জল তো এখানে খুব অগভীর। এত কম জলে কি কখনো দুর্ঘটনা ঘটে?

মাঝি বলল—দুর্ঘটনা ঘটে বাবু, এখান থেকে আরও কিছুটা আগে। সেখানে জল খুব গভীর। চারদিকে পাহাড়পর্ব্বত থাকার জন্য এখানে ঝড়-তুফান খুব কম হয়। কিন্তু দক্ষিণের পাহাড়ের সারির মাঝখানে যে ফাঁকটা আপনারা দেখলেন, তার ফলে এ ঝিলের একটা বিশেষ জায়গায় দক্ষিণ থেকে জোরে হাওয়া ছাড়লেই ভীষণ ঘূর্ণি-ঝড় ওঠে। তখন এই ঝিল সমুদ্দুরের রূপ নেয়। তখনই মা শাস্তি দেন যত পাষণ্ডদের।

মাঝি থামতেই বঙ্কিদাস বলল—বাবু, সব থেকে অবাক্ কথা কি জানেন? যখনই কোন পাপী-পাষণ্ড মায়ের দর্শনের জন্য এ ঝিলের

বুকে নৌকো ভাসিয়েছে তখনি সেই ঘূর্ণি তুফান উঠেছে। ততবারই মরেছে সেই পাষণ্ডগুলো। কোন বারই এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এখানকার সবাই এ কথা জানে।

এ কথা শুনে আমার ভীষণ হাসি পেল। কোনমতে সে হাসি চেপে বললাম—তা কি করে হবে? ঝড় কি পাষণ্ড লোক দেখেই ওঠে নাকি? তাই কি সম্ভব?

মাথা চুলকে বঙ্কিবাস বলল- কি করে যে কি হয় তা জানি না বাবু! তবে যা হয় তাই বললাম। এখন এ সব বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।

কথাগুলো ও বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। শুনে আমার যেন কেমন খট্‌কা লাগল। আবছায়া আলোতে তাকিয়ে দেখলাম সূরয সিংএর মুখ হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেছে। এ সব কথা শুনে উনি বেশ ভয় পেয়েছেন বুঝলাম। ভাবলাম, থাক তবে এই বিচ্ছিরি আলোচনা। এমন সুন্দর রাতে চারদিকের অপূর্ব দৃশ্য দেখেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যাক্। কি হবে মিছিমিছি সহজ সরল লোকগুলোর মনের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে?

আমি চুপ করলাম। ভেবেছিলাম তাহলেই এই কথার শেষ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বঙ্কিবাস বলল—মায়ের কোপ প্রথমে কার উপরে পড়েছিল জানেন? দেবীসিংহের উপরে। ঐ দেবীসিংহই কিন্তু অনেক টাকা খরচ করে দ্বীপ জুড়ে পাকা গড় বানিয়ে তার মাঝে পাথরের মন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে আজ বহু যুগ আগে।

আমি কথার মোড় ফেরাব বলে জিজ্ঞাসা করলাম—দেবীসিংহ কোন্ দেশের লোক? নাম শুনে তো মনে হয় না সে এদেশের লোক।

না--না বাবু, সে পশ্চিমের কোনো দেশের লোক হবে। শোনা যায় সে দেশদ্রোহিতা করে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। এদেশের নিরীহ গরীব চাষীদের ঘরবাড়ী

জ্বালিয়ে, ডাকাতি করে অল্প ক'বছরেই সে এ অঞ্চলের রাজা হয়ে বসে। তারপর টাকাপয়সা খরচ করে, লোককে বেগার খাটিয়ে ঐ দ্বীপে বানায় এক শক্ত গড়। আর সে গড়েই প্রতিষ্ঠা করে এদেশের অন্য সব ডাকাতদের মতো মা কালীর মূর্তি। যখন ঐ গড় আর মন্দির তৈরি হচ্ছিল তখন কিন্তু রোজ নিয়ম মতো একবার করে দেবী-সিংহ কাজকর্ম তদারকের জন্য যেত ঐ দ্বীপে। বেশ কিছুক্ষণ ওখানে থেকে, ফিরত তার ডাঙ্গার বাড়িতে। যাতায়াতের পথে এ ঝিলের

প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল সকলে।

বুকে কখনও কিছু ঘটে নি। বিশাল গড় তৈরি হয়ে গেল। বিদেশ থেকে কালো পাথরের তৈরি দেবীমূর্তি এল। এক শুভদিনে মূর্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল। দেবীসিংহ হুকুম জারি করল তার দলের সকলকে আর আশপাশের গাঁয়ের সবাইকে সেই শুভদিনে নৌকো সাজিয়ে, নৌকো ভাসিয়ে যেতে হবে মন্দিরে। নৃশংস ডাকাত দেবী-

সিংহের হুকুম অমান্য করে এমন সাহস কারও ছিল না। সেই শুভ-দিনে কয়েকশ' নৌকো ভাসল এই ঝিলের জলে। মাঝের নৌকো-গুলোতে ছিল দেবীসিংহ আর তার দলবলের সকলে। আশপাশের গুলোতে অভাগা গাঁয়ের লোকেরা। সে দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। বাতাস ছিল ঠাণ্ডা। সময়টাও বর্ষাকাল ছিল না। নৌকোগুলো তীর ছাড়ল। প্রাণের ভয়ে সকলে রাজা দেবীসিংহের জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। তারা বাজনা বাজাচ্ছিল আর হয়তো মনে মনে মায়ের কাছে দেবীসিংহের পাপের কথা জানাচ্ছিল। সমস্ত দলটা যখন ঝিলের গভীর জলের সীমায় পৌঁছবে তখনি হঠাৎ দক্ষিণ থেকে বাতাস ছাড়ল। প্রথমে আস্তে, তার পরে জোরে। দেখতে দেখতে সে বাতাসের বেগ ঝড়ের বেগকেও ছাড়িয়ে গেল। সমস্ত ঝিল যুড়ে পাগলা ঢেউয়ের নাচন সুরু হয়ে গেল। প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল সকলে। সেই আওয়াজ ছাপিয়ে বাতাসের গোঁ গোঁ গর্জন চরমে উঠল। প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ে আকাশ প্রমাণ ঢেউ উঠে হঠাৎ সমস্ত নৌকোগুলোকে যেন গিলে ফেলল। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরেই ঘূর্ণি-লাগা বাতাসের গর্জন থেমে গেল। জলের বুকে ক্ষেপে-ওঠা ঢেউগুলো আস্তে আস্তে মাথা গুটিয়ে নিল। সব কিছু যখন শান্ত হল, নৌকোগুলো যখন আবার একে একে এক জায়গায় এসে ভিড়ল, তখন আর তাদের মাঝখানে দেবীসিংহ আর তার দলবলের নৌকোগুলো ছিল না। থামল বঙ্কিবাস।

রাত তখন অনেক হয়েছে। চতুর্দশীর চাঁদ ঠিক মাথার উপরে। জ্যোৎস্নাধারার স্নানে সমস্ত ঝিল জুড়ে যেন এক রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দূরের পাহাড়গুলো আবছায়া আলো-অন্ধকারে বিরাট দৈত্যের মত দেখাচ্ছে! আমরা যেন নৌকোয় চড়ে ভেসে চলেছি এই দৈত্যপুরী পার হয়ে কোন এক রূপকথার দেশে। সত্যিই সব কিছু কেমন যেন এক ভয়-মেশানো সৌন্দর্যে ভরা। তার মাঝে দেবীসিংহের এই অদ্ভুত গল্পটা পরিবেশকে যেন আরও বেশি থমথমে করে তুলল। আমার মনে অনেক প্রশ্নই উঠেছিল কিন্তু সে সব তুলে

এই চমৎকার রাত্রিটাকে ভয়াবহ করে তুলতে ইচ্ছে হল না। বিশেষ সুরথ সিং যখন ভয় পেয়েছেন। আমি তাই চুপ করেই ছিলাম —

কিন্তু বহ্নিবাসকে আজ যেন গল্পে পেয়েছে। ও বলল—দেবী-সিংহের পরেও এমন কাণ্ড এখানে ঘটেচে বাবু, অনেক! সে সব কথা আমরা শুনেছি আমাদের বুড়োদের কাছে। তারাও শুনেছেন তাঁদের বাপ-দাদাদের কাছে। দেবীসিংহ মারা যাবার পর বহুদিন বাদে বীরপুর গাঁয়ের সুবল প্রধান তার দলবল নিয়ে আশপাশের গ্রামে অত্যাচার সুরু করে। তাদের জন্য নিরীহ লোকদের আর দুঃখের সীমা থাকেনা। শেষে সুবলের বিবাদ বাধল বোধনা গাঁয়ের জেলেদের সঙ্গে এই ঝিলে মাছ ধরা নিয়ে। বোধনা গাঁয়ের লোকেরাই বরাবর এ ঝিলে তাদের নৌকো ভাসাত। তাতেই তারা কোনমতে পেট চালিয়ে দেবীসিংহের গড়ের দেবীর পূজার ব্যাবস্থা চালু রাখত। সুবলের ভয়ে তারা নৌকো ভাসানো বন্ধ করল। বন্ধ হল দেবীর পূজো। তার সঙ্গে সুরু হল গাঁয়ের সবার উপোস। নিরুপায় গ্রামবাসীরা তাদের সকল অভিযোগ জানাল মায়ের কাছে। তার পরেই আবার একদিন তুফান উঠল ঝিলে। সেই তুফানের শেষে আর খুঁজে পাওয়া গেল না সুবল প্রধান আর তার দলবলকে।

অল্প কিছুক্ষণের জন্য থামল বাহ্নবাস। একটু দম নিয়ে বলল—এমন বহু কাণ্ডই ঘটেছে বাবু, এখানে। শেষ ঘটনা ঘটেছিল ইংরাজ আমলে। সরকার বাহাদুর এই ঝিলকে খাস করে নিয়েছিল। বোধনা গাঁয়ের লোকদের কোন আপত্তিই শোনে নি। জলকর বসিয়ে গরীবদের কাছ থেকে ট্যাক্সো আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল। মাছ থেকে যা আয় হত তা দিয়ে কোনমতে খাওয়া-পরা চলত গাঁয়ের লোকদের। ট্যাক্সো ওরা দেবে কোথা থেকে? ওরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করল। তাতেও যখন কিছুই হল না তখন স্বদেশী বাবুদের বুদ্ধিতে ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল নিয়ে গেছিল সাহেবের কাছে। সে মিছিলে গুলি চলেছিল বাবু! লোক মরেছিল।

এ সব নিয়ে সদরে যখন বড় রকমের আন্দোলন সুরু হয়েছিল তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে এসেছিলেন সরেজমিনে সব কিছুর তদারক করতে। তাঁর আসার জন্য বহুদিন ধরে এখানে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছিল। সেপাইসান্ত্রীদের তাঁবু পড়েছিল। রাস্তা তৈরি হযেছিল, বড় বড় অফিসাররা এসেছিলেন। গাড়ি-ঘোড়ার সঙ্গে এসেছিল দু'খানা কলে-চলা নৌকো—সাহেবকে নিয়ে ঝিলে বেড়াবার জন্য। সাহেব সারাদিন নালিশ-আর্জি শুনে সন্ধ্যেবেলা খানাপিনা সেরে কলের নৌকোয় উঠেছিলেন ঝিলের বুকে বেড়াবেন বলে। সেদিনও, বাবু, এমনি চতুর্দশী ছিল। আকাশ পরিষ্কার। কোথাও কোন দিকে বিপদের কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু সাহেবকে আব তার দলবল নিয়ে ফিরে আসতে হয়'নি। ভীষণ এক ঘূর্ণিঝড়ে সবাই ডুবে গিয়েছিল।

বঙ্কিবাস তার গল্প বলা বন্ধ করল। আমার তখন বেশ ভয়-ভয় করছে। জীবনে জ্ঞানে-অজ্ঞানে কতই তো অন্যায় করেছি, কে জানে আজই কি সে সব পাপের শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে কিনা? ওদিক্ থেকে সূরয সিং কথা বললেন। ওঁর গলাও ভয়ে যেন কেমন ভারী হয়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন—আর কতদূর যেতে হবে আমাদের মাঝি?

মাঝি বলল—আর বেশি দূর নয় বাবু! বড জোর মাইল খানেক।

বঙ্কিবাস বলল—জানেন বাবু, আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি এরই আশপাশের কিছুটার মধ্যেই সব ক'টা দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখানে জল খুব গভীর। দেখছেন তো লগি-ঠেলা বন্ধ করে মাঝিরা দাঁড় ধরেছে।

বঙ্কিবাস থামতেই সূরয সিং-এর গলা দিয়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত আওযাজ বার হল। আমি চমকে ওর দিকে তাকালাম।

উনি চেঁচিযে উঠলেন—নৌকো ফেরাও মাঝি! নৌকো ফেরাও। আমি মন্দিরে যাব না। আমি ফিরে যাব এখুনি। ওঁর চিৎকারে মাঝিরা দাঁড়-টানা বন্ধ করল।

কি হল সার্ভেয়ার বাবু?—আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তরে তিনি আর্তনাদ করে বললেন—নৌকো আপনি ফেরাতে বলুন এখুনি। আমার কেমন যেন ভয় করছে! আমি যাব না মন্দিরে।

কি যে হল হঠাৎ কিছুই বুঝলাম না। বঙ্কিবাস বলল—আপনি ভয় পাচ্ছেন মিছে। তুফানে যারা মরেছে তাদের সবাই ছিল পাপী। আপনার ভয় কিসের?

ব্যাকুল ভাবে সুরয সিং বললেন—মানুষের পাপ-পুণ্যের কথা কে বলতে পারে? নৌকো ফেরাও। আমি মরতে চাই না।

ওঁর ব্যাকুল চিৎকারে আমি থাকতে না পেরে বললাম—নৌকোর মুখ ঘুরিয়েই দাও মাঝি! তাড়াতাড়ি ফিরে চল। উনি যখন ভয় পেয়েছেন তখন আর এগিয়ে কাজ নেই।

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দূরে কোথায় যেন একটা কেমন অদ্ভুত আওয়াজ উঠল! মনে হল যেন কোথায় কোন মহাশূন্যে হাজারখানেক বিশাল অজগর রাগে একসাথে ফুঁসছে। সঙ্গে সঙ্গেই দমকা বাতাস ছাড়ল। সে বাতাসের ঝড় ছুটে আসছে দক্ষিণ থেকে। সে বাতাসের বেগে মুহূর্তে শান্ত ঝিলের জলে ঢেউ-এর নাচন শুরু হয়ে গেল। মাঝি পিছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে জ্যোৎস্নার আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা পাহাড়ের মত উঁচু জলের ঢেউ ছুটে আসছে আমাদের গ্রাস করবে বলে। নৌকোয় ভীষণ দুলুনি আরম্ভ হল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন সুরয সিং। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেল! আমাদের চারপাশ ঘিরে বাতাসের হিংস্র গর্জনে সবার আর্তনাদ ডুবে গেল। ঢেউএর বীভৎস তাণ্ডবে মনে হল যেন একটা জলদৈত্য প্রচণ্ড রাগে আমাদের নিয়ে ভীষণ এক খেলায় মেতেছে। খেলা-শেষে আচমকা আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে জলের বুকে। জীবনে আমি যত পাপ করেছি আজ তার সব কিছুর শাস্তি নিতে হবে।

তার পরেই হঠাৎ আবার সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। আমি তখনও জলের বুকে সাঁতার কেটে চলেছি।—আমি মরি নি। আমি মরি নি। একে একে দেখা পেলাম বঙ্কিবাস আর অন্য মাঝিদের। উল্টোনো নৌকোটাও ভেসে এল কাছে। কোনমতে সেটা সোজা করে তাতেই আমরা উঠে বসলাম। গায়ে আমাদের আর তখন এতটুকুও শক্তি নেই। তবুও প্রাণপণে চিৎকার করে সুরয সিংকে ডাকতে লাগলাম। জ্যোৎস্না-ঝলমল জলের বুকে কোথাও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি হারিয়ে গেছেন ঝিলের জলে।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কোম্পানীর ব্লাস্টিং সুরু হয়ে গেছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ডুমরাও গাযের আর চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে বসেছে সহর। কোম্পানির বড় অফিস। সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়েছিল সুরয সিংএর ভাইয়ের সঙ্গে। সে-ই আমাকে বলেছিল—আগষ্ট বিপ্লবের সময় ইনামের লোভে সুরয সিং বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছিল সরকারের হাতে। বিপ্লবীদের ফাসি হয়েছিল। শুনে দুঃখ হল। তবুও শান্তি পেলাম মনে। সুরয সিং তবে আমার জন্য শাস্তি পায় নি, পেয়েছে আপন পাপেই। আমি কিন্তু আজও যোজন ঝিলের মা কালীকে দেখতে যাই নি।

বলতে পার

[১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ]

উত্তর: শিশুবিচিত্রা

তিলাপিয়া মোজাম্বিকা

শ্রীগৌর আদক

মাছের বাজারে পুকুরের রুই-কাৎলা, শিঙ্গি-কৈ-মাগুর প্রভৃতির সঙ্গে তিলাপিয়াও দেখা যায়। বর্ত্তমানে আমরা সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত; শুধু আমরা নই, সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এই মাছ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

শোনা যায় তিলাপিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার বহু বছর আগে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে মিশরের একটি সমাধিমন্দিরের গায়ে সর্বপ্রথম এক জোড়া তিলাপিয়া মাছের ছবি দেখা যায়

এর বহু বছর পর দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার পর্তুগীজ কলোনী মোজাম্বিকের একটি নদীতে জেলেদের জালে কয়েকটি তিলাপিয়া ওঠে। এক ব্যক্তি সেগুলিকে নিয়ে এক মৎস্য-বিশেষজ্ঞকে দেন। তিনি গবেষণা করে জানতে পারেন, তিলাপিয়া দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিকের মাছ। তাই তিলাপিয়ার সঙ্গে মোজাম্বিকা কথাটি যুক্ত করে এর নাম দেওয়া হয় তিলাপিয়া মোজাম্বিকা। এ ছাড়া এই মাছ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন তিলাপিয়া মেলানোপ্লুরা, তিলাপিয়া নিলোটিকা, তিলাপিয়া জিল্লি এবং তিলাপিয়া গ্যালিলায়িব। আমাদের দেশে এদের নাম তিলাপিয়া মোজাম্বিকাই আছে। অনেকে একে তেলাপিয়া বা আমেরিকান কৈ বলে। এর মধ্যে আমেরিকান কৈ কথাটাই বেশি প্রচলিত। আমেরিকান কৈ কথাটি যে কোথা থেকে এলো তা আজও জানা যায় নি।

তিলাপিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার পর্তুগীজ কলোনী মোজাম্বিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়, থাইল্যাণ্ড ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশে চাষের জন্য আসে।

পরে ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় পাঁচশো মাছ মাদ্রাজের মৎস্য-গবেষণা-কেন্দ্রে আনা হয়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তারা এখানকার জলবায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় এবং বংশবিস্তার সুরু করে।

এরা মিষ্টি এবং নোনা যে কোন জলে ডিম পাড়ে। তিন মাস বয়স থেকেই ডিম পাড়া সুরু করে। প্রতি মাসে প্রায় তিনশো
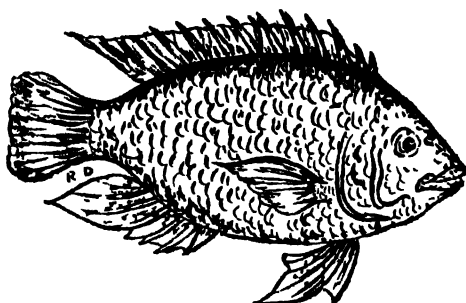
পুরুষ তিলাপিয়া
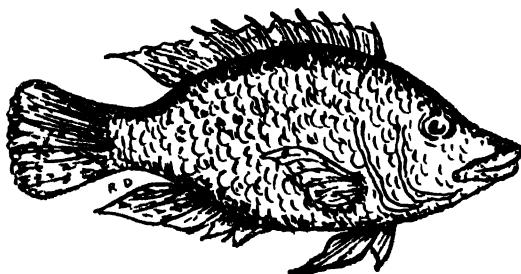
স্ত্রী তিলাপিয়া

থেকে চারশো ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার আগে তিলাপিয়া জলের তলায় একটি গর্ত করে তার উপর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এদের মুখের ভিতর একটি থলি আছে, ডিমগুলিকে নিয়ে এরা কখনও থলির মধ্যে, কখনও বা গর্তের ভিতর রেখে অনবরত নাড়ায়। তিন দিন পর ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। সদ্য-ফোটা বাচ্চাদেরও ওরা নাড়াতে থাকে, যত দিন পর্যন্ত না ঐ বাচ্চা অ.ধ্র

ইঞ্চির মত বড় হয়ে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। ডিম-গুলিকে এরা খুব যত্ন করে যাতে একটি ডিমও নষ্ট না হয়। এইজন্যই এদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় দেখা গেছে পুকুরে এক জোড়া তিলাপিয়া ছাড়লে পরের বছরে তার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজার। প্রথম বছর তিলাপিয়া খুব বাড়ে। এক বছরে এর ওজন হয় সাতশো গ্রাম থেকে এক কে. জি. আর লম্বায় হয় দশ থেকে বারো ইঞ্চি। পরের বছর থেকে খুব কম বাড়ে। তিন মাসের মধ্যেই এগুলি খাবার উপযুক্ত হয়ে যায়। এই সময় এর ওজন দাঁড়ায় প্রায় আড়াইশো গ্রাম। উপযুক্ত খাদ্যের উপরেই তিলাপিয়ার দেহের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

তিলাপিয়ার খাদ্য পুকুরের ঘাস, পাতা ও জলজ উদ্ভিদ। পুকুরে খাদ্যের অভাব হলে পেটুক তিলাপিয়া অন্য মাছের বাচ্চাদের ধরে ধরে খেতে থাকে, এমন কি পুরুষ তিলাপিয়া নিজেদের বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেলে। তবে ঘাস-পাতা ও জলজ উদ্ভিদের দিকেই এদের নজর বেশী, এই সমস্ত খাদ্য পেলে এরা অন্য কোন খাদ্যের দিকে নজর দেয় না। তাই পুকুরে জলজ উদ্ভিদের সতত উৎপাদনের জন্য মাঝে মাঝে সার দিতে হয়।

তিলাপিয়ার ময়লা খাওয়ার একটা বদনাম থাকলেও এরা তা সহজে গ্রহণ করে না—যে পর্যন্ত না জলাশয়ে জলজ উদ্ভিদের অভাব দেখা দেয়। এই কারণে অনেকেই তিলাপিয়া মাছ খায় না। যদি তাই সত্যি হয় তাহলে বলব তাদের কোন মাছই খাওয়া উচিত নয়, কারণ পৃথিবীর প্রায় সব মাছই ময়লা খায়। সুতরাং তিলাপিয়া না খাওয়ার কোন কারণই নেই। বর্ত্তমানে তিলাপিয়াই একমাত্র মাছ যা মাছের এই চড়া বাজারে সাধারণ মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীরা সহজে কিনতে পারে।

পুজো

শ্রীমায়া ঘোষ দস্তিদার

শিমুল পলাশ বিদায় নিল
শিউলি খবর পেল,
শরৎ শরৎ হিমেল হাওয়ায়
তাই তো ওরা এল।

ছড়িয়ে গেল বনে বনে—
ভরিয়ে দিল মন,
পুজো-পুজো খুশীর আমেজ
পাচ্ছি সারাক্ষণ।

ছোট্ট গাঁয়ের ছেলেমেয়ে
নাচছে দু'হাত তুলে,
ঘরের যত দুঃখ ব্যথা
গেছেই ওরা ভুলে।

সারা দিনে একটি বেলা
ভাত যদি বা জোটে,

খুশীর নেশায় পেটের জ্বালা
নাই বুঝি আর মোটে।

মা আসছে, মা আসছে—
এই আনন্দে নাচে,
পোটোপাড়ায় সারাটা দিন
থাকছে মায়ের কাছে।

এগিয়ে এল সেই দিনটি
টের পাচ্ছি বেশ
পোটোপাড়া শান্ত এবার
ঠাকুর গড়া শেষ॥

রাবণের দুঃখ

শ্রীরেবন্ত গোস্বামী

কহিল রাবণ, "ওরে শোন্ শোন
মারীচ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ,
লংকাপুরীর রাক্ষসগণ,
শোন রে, এখানে আয়
ঘুম নেই মোর দিবস-রাত্র,
মালিশ ফুরাল পঁচিশ পাত্র,
নাড়িতে পারি না সর্বগাত্র,
শরীরের বেদনায়।
চোখের উপরে কুম্ভকর্ণ
বাজাতেছে তার নাসিকা-হর্ণ,
আওয়াজ তাহার ভেদিছে কর্ণ—
ঈর্ষায় মরে যাই,

যদি বা কখনো ঘুমাইয়া পড়ি,
ঘুমের ঘোরেতে যদি নড়ি-চড়ি,
মাথা-ভারে ফের গড়াইয়া পড়ি—
কুড়ি হাত রাখা দায়।

দশটি বালিশ সাজাইয়া থরে
পাশ ফিরে শুই তাহার উপরে,
নীচের মাথাটি চীৎকার করে
বলে ওঠে- গেনু হায়।
ব্রহ্মা ও শিব ক'টা মাথা নিয়ে
কি করে বোঝেন কষ্ট যে কি এ,
তারা তো ঘুমান বসে বা দাঁড়িয়ে
বাদুড় ও অশ্ব-প্রায়।

কতকাল আমি শোব হয়ে চিৎ,
বল বিভীষণ, বল ইন্দ্রজিৎ—
এবার যা হোক করহ বিহিত,
নহিলে পরাণ যায়।
দশ-মাথা আর বিশটি হস্ত
মোর পরে ভার উদয়-অস্ত,
যে কোন একটা হেস্তনেস্ত
না হলে উপায় নাই।

এতেক কহিয়া লংকেশ্বর
কাতরিয়া কন, "হায় ঈশ্বর,
রাজ্য লইয়া দাও শুধু বর
যেন ঘুমাবারে পাই।"

রুকুমা

শ্রীঅমৃতা মৈত্রের

রুকুকে তোমরা চেনো ?
ছোট খুকি সে
মিষ্টিমুখী যে
দেখ নি তো কথ্‌খোনো !

ক্যাড্‌বেরী তার প্রিয়,
তুমি যদি তার
সাথে ভাব করো
নিশ্চয়ই তাকে দিয়ো।

যতো বড় দাদা দিদি,
সকলে তার
ছোট ভাই-বোন
সেই সকলের দিদি।

কেউ যদি তারে বলে
রুক্‌ রুক্মিণী
ছোট খুক্কিণী—
অভিমানে পড়ে গ'লে।

তাই তো শিবাজী দাদা,
ছোট্ট দিদির
স্নেহের বাঁধনে
পড়ে গেছে আজ বাঁধা।

মিতু তার দিদিভাই,
আদরের ছোট
বোনটিরে তবু
ডাকে রুকু দিদিভাই।

আমি বলি তাই রুকুমা;
রুকু রুক্মিণী
সোনা খুক্মিণী
আমাদের এক খুকু-মা

রেলগাড়ীটা

শ্রীপলাশ মিত্র

রেলগাড়িটা চলছে জোরে
ভীষণ জোরে :
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
আকাশ ভ'রে।
আকাশ ভ'রে আকাশ জুড়ে
মেঘের খেলা
রেলগাড়িটার ছাদের ওপর
পাখির মেলা।

রেলগাড়িটা চলছে জোরে
ভীষণ জোরে :
লাগছে ভালো, খুবই ভালো
আজ এই ভোরে।

বর্ষায়

শ্রীবারীন বসু

ঝম্‌-ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি যখন পড়ছিল
দমকা হাওয়ায় গাছগুলো খুব নড়ছিল,
তখন মিঠু কষে
পড়ার ঘরে বসে,
খাতার পাতায় কাব্য-প্রাসাদ গড়ছিল।

ভাব জোটে যেই ছন্দ উধাও আবডালে
মিলের মিছিল পিট্‌টান দেয় ফাঁকতালে!
একের দেখা পেলে
অন্যে নাহি মেলে,
খুঁজতে তাদের মেজাজ মিঠুর চড়ছিল।

চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলই নিতান্ত,
গড়িয়ে দুপুর ঠিক যে তখন দিনান্ত।
মিঠুর আশেপাশে
আঁধার ঘিরে আসে,
বিজ্‌লী আলোও ঠায় গড়বড় করছিল।

অন্ধকারের আড়াল থেকেই বললে মা,
ঢের হল, এই কাব্য বাতিক দাও ক্ষ্যামা।
কোথায় খাতা দেখি?
মিঠুর দশা একি!
চোখ দুটো তার নোনতা জলেই ভরছিল।

তবুও মিঠুর সত্যি সাবাস বুদ্ধি যে,
বললে,—বেজায় ঘুটঘুটে আর পথ ভিজে,
হোঁচট শুধু খাবে,
আর কি খুঁজে পাবে
কোন্‌খানে এই কাব্যপুরীর দোর ছিল?

ফুলটুসী গো ফুলটুসী

শ্রীশংকরনাথ ভট্টাচার্য

সূয্যিঠাকুর সোনা রঙ, শিউলিফুলের গন্ধে
যুইয়ের মালা গলায় ঝোলা বর আসতে সন্ধ্যে।
ফুলটুসীর খেয়াল খুশী গায়ে পরবে গয়না,
নোলক নাকে ঢোলক কাখে দেখতে-শুনতে ময়না।
ছয় বেহারার পালকী চেপে
ধান-দুব্বো মেপে মেপে
বরের সাথে শ্বশুর-ঘরে যা-বে
(আর) বরের পানে ঠ্যাকার দিয়ে চা-বে।

মৌ টুস্ টুস্ ধিতাং ধিতাং
রঙীন ফিতে রূপোর কাটায়
রঙীন ফুলের চমক সাজে
পান-সুপুরী খেতো কবে
রাখবে মেথি পাতার বাটায়।
পা ঝুম্ ঝুম্ নূপুর বাজে—
হয়তো বেণী, নয় তো খোঁপা
নীলচে ফিতে না-চবে,
তাই না দেখে পুতুল বরের
মনের বাঁশী বা-জবে।
ঢে-কুচ-কুঁচ ঢেঁকির পাড়ে
পালকীটাকে শুইয়ে রেখে ঝুম—
হে রামা হো বরের সাথে
ফুলটুসীরও খেয়ালখুশীর ধুম।

চিঠি

শ্রীসর্বাণী দাশগুপ্তা

নীল কাগজে লিখে, ভরে
নীলচে রঙের খামে
পাঠিয়ে দিলাম একটি চিঠি
আমার মায়ের নামে।

ওই যেখানে তারারা সব
জ্বল্‌ছে মিটিমিটি—
ঐখানেতে পাঠিয়ে দিলাম
ছোট্ট আমার চিঠি।

মা যে আমায় ফেলে রেখে
একলা গেছে চলে,
যাবার আগে একবারও তো
যায় নি আমায় বলে!

আমার 'পরে রাগ করেছে
তাই কি গেল চলে?
আর কখনো আসবে নাকি
তুলে নিতে কোলে?

সত্যি করে বলছি মাগো,
যদি আসো তুমি,
লক্ষ্মী-ছেলে হয়ে যাব—
করব না দুষ্টুমী।

রূপকথা

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ দত্ত

কে যায় কে যায় ?

ঝলমলিয়ে তলোয়ারে রাতনিশুতি তিনপহরে
নিদনিদালী তেপান্তরে কাঁপন ধরে গায়—
কে যায় ?

ঘুমঘুমানী গান গাই রে, পাড়া জুড়োলো বুঝি তাই রে,
বর্গী এলো—বর্গী এলো মেঘে আকাশ ছায়—
কে যায় ?

পান্নাপাতায় হীরেমোতি ফুল আনতে কে যায়,
রাজকন্যার মায়াবতী ঘুম ভাঙতে কে যায় !

সাতপাহাড়ের তে-কোণ চূড়োয় ব্যাঙ্গমা কয় ব্যাঙ্গমী বৌ শোন,
দস্যি বড় খোকন সোনা জয় করে সে আসবে তিন ভুবন।

ফ্লাইং ক্লাব

শ্রীঅর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে মাস দুই-চার
রাশভারী শালিকটা ছিল যে বেকার,
বেশ কিছু ভেবে দিল নয়া প্রস্তাব
বটগাছটায় খুলে ফ্লাইং-এর ক্লাব।

ভোর হতে দেখি শুধু ট্রেনিং-এর ভীড়
কিউ দিয়ে দলে দলে ছোক্‌রা পাখির,
কাক আর চিলগুলো দেখে হতবাক
রোজগেরে শালিকের বেড়ে গেছে জাঁক।

মহাকাশ-অভিযান

শ্রীঅমলেন্দু সেন

ছেলেবেলায় একটি কবিতায় পড়েছিলাম—

"চড়িয়া বিমানে মোরা উর্দ্ধলোকে যাই।
পদতলে মর্ত্যলোক পড়ে র'ল ভাই" ॥

কথাটা কিন্তু খুব ঠিক নয়। পৃথিবীর ওপরে যে হাওয়া, তার মধ্যে যত উঁচুতেই ওড়ো না কেন, তুমি পৃথিবীতেই আছ। কারণ ডাঙা, জল আর এদের ঘিরে হাওয়া—এই তিন নিয়েই পৃথিবী। এই হাওয়ার রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে পারলে তবেই বলা চলে যে পৃথিবী ছেড়ে এসেছি, সেটা আমাদের পায়ের তলায় পড়ে আছে।

আমাদের মাথার ওপর যে আকাশ, তার শ' দুয়েক মাইল ওপর পর্যন্ত এই হাওয়া আছে। এই হাওয়ার মধ্যেই এরোপ্লেন চলে, মেঘ উড়ে বেড়ায়, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে। তার ওপরে, হাওয়া যেখানে ফুরিয়ে গিয়েছে তার ওধারে,—যে আকাশ তা একেবারে ফাঁকা। ফাঁকা মানে এই যে নীচের আকাশের সবটা জুড়ে যেমন হাওয়া আছে, উপরের আকাশে সে রকম কিছু নেই। কিন্তু দূরে-দূরে ছড়ানো-ছিটানো ভাবে অসংখ্য জিনিস আছে সেই ওপরের আকাশে। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারারা সবাই সেই আকাশে। আমাদের এই পৃথিবীটাও সেই বিরাট বিশাল বাইরের আকাশের মধ্যেই রয়েছে।

যতদূরের কথা ভাবতে পার, তার চেয়েও দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সেই ওপরকার আকাশ। নীচের আকাশের থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে এই আকাশকে বলা হয় মহাকাশ। ইংরেজীতে একে বলে স্পেস্। আবার, ফাঁকা বলে একে মহাশূন্যও বলা হয়।

মানুষ আসলে হচ্ছে ডাঙার প্রাণী। তা ডাঙায় আছিস, ডাঙার ওপরে দুই ঠ্যাং ফেলে ঘুরে বেড়া, খা-দা, সুখে থাক। তা

নয়, তার সখ হল যে জলের ওপরেও বেড়াবে। তাই ক্রমে ক্রমে সে বের করল ভেলা, নৌকো, জাহাজ, আরো কত কি! ডাঙা হল, জল হল, তবে আর হাওয়ার মুল্লুকটাই বা বাদ যায় কেন? হাওয়ার মধ্যে উঠে কি করে বেড়ানো যায়, তাই নিয়ে আদা-জল খেয়ে লেগে গেল নানা দেশের মানুষ।

প্রথমে চেষ্টা হল যে পিঠে পাখীর মত দুই ডানা বেঁধে ওড়া যায় কিনা। তাতে যন্ত্র লাগিয়েও দেখলে কেউ কেউ। তারপর এল হাওয়ার চাইতে হালকা জিনিসের সাহায্যে ওড়বার চেষ্টা। গ্যাসভরা বেলুনে, তারপর গ্যাসভরা জেপেলিনে চড়ে মানুষ হাওয়ায় বেড়াতে লাগল। তারপর এল হাওয়ার চাইতে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে ওড়বার দিন। এরোপ্লেন হচ্ছে সেই যন্ত্রের হাওয়াই-জাহাজ।

তারপর? ডাঙায়, জলে, হাওয়ায় বেড়ানো হল বটে, কিন্তু মানুষ তাই নিয়ে ভুলে থাকবার পাত্র নয়। পৃথিবীর সব জায়গায় বেড়ানো হয়ে গিয়েছে, এবার তো তাহলে পৃথিবীর বাইরে যেতে হয়!

শুনলে মনে হয়—এ আর একটা বেশী কথা কি? আজকাল কত ভাল ভাল এরোপ্লেন বেরিয়েছে, তাতে উঠে খাড়া উঁচুদিকে চোঁ করে উঠে গেলেই তো হয়, দুশো মাইল চওড়া হাওয়ার রাজ্য পেরিয়ে যাওয়া তো সিকি ঘণ্টার ব্যাপার! আজকালকার শব্দের চাইতে দ্রুতগামী জেট. প্লেন তো অক্লেশে ঘণ্টায় আটশো মাইল যেতে পারে।

কিন্তু কাজের বেলা দেখা গিয়াছে যে দুশো মাইল তো দূরে থাক, কোনও এরোপ্লেন হাওয়ার মধ্যে পুরো তের মাইল উঁচুতেও উঠতে পারে নি। এরোপ্লেন যে ব্যবস্থায় চলে, তাতে তার সাধ্য নেই যে আকাশে বিশ-ত্রিশ মাইল ওপরেও যায়—মহাকাশে গিয়ে পৌঁছবার তো কথাই নেই।

বেশ তো, তাহলে নতুন কোনও উপায় বের করো! এরো-

প্লেনের মত পাখা দিয়ে হাওয়া কেটে ওপরে উঠবার চেষ্টা ছেড়ে দাও।

সে রকম একটা জিনিস অনেককাল আগে থেকেই জানা ছিল। তা হল হাউই, যাকে ইংরেজীতে বলে রকেট। সেটা সাধারণতঃ একটা আতসবাজি বলেই আমরা জানি। কিন্তু কখনও কখনও বুদ্ধিমান্ সেনাপতিরা জিনিসটাকে একটু বদলে নিয়ে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবেও কাজে লাগিয়েছেন বলে জানা যায়।

হাউই জিনিসটার ভেতরকার কথা হচ্ছে যে তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে হবে, অথচ সেই চাপটা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তার একদিকে একটা ফুটো থাকবে। বিজ্ঞানের নিয়মে, ঐ ফুটো দিয়ে চাপটা বেরিয়ে এলেই গোটা হাউইটা হুস্ করে ছুটে যাবে ফুটোর ঠিক উলটো দিকে।

হাউই বাজিতে নিশ্চয় দেখছ যে তার নীচের ফুটোয় পরানো পলতেয় আগুন দিলে, সেটা তার মাথা যেদিকে সেদিকেই,—সোজা ছোটে। খেলনা বেলুন ফুলিয়ে হঠাৎ তার মুখ খুলে দিলে সেটাও ঐ একই কারণে মুখের বিপরীত দিকে ছুটে যায়। আর উড়ন-তুবড়ী তো দেখেছ? সেই যে কালীপুজোর রাত্রে ছোট ছোট মাটির খোল আগুনের দাগ কেটে চোঁ করে আকাশে উঠে যায়, তারপর নেমে এসে পড়ে ঠাস করে ফেটে যায়—সেইগুলো হ'ল উড়ন-তুবড়ি। তা ছুঁড়বার সময় তার ফুটোর দিক্‌টা একেবারে ঠিক মাটির দিকে মুখ করে রাখতে হয়, নইলে সেটা সোজা আকাশে ওঠে না। কারণ, উড়ন-তুবড়িও চলে হাউয়ের নিয়মে।

এই যে ফুটো দিয়ে বেড়িয়ে যাবার সময় ফুটোর ঠিক বিপরীত দিকের মাথায় ধাক্কা দিয়ে জিনিসটাকে চালালে, একে বলে জেট্-প্রপাল্‌শন্, অর্থাৎ, জেট্-এর ঠেলায় চালানো। জেট্ কথাটার অর্থ সরু মুখ দিয়ে নির্গত কোন জিনিসের ধারা।

আকাশে ওঠবার কাজে জেট্-প্রপাল্‌শন্‌কে কাজে লাগাবার উপায় বের করবার চেষ্টা যাঁরা প্রথম করেন তাঁদের

মধ্যে আমেরিকার গডার্ড আর জার্মানীর ওবের্থ এই দুই বিজ্ঞানীর নামই বেশী। ওবের্থ এই হাউই বা রকেট চালানো নিয়ে অনেক আঁকজোক আর হিসেব-টিসেব কষেছিলেন। আর, গডার্ড একেবারে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন যে রকেটের সম্ভাবনা কত। ১৯৩৫ সালে তাঁর তৈরী একটি রকেট আকাশে দেড় মাইল উঁচুতে উঠেছিল, তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সাতশো মাইল। তাহলে তো দেড় মাইল যেতে তার লেগেছিল সাত সেকেণ্ড।

এইভাবে আধুনিক রকেট-যুগের শুরু হয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রকেটে করে দূর-দূরান্তরে শত্রুরাজ্যে বোমা ফেলবার জন্য জার্মানীতে এক রকম রকেট বেরোল, তার নাম ভি-২। এই রকেটের কৌশলটা আমেরিকা জানতে পারল। তখন যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। কিন্তু তাই নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা কাজ করতে লাগলেন।

ওদিকে রাশিয়াতেও যে বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে এতটা মেতে গিয়েছেন সে কথা বাইরে সঠিক ভাবে আগে জানা যায় নি। তারপর, বলা নেই-কওয়া নেই, ১৯৫৭খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তাঁরা একটি রকেট ছাড়লেন—অন্য কোনও দেশ লক্ষ্য করে নয়, একেবারে সোজা মহাকাশের দিকে। তার নাম দেওয়া হয়েছিল স্পুটনিক-১। ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইলেরও বেশী ছিল তার গতিবেগ। পৃথিবী ছাড়িয়ে সেটা মহাকাশে পৌঁছে গেল। কিন্তু পৃথিবীর যে টান,—যাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ,—সেই টানকে কাটিয়ে সেটা একেবারে বেরিয়ে যেতে পারল না। পৃথিবীর টানে সে তার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। চাঁদের মত স্পুটনিকও হল পৃথিবীর একটা উপগ্রহ। তবে, এটা মানুষের তৈরী এই যা তফাত।

আমেরিকা এ বিষয়ে একটু পিছিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু নিরুৎসাহ হল না। তাদের তৈরী প্রথম উপগ্রহ এক্স্‌প্লোরার-১ কয়েক মাসের মধ্যেই মহাকাশে গিয়ে উঠল। সেই থেকে এই

দুই দেশ, রাশিয়া আর আমেরিকা, যেন পাল্লা দিয়ে মহাকাশে রকেটের পর রকেট পাঠাচ্ছে। তার সবগুলোই যে উপগ্রহ হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সে কথা পরে বলছি।

তার আগে কয়েকটা কথা বলে [illegible]ক। এই যে ঘণ্টায় আঠারো-কুড়ি হাজার মাইল গতিবেগ, যা কয়েক বছর আগে মানুষে সৃষ্টি করার কথা ভাবতেও পারত না, তা করা হচ্ছে কি করে? বাষ্প বা পেট্রলের তো কর্ম্ম নয়, নতুন নতুন জ্বালানি বের করা হয়েছে এর জন্যে। যেমন তরল অক্সিজেন, তরল হাইড্রোজেন। এমন কি পরমাণু-শক্তির সাহায্যে রকেট চালাবার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তার সাহায্যে তরল হাইড্রোজেনে বিস্ফোরণ ঘটালে, তার প্রচণ্ড চাপে রকেট ছুটবে সাংঘাতিক বেগে।

যদি পর পর এ রকম বিস্ফোরণ ঘটানো যায় তাহলে গতিবেগ আর কমতে পারে না, কি বল? মহাকাশযাত্রী রকেটে সেটা করা হয় এই ভাবে। রকেটটা এমন ভাবে কয়েকভাগে তৈরী করা হয়, যাতে কাজ ফুরিয়ে গেলে এক-একটা ভাগ খসে পড়ে যায়, আর তার পরের অংশে বিস্ফোরণ হয়ে কাজ শুরু হয়। সবটার শেষ মাথায় থাকে আলাদা একটা ঘর, তাতেই থাকে মহাকাশে যারা যাবে তারা, আর নানারকম কলকব্জা। কতকটা যেন রেলগাড়ীর মত। তবে রেলগাড়ীতে থাকে একখানা ইঞ্জিন আর হয় তো দশ-বারোখানা কামরা, আর এতে যেন পর পর তিনটে ইঞ্জিনের পেছনে একখানা কামরা। আর এক-একটা ইঞ্জিনের দম ফুরিয়ে গেলে সে আলাদা হয়ে যায়, তার পরেরটা অমনি গাড়ী টানা শুরু করে।

আগেই বলেছি যে ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল, বেগে ছুটে গিয়েও স্পুটনিক-১ পৃথিবীর টান কাটাতে পারে নি। মহাকাশে যাবার একটা প্রধান বাধা হল এই টান বা মহাকর্ষ। প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চাঁদকে পর্যন্ত পৃথিবী এই টানে টেনে রেখেছে। সেই টান

এড়িয়ে যেতে হলে ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৫০০০ মাইল বেগে চলতে হবে। ঘণ্টায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার মাইলের মধ্যে বেগ হলে সে রকেট পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠতে পারবে বটে, কিন্তু সোজা বেশীদূর যেতে পারবে না—পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে।

এত জোরে রকেট চালানো নিয়ে তো শত শত সমস্যা আছেই, তার ওপর আবার সেই রকেটের সঙ্গে যদি মানুষও মহাকাশে যেতে চায় তাহলে তো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার আর অন্ত থাকে না। যেমন, ধরো, অত ওপরে উঠলে হাওয়ার চাপ না থাকায় তার দেহটি বেলুনের মত ফুলে ফেটে যেতে পারে। কিংবা হঠাৎ তার শরীরটা ত্রিশ-চল্লিশ গুণ ভারী লাগতে পারে। অথবা এমন অবস্থা হতে পারে যেখানে তার দেহের কোন ওজনই নেই—সেটা হবে মাধ্যাকর্ষণ যখন না থাকবে, তখন। পৃথিবীর হাওয়াটা প্রচণ্ড শক্তিশালী আর ভয়ানক ক্ষতিকর একরকম রশ্মিকে ঠেকিয়ে রেখেছে, হাওয়া পেরিয়ে গেলে তাদের হাত থেকে মানুষ বাঁচবে কি করে? যা ভাবা যায় না এমন শীতেই বা তার কি হবে? নিঃশ্বাস নেবার কি ব্যবস্থা হবে? কি খাবে? এই রকম হাজার সমস্যা।

সে সবের জন্যে হাজার হাজার রকমের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তার মধ্যে আমরা সব চাইতে বেশী দেখতে পাই, অবশ্য ছবিতে,—একরকম অদ্ভুত পোষাক। তাকে বলে স্পেস-স্যুট। তা পরলে আর বাইরের ঠাণ্ডা, গরম, চাপ ইত্যাদির কোনও তোয়াক্কা রাখতে হয় না।

যতদিন ধরে এই সব উপায় বের করা হচ্ছিল, ততদিন ধরে বাইরে রকেট পাঠিয়ে, তার ভেতরকার যন্ত্রপাতি দিয়ে বাইরেকার অবস্থা-ব্যবস্থা বুঝে নিচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিকরা। তারপর ঠিক হল যে একটি প্রাণীকে মহাকাশে তুলে দিয়ে কি হয় তা দেখা যাক। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বেলুনে করে আকাশে প্রথম প্রাণী উঠেছিল হাঁস, মোরগ আর ভেড়া একসঙ্গে। এবার মহাকাশে প্রথম প্রাণী উঠল

রাশিয়ার কুকুর লাইকা। সে নির্বিঘ্নে ফিরে এলে পরের বার গেল দু'টো বানর। বানর আর মানুষের শরীরে অনেক মিল আছে কিনা, তাই তারা ফিরে এলে মনে হল যে মানুষও পাঠানো যেতে পারে এবার।

সেই প্রথম মানুষকেও মহাকাশে পাঠালেন রাশিয়ারই বৈজ্ঞানিকরা। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে তাঁরা যুরি গাগারিন

মহাকাশে প্রথম মানুষ—যুরি গাগারিন

বলে একজনকে মহাকাশে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর রকেটও অবশ্য পৃথিবীর টানের বাইরে যেতে পারে নি, তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে ঘণ্টা দুয়েক বাদে পৃথিবীতে ফিরে এল। কথায় বলে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া! এতদিনে বুঝি সে কথাটা সত্য হল।

এরপর মহাকাশে গেলেন আমেরিকা থেকে একসঙ্গে দু'জন—শেপার্ড এবং গ্রিমস। তারপর রাশিয়া থেকে টিটভ। তারপর আবার আমেরিকা থেকে একজন, তাঁর নাম গ্লেন। যিনিই যান তিনিই মহাকাশের কোনও নতুন খবর—নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন। তাতে মহাকাশে যাবার বন্দোবস্তেরও উন্নতি হতে থাকে।

রাশিয়া আর আমেরিকা থেকে এক এক করে আরও মোট ছ'জন মহাকাশ ঘুরে আসার পর আর এক আশ্চর্য ব্যাপার হল। রাশিয়ার একটি মেয়ে প্রথম মহিলা অভিযাত্রী হয়ে মহাকাশে ঘুরে এলেন। সত্যি, মেয়েরাই বা কম কিসে? তাঁর নাম ভ্যালেনটাইনা তেরেস্‌কোভা।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যতজন মহাকাশে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাশিয়ার বিকোভ্‌স্কীই সবচাইতে বেশী সময় মহাকাশে থেকে

মহাকাশে প্রথম মহিলা—ভ্যালেনটাইনা তেরেসকোভা

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন—প্রায় পুরো ৫ দিন ধরে। এই সময়টাতে তিনি মহাকাশে ৩৫ লক্ষ কিলোমিটার পথ ঘোরেন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এর ৯.ভাগের এক ভাগ মাত্র।

১৯৬৪ সালে রাশিয়া এক মহাকাশযানে একসঙ্গে তিনজনকে পাঠাল, সেটার নাম 'ভসথদ' অর্থাৎ সূর্যোদয়। এর আগে কখনও এতজন একসঙ্গে মহাকাশে যান নি, আর এতবড় মহাকাশযানও তৈরী হয় নি।

তার পরের বার আমেরিকার পালা। তাদের জেমিনি-৬ আর জেমিনি-৭ মহাকাশে আলাদা আলাদা উঠে গিয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন তো করলই—একটা থেকে আরেকটার মধ্যে জ্বালানি চালান করল, তারপর দুটোয় মিলে যে পথে ঘুরছিল, তার চাইতে উঁচুতে উঠে গেল।

তারপর হল আরও এক কাণ্ড। এক জাহাজের দরজা খুলে মহাশূন্যে হেঁটে অন্য জাহাজে যাওয়া, আবার তা থেকে ফিরে আসা, মহাকাশের ধুলো কুড়িয়ে আনা—ইত্যাদি সব আশ্চর্য ব্যাপারও করলেন এই আমেরিকান মহাকাশচারীর দল। পরে অবশ্য রাশিয়ানরাও এ-সব করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরাও পিছিয়ে নেই।

এ পর্যন্ত সব মহাকাশযানই মহাকাশে খানিক উঠে সেইখান থেকেই পৃথিবীকে পাক খেত। তারপর ১৯৬৮-তে আমেরিকা থেকে ছুটে বের হল এক বিরাট মহাকাশযান, অ্যাপোলো-৮। সেটা প্রথমে ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠল, তারপর আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মহাকর্ষের টান ছিঁড়ে স্বাধীন হয়ে ছুটল চাঁদের দিকে। তখন আর তার নিজের চলবার দরকার রইল না, চাঁদই তাকে তার দিকে টেনে নিতে লাগল। এইভাবে চাঁদের ৬০ মাইল দূর পর্যন্ত এসে তার চারদিক্ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন অ্যাপোলো-৮-এর তিনজন যাত্রী। তারপর তাঁরা ফিরলেন।

আরও কয়েকবার এইভাবে গিয়ে কাছে থেকে চাঁদকে দেখে-শুনে আসা হল। তারপর চাঁদে গিয়ে নামবার তোড়জোড় হতে লাগল। ঠিক হল যে চাঁদের খুব কাছে গিয়ে তাতে একটা ছোট গাড়ীতে করে দু'জনকে চাঁদে নামিয়ে দেওয়া হবে। তাকে বলে লুনার মডিউল। আর, মহাকাশযানের আসল অংশটা—যাকে বলে কম্যাণ্ড মডিউল—চাঁদের আকাশে ঘুরতে থাকবে। তাতে একজন থাকবেন।

এই তিনজন লোককে ঠিক করা হল নানারকম তালিম দিয়ে। তাদের নাম আর্মস্ট্রং, অ্যালড্রিন আর কলিন্স। তাঁদের জাহাজের নাম হল অ্যাপোলো-১১, আর যে রকেট সেই জাহাজকে নিয়ে যাবে, তার নাম হল স্যাটার্ন-৫। সবটা মিলিয়ে ৩৬৪ ফুট উঁচু, আর সবশুদ্ধ ওজন এক লক্ষ মণেরও বেশী—৪০০০ টন।

এই রাক্ষুসে জাহাজ আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে আকাশে উঠল ২১শে জুলাই ১৯৬৯। পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশ ফুঁড়ে সেটা গিয়ে ক্রমে হাজির হল চাঁদের ৭০ মাইলের মধ্যে।

চাঁদের বুকে প্রথম মানুষ—নীল আর্মস্ট্রং

সেখান থেকে লুনার মডিউলে চেপে চাঁদে গিয়ে পৌঁছলেন আর্মস্ট্রং আর অ্যালড্রিন। কলিন্স রইলেন আসল মহাকাশযানে বসে।

আর্মস্ট্রং আর অ্যালড্রিন এবার চাঁদের ওপর পা ফেললেন। পৃথিবীর মানুষ সত্যি সত্যিই চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এ কথা কেউ কখনও ভাবতে পারত?

তাঁরা ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট চাঁদে কাটালেন। এর মধ্যে তাঁরা

চাঁদের ধুলোপাথর নিলেন, নানা যন্ত্রপাতি বসালেন, আমেরিকার আর নানা দেশের নিশান পুঁতলেন, স্মৃতিফলক লাগালেন, আর সারাক্ষণ রেডিওতে খবর পাঠাতে লাগলেন পৃথিবীতে তাঁদের কেপ কেনেডির অফিসে।

তারপর তাঁরা লুনার মডিউলে চড়ে ফিরে এলেন অ্যাপোলো-১১-র কাছে। তাতে উঠে তাঁরা লুনার মডিউলটিকে ফেলে দিলেন, সেটি মহাকাশে হারিয়ে গেল। তিনজনকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এল অ্যাপোলো-১১। পৃথিবী জুড়ে জয়ধ্বনি উঠল।
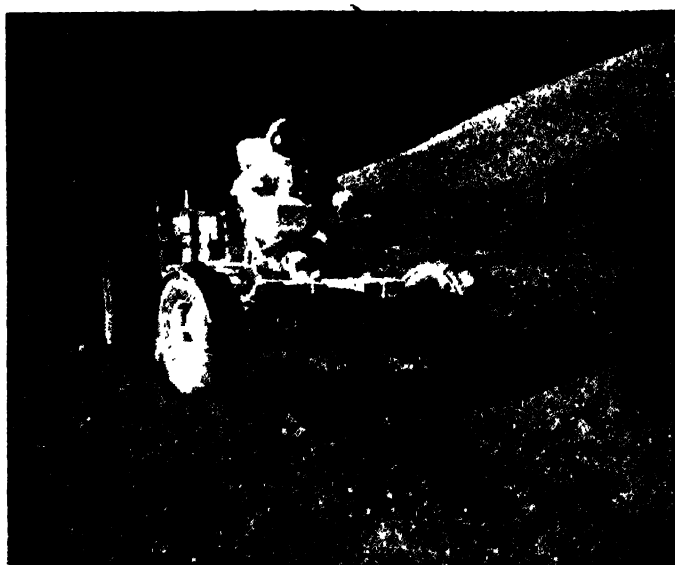
চাঁদে গাড়ী চালাচ্ছেন কমাণ্ডার জিন সেরনান

কিন্তু মানুষের চেষ্টা থামল না। চার মাসের মধ্যেই অ্যাপোলো-১২ তৈরী হল চাঁদে যাবার জন্যে। এবার তাতে গেলেন কনরাড, গর্ডন আর বীন। তাঁরাও একই উপায়ে চাঁদে গিয়ে নামলেন, তবে এবার অন্য একটি অংশে। এবার তাঁরা অনেক বেশীক্ষণ চাঁদে কাটিয়ে, অনেক রকম কাজ করে ফিরলেন।

এইভাবে আমেরিকা থেকে পাঁচবার চাঁদে মানুষ পাঠানো

হয়েছে, চাঁদের নানা অংশে তাঁরা নানারকম কাজ করে এসেছেন। সর্বশেষের অভিযানটিতে গিয়েছিল অ্যাপোলো-১৭, ১৯৭২-এর ডিসেম্বর মাসে।

আমেরিকা আপাততঃ চন্দ্র-অভিযান বন্ধ রেখেছে কিন্তু তার বদলে তারা এমন একটা কাজ সুরু করেছে যা মহাকাশবিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে প্রচুর সাহায্য করবে। অ্যাপোলো-১৭কে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেবার জন্য তারা যে বিরাট রকেট (স্যাটার্ন-৫) ব্যবহার করেছিল তারই সাহায্যে তারা এবার মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা মহাকাশ-গবেষণাগার বা স্কাই-ল্যাবোরেটরী। সংক্ষেপে

স্কাইল্যাব আর তার যাত্রীদল - প্রথমদল উপরে,
দ্বিতীয় দল নীচে বাঁদিকে আর তৃতীয় দল নীচে ডানদিকে

স্কাইল্যাব। স্পেস্-ষ্টেশনও বলা যেতে পারে এটিকে। পৃথিবী থেকে প্রায় চারশ' কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' মাইল উঁচুতে উঠে একশ' টন (মণের হিসেবে ২৮০০ মণের কাছাকাছি) ওজনের এই বিরাট গবেষণাগারটি এখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এতে আছে

বসবার-শোবার, রান্না করার, স্নান করার পৃথক্ পৃথক্ ৩টি কামরা, আর আছে প্রচুর যন্ত্রপাতি। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা যাতে দীর্ঘদিন ধরে এখানে থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাকাশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারেন তাই এই ব্যবস্থা। ঠিক হয়েছে বিজ্ঞানীরা তিনটি দলে ঐ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রথম দল থাকবেন ২৮ দিন, ২য় ও ৩য় দল থাকবেন প্রত্যেকবার ৫৬ দিন করে। প্রথম দল এরই মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। এই প্রবন্ধ লিখবার সময় দ্বিতীয় দলও চলে গেছেন। এত দীর্ঘ

রাশিয়ার লুনোখোদ

মানুষ নেই এতে; তবু জোগাড় করে এনেছে চাঁদের মাটি

সময় মহাকাশে থাকার পরীক্ষা এর আগে আর কখনও হয় নি। বিজ্ঞানীদের এই অভিযান এবং গবেষণা শেষ হলে পৃথিবী, সূর্য এবং মহাকাশ সম্বন্ধে আরও কত কি যে জানা যাবে তার ঠিক নেই।

কিন্তু রাশিয়া করছে কি? রাশিয়া একবারও চাঁদে মানুষ নামাবার চেষ্টা করল না। তাহলে কি তারা হার মেনে বসে আছে? তাও নয়। তারা আমেরিকার ওপর টেক্‌কা মেরেছে আর এক ভাবে। তারা পৃথিবীতে বসেই একখানা গাড়ীকে চাঁদে নামিয়ে দিয়েছিল, আর রেডিওতে হুকুম পাঠিয়ে তাকে দিয়ে মানুষের মত নানা কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেই গাড়ীর নাম লুনোখোদ, আর তাদের মহাকাশযান ছিল লুনা-১৭।

এইসব অভিযানের ফলে চাঁদের বিষয়ে কত নতুন নতুন কথা বৈজ্ঞানিকরা জানতে পেরেছেন, সে সব কথা আর এখন বলব না।

চাঁদে তো যাওয়া হ'ল, এবার কি? বিজ্ঞানীরা বলছেন, আরও এগিয়ে যাব। 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্রসূর্যগ্রহ-তারা ছাড়ি' চলবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তার চেষ্টা সজোরে চলছে।

চাঁদকে ছাড়িয়ে মানুষের নজর স্বভাবতঃই পড়েছিল শুক্র গ্রহের ওপর। কেননা সে পৃথিবীর সব চাইতে কাছের গ্রহ, আড়াই কোটি মাইল দূরে। তাই রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা গত বছর তাকে লক্ষ্য করে একটি রকেট ছেড়েছিলেন। ১১৭ দিন ধরে চলে সেটা শুক্রগ্রহের কাছাকাছি গিয়ে পৌছায় ২২শে জুলাই, ১৯৭২ তারিখে। তাতে মানুষ-টানুষ ছিল না। তবু সেটা থেকে একটা গাড়ী শুক্রগ্রহে নামিয়েছিলেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। গাড়ীর যন্ত্রই সেখান থেকে শুক্রগ্রহের অবস্থা সম্বন্ধে নানা খবর পাঠিয়েছে।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ আরও বেশী দূরে। কিন্তু শুক্রগ্রহে মানুষের নামা যতটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে তেমন নয়। তাই মঙ্গলগ্রহে যাবার কথাও ভাবা হচ্ছে।

ওদিকে আমেরিকা নাকি বৃহস্পতি গ্রহের খবর পাবার জন্যে পাঠিয়েছে পাইওনিয়ার-১০ নামে এক মহাকাশযানকে। যে গতি-

বেগ নিয়ে সে ছুটেছে, তা নাকি সেকেণ্ডে ১০ মাইল, ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল। চাঁদকে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি এত দূরে যে তার কাছে যেতে এর লাগবে ন'মাস। তারপর সে হয় তো য়ুরেনাস, নেপচুন, প্লুটো গ্রহগুলিও পার হয়ে, সৌরজগৎ ছাড়িয়ে চলে যাবে—কোথায় কে জানে!

এ সব শুনলে স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে হয়—মানুষের তো জ্ঞান-পিপাসার শেষ নেই, তা মেটাবার জন্যে তার চেষ্টাও বিরামবিহীন।

পথ

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

ও পথ, তুমি এসো, এসো, এসো,
একটুখানি জান্‌লা ছুঁয়ে বসো।
বন্ধু হয়ে খোকার কথা শোনো
তার পরে তা
পৌঁছে দিও দূর সে দেশে কোনো।

দেশান্তরে তোমার আনাগোনা,
হরেক রকম গল্প তোমার শোনা।
নদী সাগর দেখছো তুমি কত,
খোকার কাছে
সে সব খবর নবীনতর হ'তো।

জানি তুমি যাবে অনেক দূর,
ফ্‌লের গন্ধ হাওয়াতে ভরপুর।
না হয় পথে একটু থেমে গেলে,
তোমায় পেলে
খোকার যেন একটি দোসর মেলে

১। আমাদের দেহে ক'-খানা হাড় আছে ?

২। ট্রানজিস্টার কে আবিষ্কার করেছেন ?

৩। পরমাণুর ভেতরকার মূল কণিকাগুলি কি কি ?

৪। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কোন্ পশুকে সর্বপ্রথম মানুষ পুষেছিল ?

৫। তিনটি ব্যায়রামের নাম, যা ডাক্তাররা নিয়েছেন সাধারণ লোকের কথা থেকে ?

৬। টি. বি. বলতে কি বোঝায় ?

৭। সিগারেট খাওয়া উচিত নয় কেন ?

৮। নিউটন কে ছিলেন ? তিনি কি বের করেছিলেন ?

৯। ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের কে প্রচলন করেন ?

১০। টেলিফোন কে আবিষ্কার করেন ?

১১। কার চেষ্টায় ভারতবর্ষে সতীদাহ বন্ধ হয় ?

১২। হিন্দু বিধবাদের দুঃখে কার প্রাণ গলে গিয়েছিল ? তাদের জন্য কি করেছিলেন তিনি ?

১৩। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায় ?

১৪। বাংলা শিশুসাহিত্যের উপর পুরস্কারের প্রবর্তন প্রথম কারা করেছিল এবং পেয়েছিলেন কে ?

১৫। বাংলা সাহিত্যে প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কার কে পেয়েছিলেন ?

: কেমন বুদ্ধি :

যদি সবগুলির উত্তরই তোমার ঠিক হয় তবে তুমি খুব বুদ্ধিমান্।
যদি ১০টার উত্তর ঠিক হয় তাহলে তুমি বুদ্ধিমান্।
যদি ৫টার উত্তরও তোমার ঠিক না হয় তাহলে তুমি নিজেকে যত বুদ্ধিমান্ ভাব তত বুদ্ধিমান্ তুমি নও।

[উত্তর ২৬১ পৃষ্ঠায়]

পণ

শ্রীলীলা মজুমদার

শিমলার মতো জায়গা খুব কমই আছে। তা হবে না? ওখানে ইংরেজ আমোলে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। এখনো তার বোলবোলাটি কম নয়। শীতের সময় কুফ্রিতে স্কি করতে যায় লোকে। ফাগু বলে একটা জায়গা আছে, তার দৃশ্য ইহলোকের নয়। সেখানে ধাপে ধাপে আলুর চাষ হয়। তা ছাড়া কি ভালো ভালো খাবারের দোকান! একদিন আকাশে গোল্ডেন ঈগল দেখেছিলাম। অবিশ্যি এ গল্পটা আদপেই শিমলার বিষয় নয়, সমস্ত ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছিল শিমলা পৌঁছবার অনেক আগেই।

পুজোর ছুটিতে যাচ্ছিলাম শিমলায় বড় মাসির বাড়িতে। একাই যাচ্ছিলাম। দুই রাত দেড় দিনের ওয়াস্তা; স্লীপার কোচে শোবার জায়গা রিজার্ভ করা; সঙ্গে যথেষ্ট শুকনো খাবারদাবার ও তিনটে পুজো-বার্ষিকী। তার ওপর পরদিন এলাহাবাদে বড় মাসির ভাগ্নে জম্বু উঠল, এই বড় একটা টিপিন-ক্যারিয়ার বোঝাই লুচি বেগুনভাজা আলুর দম মাংসের বড়া আর প্যাঁড়া নিয়ে। জম্বুর জায়গা আমার মাথার ওপরের বার্থে।

গাড়ীতে উঠেই জম্বু ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আমার কানে কানে বলল, "চারদিকে পুলিশের চর আর গুপ্ত-গোয়েন্দা গিজগিজ করছে। সিকিউরিটি ভল্টের ডাকাতরা নাকি এই গাড়িতে মাল-পাচার করবার চেষ্টা করবে। সোনার তাল, হীরে, জহরৎ।"

চেয়ে দেখলাম বাস্তবিকই গাড়ির ভেতরে, বাইরের প্লাটফর্মে কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্য। একটা কিছু যে হচ্ছে সেটা স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘাবড়ে গেলাম। বাবা! তিন তিনটে নতুন পুজো-বার্ষিকী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কে জানে কি হয়।

জম্বু বলল, "কে গোয়েন্দা কে, আইনভঙ্গকারী বোঝে কার বাবার সাধ্যি! শুনেছি চোর-চোর চেহারা দেখেই নাকি গুপ্ত

গোয়েন্দা বিভাগে লোক নেওয়া হয়। তুই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস্। বিমু তালুকদারের কেস্ বাবা, সে নাকি একশো হাত দূর থেকে শুঁকে শুঁকে বলে দিতে পারে কে সাধু কে চোর। নিজেরও স্রেফ একটা মিনমিনে শয়তানের মতো চেহারা। কে বলবে অত বড় ছুঁদে ডিটেকটিভ। আমি অবশ্যি নিজের চোখে দেখি নি তাকে। আমার খুড়তুতো ভাই গুপির কাছে শুনেছি। ওরা সবাই টিকটিকি হবে। সেই রকম চেহারাও। হয় চোরের মতো দেখতে হওয়া চাই, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতো।"

পাশের লোকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, "ঠিক তাই। আমি বিমু তালুকদার। বড় শক্ত কাজে হাত দিয়েছি, তোমাদের সাহায্য চাই।"

অবাক্ হয়ে গেলাম, এই চাষাভুষো প্যাটার্ণের লোকটা সেই বিমু তালুকদার, যার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। বেঁটে, রোগা মতো, তিন-চারদিন খেউরি হয় নি, মাথায় চুল কম, আধময়লা শার্ট, ধুতি খাটো করে পরা, খালি পা, সঙ্গে গামছা-বাঁধা পুঁটলি। শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। চোর ধরতে হলে এই রকমই সাজতে হয়। কেউ সন্দেহ করবে না। অতি সহজেই কাজ হাসিল হবে।

লোকটার দুই কষ বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছিল। আমাকে বলল, "পান খাবে?"

"না স্যার, বাড়িতে রাগ করে।"

ভ্রূকুটি করে বিমু তালুকদার ফিসফিস করে বলল, "স্—স্ চুপ। আমাকে নেকু বলে ডাকবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে এলাহাবাদে ওনাদের বাড়িতে কাজ করি। তিন বছর আছি। তোমার পকেটে কি খলবল করে?"

কি করে টের পেল ভেবে অবাক্ হলাম। বললাম, "গুলতি আর বাছাই বাছাই নুড়ি। ওগুলো ছাড়া কোথাও যাই না। কি ভালো ভালো নুড়ি! মধুপুরে গিয়ে ছোট নদী থেকে কুড়িয়েছি। চকমকি,

ফটিক, আরো কত কি! ছুঁড়তে মায়া লাগে।" একমুঠো বের করে দেখালাম-ও। নেকু—তাকে এরি মধ্যে জম্বুদেব বাড়ির তিন বছরের পুরনো চাকর নেকু বলেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম—নেকু নিজের হাতে নুড়িগুলো নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, আবার আমার পকেটে পুরে দিয়ে বলল, "দিন, দাদাবাবু, টিপিন-ক্যারিয়ারটা; খাবার সময় হ'ল।" এই বলে নিচে উবু হয়ে বসে পড়ল। বুঝলাম হুঁদে টিকটিকি স্রেফ চাকর বনে গেছে।

গাড়ি অনেকক্ষণ হ'ল ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যত লোকের জায়গা, তার চাইতে অনেক বেশি লোক। যতটা চলাফেরা হওয়া উচিত, তার চাইতে অনেক বেশি চলাফেরা। বোঝা যাচ্ছিল যাত্রীদের সঙ্গ চোর টিকটিকি দুই-ই মিশে রয়েছে। কোন্‌টা কে বোঝার জো নেই। আমাদের পাশে দুটো চিমড়ে লোক সরু পেণ্টেলুন আর নাইলনের শার্ট পরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এমন কি তারাও আমার নুড়িগুলো চেয়ে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখল। তাদের আমার চিনতে বাকি রইল না। যদি খুব দামী জিনিস হ'ত, তা হলে আমার নুড়ি ফেরৎ পেয়েছিলাম আর কি!!

নেকু প্ল্যাস্টিকের প্লেটে লুচিটুচ সাজিয়ে আমাদের খুব যত্ন করে খাওয়াল। তারপর নিচে বসে বসেই নিজেও একটুকরো খবরের কাগজে লুচি নিয়ে খেল। বাকি লুচি গুছিয়ে আবার টিপিন-ক্যারিয়ারে ভরে, বন্ধ করে ফেলল। লোক দু'টো ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে গাড়ির অন্য কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বিনু তালুকদারের নিখুঁৎ অভিনয়। আরেকটু রাত হলে আমাদের পাশাপাশি দু'টো বার্থে বিছানা পেতে দিল। কানে কানে বলল, "ওপরে আমি শোব, চারদিকে চোখ রাখতে সুবিধে হবে। মাচায় শোয়ার অভ্যাস আছে। দিল্লী পৌঁছবার আগেই আমার লোকেরা খানা-তল্লাসী করবে। খবরদার, কিছু ফাঁস করবে না। আমি চাকর সেজেই থাকব, যাতে চুনো পুঁটিরাও জালের ফাঁক দিয়ে পালাতে না পারে।"

জগু হঠাৎ বলল, "খানা-তাল্লাসি হবে, নেকু, তোমার ঢাকট আছে তো? ও বার্থটা তো খালিই ছিল।"

নেকু চটে গেল। "টিকিট? কিসের টিকিট? সরকারের গোপন তদন্ত যারা করে তাদের নেই-মানুষ বলে, তাদের আবার টিকিট কিসের? কোনো ভয় নেই দাদাবাবু, ধরপাকড় শুরু হলেই একেবারে নেই হয়ে যাব। শুধু আমার পুঁটলিটা পড়ে থাকবে, সেটাকে খুঁজলে গেঞ্জি বিড়ি আয়না চিরুণী ছাড়া কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। অত কাঁচা কাজ করি না স্যার!"

গুপ্ত-গোয়েন্দার ব্যাপার হলেও গাড়িশুদ্ধ সকলের মুখে কেবল এক কথা। কবে কোন্ রেল গাড়ীতে আইনভঙ্গকারীরা কি ভাবে কি করেছিল। ওদের কথা শুনে শুনে ভালো মানুষের মনেও নানা কু-মতলব গজাতে খুব দেরি হবার কথা নয়। কোন্ ঘোমটা-পরা মেয়ে আঘাটায় নেমে গাড়ির দরজা হাট করে খুলে রাখল আর দস্যুদের দলবল গাড়িতে ঢুকে সব নিয়ে গেল। কার গয়নার বাক্সর অবিকল নকল রেখে, আসল বাক্সটি নিয়ে, কে কবে হাওয়া হয়ে গেল ইত্যাদি।

খানা-তল্লাসি শুরু হ'ল দিল্লী পৌঁছে। পুলিসে পুলিসে প্ল্যাটফর্ম ছেয়ে গেল। সব গাড়ির দরজা সীল করে সার্চ হ'ল। আমাদের জিনিসপত্র মায় টিপিন-ক্যারিয়ার পর্যন্ত খুলে দেখালাম। পকেট থেকে গুলতি নুড়ি বের করতে যাব, সরু পেণ্টেলুনদের একজন হেসে বলল, "ঠিক আছে, ভাই, ও আমাদের দেখা, মধুপুরের ছোট নদীতে কুড়নো।" তা হলে এরাও টিকটিকি! বিনু তালুকদারের মাথা নিচু করার মানে বোঝা গেল। নিজের দলের লোকের কাছেও ধরা পড়তে চায় নি। ওস্তাদ বটে!

অন্য সরু প্যাণ্ট বলল, "তোমাদের লোকটা কোথায়?" তাই তো বিনু, অর্থাৎ নেকু যে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে! তার বদলে একটা নতুন লোক, চোস্ত টেরি কাটা, কালো প্যাণ্ট হলদে শার্ট পরে, এক টাকায় একটা ডট পেন আর একটা ফাউণ্টেন পেন বিক্রি করছিল। কিন্তু বিনুর মতো তার-ও কপালে ছোট্ট একটা কাটার দাগ।

ধরল তাকেও পুলিসে। কলমের বাক্স উল্টে, পকেট ফাঁক করে, প্যাণ্ট, শার্ট ঝেড়েঝুড়েও কিছু না পেয়ে, এক টানে মাথার পরচুলা খুলে ফেলে দিয়ে সন্দেহজনক আচরণ করেছে বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময় সে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল যেন এক্ষুণি খেয়ে ফেলবে। অথচ আমরা তো কিছুই বলি নি।

তার পরেই সেই সরু প্যাণ্টদের একজনের সঙ্গে জম্বুর খুড়তুতো ভাই গুপি এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল, "এই জম্বু, মা বলে দিয়েছে তোরা আজ আমাদের কাছে থেকে, কাল যাবি। তোর মা লিখেছে। বিনুকাকা, এই আমার জ্যাঠতুতো ভাই জম্বু আর ওর বন্ধু নগা।"

বিনুকাকা : বলে কি ছোকরা! তবে কি—তবে কি—আর ভাবতে পারছিলাম না। গুপিদের বাড়ি পৌঁছেই বিনুকাকা আমাদের টিপিন-ক্যারিয়ার খুলে লুচির তালের তলা থেকে এক দলা সোনা বের করে দিলেন। আর আমার পকেটের নুড়িগুলোর মধ্যে থেকে চারটে বড় বড় আ-কাটা হীরে। অবিশ্যি সেগুলোর চেয়ে আমার চকমকি দু'টো অনেক ভালো দেখতে।

বিনু তালুকদার বললেন, "বলি নি গুপি, সাধারণতঃ যারা ভালোমানুষের মতো আচরণ করে তারাই আইনভঙ্গকারী, যেমন এই রঘু ডাকাত। আর যাদের দেখে ছুষ্টু লোক মনে হয়, তারাই দুঁদে ডিটেকটিভ, যেমন আমি। কি হে নগা, টিকটিকি হবে নাকি? চোরাই মাল কোথায় লুকিয়েছে আগেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের এর মধ্যে জড়াতে চাই নি বলে কিছু বলি নি।

"রঘু নিশ্চয় ভেবেছিল যে ওর কাছে কিছু না পেলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। তারপর এক সময় তোমাদের কাছ থেকে ওর জিনিষ উদ্ধার করা খুব শক্ত হবে না। চল, সবাইকে মোতি-মহলে তন্দুরি খাইয়ে আনি।"

তারপর দিন আমরা কালকা হয়ে শিমলা চলে গেলাম। আমিও বি. এ পাশ করে টিকটিকি হব। জম্বুও হবে।

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের গল্প

শ্রীসুচেতা মিত্র

আমাদের এই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল হাজার বছরের কিছু আগে। আর সেই ভাষার জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যও লিখতে শুরু হল। কী রকম ছিল সেই পুরোনো বাংলা? এ তো জানতে ইচ্ছে করবেই। তাই সেই সব গল্পই তোমাদের শোনাব।

হাজার বছর আগে প্রথমে যে বাংলা সাহিত্য লেখা হল তার নাম চর্যাপদ। কবিতায় লেখা এই বই-এ ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া বলে এক ধরণের ধর্মের কথা। একে তো পুরোনো বাংলা, তাতে আবার ধর্মের কথা! তাই চর্যাপদ তোমাদের মনে হয়তো খুব কৌতূহল জাগাবে না! তবে বড় হলে এসব পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। চর্যাপদের পরেই আর একখানি বই পাওয়া গেছে যার নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রাধা-কৃষ্ণের গান নিয়ে লেখা এই বই। এর কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। মজা কি জানো? এই বইটি ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে যখন উদ্ধার করা হল তখন পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলল চণ্ডীদাস নামে ক'জন কবি আছেন এই নিয়ে। এর আগে কীর্তনের বিখ্যাত কবি যে চণ্ডীদাসকে সবাই জানতেন তাঁর লেখার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের লেখার অনেক তফাৎ! এই নিয়ে যে তর্ক শুরু হল তা আজও মেটেনি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কিছু লেখা হয়নি। অন্তত তার কোনও প্রমাণ মেলেনি। অবশ্য তার কারণও আছে। বাংলা দেশের তখন ঘোর দুর্দিন গেছে। তুর্কীদের আক্রমণে আর অত্যাচারে সন্ত্রস্ত মানুষ কবিতা গল্প লেখার কথা ভাববে কি করে? প্রায় শ'খানেক বছর একটা অন্ধকার যুগ পেরিয়ে

তারপর শুরু হল সাহিত্যচর্চা। এই সময়কার নামকরা সাহিত্য হল মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য হল কয়েকজন দেবদেবীর মাহাত্ম্যের কথা। এই সব দেবতাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর—হলেন সব চেয়ে নামকরা। আর মঙ্গলকাব্যগুলোও প্রধানতঃ এদের তিনজনের নামেই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সব দেবতারা নিজেদের পুজো প্রচার করার জন্যে পৃথিবীতে নানা চেষ্টা করেছেন। যে ভক্ত, তাকে দুঃখের নিচুতলা থেকে রাজার আসনে বসিয়েছেন আর অধার্মিককে ধনেপ্রাণে শেষ করে ছেড়েছেন।

গল্পগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের গল্পই সব চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। কাণা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিরা নানা ভাবে মনসাদেবী আর চাঁদ সদাগরের গল্প শুনিয়েছেন। আমিও সেই গল্পই আজ শোনাব।

দেবী মনসা শিবের এক মেয়ে, মা চণ্ডী তাঁর সৎমা। সৎমার সঙ্গে মনসার নিত্য ঝগড়া। শেষে চণ্ডী এক খোঁচা দিয়ে সতীনের মেয়ের চোখ কানা করে দিলেন। মনের দুঃখে মনসা কি করেন, পৃথিবীতে যাতে একটু মান-সম্মান পাওয়া যায় তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু পৃথিবীতে তখন যে-সব নামকরা বড়মানুষ ছিল তারা মেয়ে-দেবতার পুজো করে না। তা ছাড়া মনসা সাপের দেবী। নীচু জাতের মানুষ তাকে পুজো করে। বড়ঘরের সবাই শিবের ভক্ত। এদের মধ্যে চন্দ্রধর বা চাঁদসদাগর তখন খুবই নামকরা লোক, ধনী ব্যবসায়ী। এই চাঁদ সদাগর খুব জেদী মানুষ। সে সারা জীবন মন দিয়ে শিবের পুজো করেছে। তার বড় সাংঘাতিক জেদ—

"যেই হাতে পূজি মুই দেব শূলপাণি।
সেই হস্তে না পূজিব চ্যাংমুড়ী কাণী।।"

অর্থাৎ কি না যে হাতে তিনি শিবপুজো করেন, সেই হাতে চ্যাংমাছের মতো মাথা আর কানা মনসাকে তিনি পুজো করবেন না। এদিকে

মনসারও জেদ। চাঁদ সদাগরের পুজো তাঁর চাই-ই। নইলে বড় সমাজে ঠাঁই হবে না। মনসা চাঁদকে নানাভাবে জব্দ করতে চাইলেন।

চাঁদ সদাগর না করলেও চাঁদের বউ সনকা লুকিয়ে লুকিয়ে মনসার ঘট পুজো করে। একদিন জালু-মালু নামে দুটি রাখাল ছেলেকে

মনসা চাঁদকে নানাভাবে জব্দ করতে চাইলেন

মনসার ঘট পুজো করতে দেখে সনকা জানতে চাইলেন এতে কি হয়? তারা বললে মনসা পুজোর অশেষ গুণের কথা। শুনে সনকা চুপি চুপি ঘট পুজো করেন। এক দিন দেখতে পেয়ে চাঁদ লাথি মেরে সেই ঘট ভেঙে ফেললেন। প্রচণ্ড রাগে মনসা চাঁদের ছয় ছেলেকে সাপের বিষ দিয়ে মারলেন। তাঁর সাত সাতটি বাণিজ্যতরী গহন সমুদ্রে দিলেন ডুবিয়ে। তবু তাঁর রাগ যায় না, তবু যায় না চাঁদের জেদ। সে একটা লোহার মানুষ। কিন্তু মনসা এত করেও চাঁদকে প্রাণে মারলেন না। কেন না, চাঁদ নইলে কে তাঁর পুজো করবে? বণিক্

সমাজে শিবের প্রতিপত্তি। সেইখানে মনসার আসন পাকা করতে হবে। তাই চাই চাঁদের হাতের পুজো। তাই সেই মাঝ-সমুদ্রে যাতে চাঁদ না ডোবে মনসা একটি কুটো ভাসিয়ে দিলেন। সেই ধরে উঠে এলেন চাঁদ সদাগর বহু কষ্ট করে। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলেন চাঁদ। লখীন্দর নামে একটি ছেলে হল তাঁর। সেই ছেলে বড় হলে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে—বেহুলার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন চাঁদ। বিয়ের দিন পাছে ছেলেকে সাপে কাটে, চাঁদ তৈরি করালেন এক লোহার বাসরঘর। দরজায় কড়া পাহাড়া বসালেন। কিন্তু মনসাও কায়দা করে সেই লোহার বাসর ঘরে একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটো দিয়ে কালসাপ ঘরে ঢুকে লখীন্দরকে কামড়াল। লখীন্দরের মৃত্যু হল। কপাল চাপড়ে চন্দ্রধর আক্ষেপ করতে লাগলেন, কিন্তু মনসার পুজো করলেন না। সে যুগে সাপে-কাটা মরা কলাগাছের ডোঙার ভেলায় জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। লখীন্দরকে যখন জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল তখন বেহুলাও সেই মরা স্বামী নিয়ে জলে ভাসল। যদি স্বামীকে বাঁচাতে পারে তবেই সে ঘরে ফিরবে।

দেখতে দেখতে বেহুলা ভেসে চলল। কাক, শকুন সেই মরা খেতে আসে। তাদের তাড়াতে তাড়াতে বেহুলা ভাসতে লাগল। পথে নেতা ধোপানীর সঙ্গে দেখা। দুজনে সই পাতিয়ে নিল। নেতা বেহুলাকে চিনিয়ে দিল স্বর্গে যাবার পথ।

অপূর্ব সুন্দরী বেহুলা যখন স্বর্গে এল, স্বর্গের দেবতারাও তাকে দেখে অবাক্। দেবরাজ বললেন, তুমি কি চাও? বেহুলা জানাল, আমি নাচতে জানি। যদি চান তবে আপনাদের নাচ দেখাতে পারি। দেবতারা খুশি হয়ে সেই নাচ দেখতে চাইলেন। তখন বেহুলা সুন্দরী সাজ সাজল। চোখে-মুখে আঁকল কাজল-কুমকুমের রেখা। পায়ে দিল ঘুঙুর। তারপর শুরু করল নাচ। তার নাচের তালে তালে, সুন্দর দেহের ঢেউতোলা ভঙ্গিতে স্বর্গপুরী কেঁপে উঠল অবাক-বিস্ময়ে! দেবতাদের মুখে কথা নেই। সবাই স্তব্ধ। তাঁদের চোখে পলক পড়ে

না। এমনি করে কেটে গেল সময়। বেহুলা শ্রান্ত হয়ে যখন থামল, সভায় ধন্য ধন্য রব উঠল।

খুশি হয়ে শিব বললেন, সুন্দরী, তুমি কি বর চাও বল ?

বেহুলা তার মরা স্বামীর জীবন চাইল। তার হাতের পুঁটুলিতে তখন লখীন্দরের হাড় ক'খানা বাঁধা ছিল। সেই হাড় ক'খানা সে বার করে দিল। দেখতে দেখতে মরা লখীন্দর বেঁচে উঠল। জয় জয়কার উঠল সতী বেহুলার।

শিব বললেন, সতী, তুমি দ্বিতীয় বর চাও।

বেহুলা চাইল তার ছয় ভাসুরের জীবন।

শিব বললেন, কল্যাণী, এবার তৃতীয় বর চাও।

বেহুলা তার শ্বশুরের বাণিজ্যতরী ফেরৎ চাইল।

সে সব পেল একে একে। কিন্তু দেবসভায় বসেছিলেন মনসা, তাঁর অনুমতি চাই। বেহুলা তাঁকে কথা দিল দেশে গিয়ে মনসার পূজো সে প্রচার করবেই। আর শ্বশুরকে দিয়ে পূজো করাবে। অন্ততঃ চাঁদের বাঁ-হাতের ফেলে-দেওয়া একটি ফুল চাই মনসার।

সতী বেহুলা সাত বাণিজ্যতরী, ছয় ভাসুর, স্বামী আর বহু লোক-লস্কর নিয়ে দেশে ফিরল। ঘাটে এসে সে লোক পাঠাল শ্বশুরের কাছে। আগে মনসার পূজো চাই। নইলে সে ঘরে যাবে না।

আলুথালু বেশে ছুটে এলেন মা সনকা। তাঁর হারানো মানিক বাছাদের দেখতে। দু-হাতে বুকে নিলেন পুত্রবধূকে, বললেন, মা, তুমি ঘরে চল। আমি মনসার পূজো দেব।

তবু নড়ে না বেহুলা। চাঁদ সদাগর নিজে হাতে পূজো না করলে নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে। মনসার কাছে তার শপথ আছে। তাকে তা রাখতেই হবে। সনকা কত আকুলি-বিকুলি করেন। যেমন অটল চাঁদ, তেমনি অটল বেহুলা। স্নেহের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন চাঁদ। তিনি এলেন নদীর ঘাটে। দেখলেন তাঁর সোনার সংসারের লক্ষ্মীকে। তখন বাঁ হাতে একটি ফুল তিনি ফেলে দিলেন

মনসার নামে। দেবীর ক্রোধ মিটল। এই দিন থেকে বণিক্-সমাজে মনসার পুজো শুরু হল। সতী বেহুলা সব নিয়ে ঘরে এল।

কতদিন আগেকার কাহিনী। আজও অমর হয়ে আছে মঙ্গলকাব্যে, লোকমুখে, গল্পে-গাথায়। আজও সতী বেহুলার কথা, তেজস্বী পুরুষ চাঁদ সদাগরের কথা আমরা ভুলতে পারি না।

মণ্টুবাবু

শ্রীবিভা সরকার

দুষ্টু ছেলে মণ্টুবাবু আস্ত অবতার,
চেত্তা জানেন, তেক্কা দেখেন ঘুড়ির মাষ্টার।
ভাল করেই আছে জানা লাটাই কেমন খাগ্‌গা টানে,
উড়িয়ে ঘুড়ি দিয়ে তুড়ি টেনকি মারা মণ্টু জানে।
মাঞ্জা সুতোর সাচ্চা কিনা পরখ করেন আঙ্গুল কেটে,
সারাটা দিন রোদে টো-টো ঘুড়ির নামের কুলজি ঘেঁটে।
চাঁদটি আঁকা চাঁদিখালে, চৌরঙ্গী কে ওড়ালে?
চাপরাসে আর কাতরাসেতে এরিয়ালে হারিয়ে দিলে।
লাটুয়ালের ডোরা কাটা, মোমবাত্তি আগুন-রাঙা।
ময়ূরপঙ্খী সবার রাজা, ঘুড়ির নেশায় ঘুমটি ভাঙ্গা।
নাওয়া-খাওয়া রইল মাথায়, প্যাঁচ লড়াইয়ে সময় গেল,
ভোকাট্টা লোট্ রে সুতো চিৎকারেতে কানটি খেল।
মণ্টুবাবুর দিনটি গেল লাটাই ঘুড়ির ঝাঁকটি নেড়ে,
চ্যালেঞ্জ করে ওড়ান ঘুড়ি দিন দুপুরে তুড়ি মেরে॥

বাদশাহী

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক গটমট করে 'বাদশাহী'তে ঢুকে পড়লেন। 'বাদশাহী'র নাম জান তো? বিস্তর নামডাক 'বাদশাহী'র। পোলাও-কালিয়া জাতীয় পয়লা নম্বর মোগলাই খানা যদি খেতে হয় তো সটান চলে যাও 'বাদশাহী'তে। জেনে রেখো, অমন মোগলাই খানা ভূ-ভারতে কোথাও মিলবে না। হ্যাঁ, দাম একটু বেশি বৈকি! জমজমাট মোগলাই খানা খেতে হলে বেশি দাম দিয়েই খেতে হবে। আর সস্তায় যদি সারতে চাও তো, খবরদার বলছি, 'বাদশাহী'র দিকে যেও না; কলকাতা ছেড়ে বৃন্দাবনের দিকে চলে যাও, সেখানে গিয়ে নোংরা ঘিঞ্জি দেখে যে-কোনো একটা নিরামিষ বৈষ্ণব হোটেলে ঢুকে পড়ো। সস্তায় হবে।

যা বলছিলাম। ভদ্রলোক তো গটমট করে 'বাদশাহী'তে ঢুকে পড়লেন। খুব গম্ভীর মুখে এদিক্-ওদিক্ তাকাতে লাগলেন। ভাবভঙ্গী এমন যেন বসবার মত জুৎসই জায়গা পাচ্ছেন না।

একেবারে কোণের দিকে একটা টেবিল ফাঁকা পড়ে আছে। হ্যাঁ, বেশ নিরিবিলি হবে। তা সেই টেবিলে গিয়ে বসে 'আঃ' করে মস্ত একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

জানো নিশ্চয়ই, বড় বড় হোটেল রেষ্টুরেণ্টে বয়দের এলাকা ভাগ করা থাকে। এই-এই টেবিলের খদ্দেরদের তাল সামলাবে অমুক বয়। আর তমুক বয়ের ভাগে রইল ওই-ওই টেবিলের খদ্দেরেরা। এই রকম আর কি!

'বাদশাহী'র কোণের দিকের এই টেবিলের ভার যে-বয়ের উপর, তার নাম আবদুল। বহুদিন থেকে আবদুল 'বাদশাহী'তে বহাল আছে। খদ্দেরদের সব হালচাল বলতে গেলে আবদুলের নখদর্পণে।

ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল আবদুল। এখন কী ফরমাস করেন দেখা যাক।

ঘাড় না তুলে ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে খাবারের ফর্দ পড়তে লাগলেন বিড় বিড় ক'রে। আবদুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ঘাড় তুলে আবদুলের দিকে তাকালেন। হাই তুললেন। ডজন খানেক তুড়ি দিলেন। তারপর বললেন—ওঃ, তুমি।

—জী হুজুর।

কিন্তু কে এই ভদ্রলোক? কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু না, ইনি 'বাদশাহী'র নিয়মিত খদ্দের ন'ন। নিয়মিত খদ্দেরদের আবদুল চেনে। তবে, কী আশ্চর্য, চেনা-চেনা লাগছে, অথচ কেমন যেন অচেনা!

একটু অস্বস্তি হ'ল আবদুলের। যাক্‌ গে, অত ভাবতে গেলে চলে না। খদ্দের এসেছে, খাবে, দাম চুকিয়ে চলে যাবে। আবদুলের অত মাথাব্যথা কিসের?

ভদ্রলোক বললেন,—যাক্‌ গে, আগে তো দু'টো ফ্রেঞ্চ কাটলেট আর তিনটে মটন চপ নিয়ে এস। তারপর না হয় ভেবেচিন্তে অর্ডার দেওয়া যাবে। যাও। কুইক।

চপ-কাটলেট আনতে চলে গেল আবদুল। কিন্তু ভাবনা গেল না। কে এই মহর্ষি? তিনটে মটন চপ্‌ আর দু'টো ফ্রেঞ্চ কাটলেটের হুকুম দিয়েও যে বলে, 'ভেবেচিন্তে অর্ডার দেওয়া যাবে যাও। কুইক।'?

তার মানে উনি আরো খাবেন, আরো অনেক খাবেন। নির্ঘাত বিদায়কালে আবদুলকে ভালো হাতে বক্‌শিস্‌ দিয়ে যাবেন। যারা এমন সাংঘাতিক চপ-কাটলেট ওড়ায় তারা বড় ভালো মানুষ, বয়-বেয়ারাদের তারা পকেট উজাড় করে বক্‌শিস্‌ দেয়। হুজুরের জয় হোক।

তিনটে মটন চপ আর দু'টো ফ্রেঞ্চ কাটলেট এনে ভদ্রলোকের সামনে রাখল আবদুল।

এবং, চোখের পলকে, সমস্ত মাল উড়ে গেল। আর খাওয়ার কায়দা কী। বলিহারি! বলিহারী! চামচ-টামচের ধার ধারলেন না। হাত দিয়ে চপ-কাটলেটের বড়-বড় টুকরো ভাঙলেন, তারপর কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে ফেললেন। মহাপুরুষ!

একফোঁটা জল খেলেন না। বললেন,—না হে, জলটল এখন খাব না। জল খেয়ে লাভ কি? ওতে খালি জায়গা নষ্ট; একটু চপ-কাটলেট মুখে দিলাম তো, এখন বেশ চনমনে খিদে হচ্ছে। তুমি এবার এক প্লেট ফ্রায়েড রাইস নিয়ে এস। আর এক প্লেট ফাউল কোর্মা। সঙ্গে এক প্লেট মটন আফগানি। যাও। কুইক।

তাড়াতাড়ি চলে এল আবদুল। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোকের যে রকম চনমনে খিদে, বলা যায় না, আবার দেরী হলে উনি হয়তো আস্ত আস্ত টেবিল-চেয়ার খেয়ে ফেলবেন।

খুব তাড়াতাড়ি করেও ভদ্রলোকের মন পাওয়া গেল না। বিরস মুখে ভদ্রলোক বললেন,—আবদুল, এত দেরি করলে তো আমার চলবে না। চনমনে খিদের সময় দেরি সহ্য হয়? তুমিই বলো।

খেতে আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক। গো-গ্রাস বললে কিছুই বলা হয় না। অনেক কাল 'বাদশাহী'তে আছে আবদুল, কিন্তু এ রকম খাইয়ে লোক কি কখনো দেখেছে? কে জানে!

খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন,—খেয়েদেয়ে অর্ডার দিলে তুমি আবার কতক্ষণে ফিরে আসবে ঠিক কি? তার চেয়ে এক কাজ করো। আমি খেতে থাকি, তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

—কী আনব হুজুর?

—মাংসের যত রকম প্রিপারেশন আছে সবই এক-এক প্লেট করে নিয়ে এস। মটন-ফাউল দু'-রকমই আনো, কোনো আইটেমই বাদ দিও না হে।

ওরে বাবা, কী রাক্ষুসে খিদে! তা থাকে, এক-একজন এ রকম ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকে। খোদাতালা দুনিয়ায় হরেক রকম আজব জীব পাঠিয়েছেন। খোদা হাফিজ।

আবদুল হুজুরের হুকুম তামিল করার জন্য কেবল পা বাড়িয়েছে, হুজুর আবার ডাকলেন,—আরে শোনো শোনো, সব কথা না শুনেই যাচ্ছ কোথায়? খালি মাংস আনলেই চলবে? শুধু শুধু মাংস কি কেউ খেতে পারে? গলা খুসখুস করবে না? সঙ্গে রুটি-পরোটাও তো চাই। তা বলে যেন রুটি-পরোটার পাহাড় নিয়ে এসো না। দিস্তে খানেক রুটি আর ডজন খানেক পরোটা. বাস্, একবেলার পক্ষে সাফিশিয়েন্ট। যাও। কুইক।

আবদুল একের পর আর এক প্লেট ভর্তি করে নিয়ে আসতে লাগল, হুজুর ঝড়ের মতো হাত-মুখ চালাতে লাগলেন। কথা নেই, বার্তা নেই, হুসহুস করে শুধু খেয়ে যাচ্ছেন।

কে? চেনা-চেনা লাগছে, অথচ কেমন যেন অচেনা!

না, চেনা-না-চেনার কী আছে? অত ভাবতে গেলে চলে না। খাবে-দাবে, তারপর দাম চুকিয়ে চলে যাবে, বাস্! দরাজ হাতে যদি ব্‌কশিস্ দেয়, ভালো কথা, আবদুল সেলাম দেবে; নইলে, হুঁ-হুঁ বাছাধন, আবদুলের সেলাম তুমি পাচ্ছ না।

কিন্তু বক্‌শিস্ নির্ঘাত দেবে। এমন করে যে খেতে পারে বক্‌শিস্ কি তার হাত থেকে না বেরিয়ে পারে? দেখে নিও, বক্‌শিস্ মিলবে।

খাওয়া শেষ করে ভদ্রলোক ছোট্ট একটু ঢেঁকুর তুললেন। বললেন,—আবদুল, বার বার আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? চেনা-চেনা লাগছে বুঝি?

খুট খুট করে হাসলেন। বললেন,—যাও, চট করে এক পট্ গরম চা নিয়ে এস। গোলমাল আরম্ভ হবার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এল আবদুল। গোলমাল? কিসের গোলমাল?

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, আবদুল হাতজোড় করে বলল,—হুজুর, গোলমালের ভয় করবেন না। 'বাদশাহী'তে গোলমাল হয় না। এখানে, হুজুর, আপনার মতো রাজা-উজীরেরা খেতে আসেন। গোলমাল হবে 'বাদশাহী'তে? কী যে বলেন!

হুজুর আর একপ্রস্থ হাসলেন। বললেন,—দাঁড়াও, চা-টুকু আগে শেষ করি। গোলমাল আরম্ভ হ'ল বলে।

চা শেষ করলেন একটানে। বললেন,—আমাকে চিনতে পারলে না? ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে কোটপ্যান্ট পরেছি বলে তুমি আমাকে ভুলে গেলে আবদুল?

নিজের পাগড়ি খুলে হাওয়া খেতে খেতে আবদুল বলল—হুজুর! হু—জু—!!

হ্যাঁ। তিন মাস জেল খেটে এলাম। তা জেলের খাওয়াদাওয়া ভালো নয়, রান্নাবান্না খুব খারাপ। 'বাদশাহী'র সঙ্গে জেলের কোনো তুলনাই হয় না, এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। কী, এখনো চিনতে পারলে না?

চিনেছি। আর বলতে হবে না। তিন মাস আগে আপনিই তো এখানে এসে গাদা-গাদা গিললেন, তারপর বললেন, পয়সা নেই। তা আমি আপনাকে হাতের সুখে ঘুষি মেরেছি, গলাধাক্কা দিয়েছি, ম্যানেজার সাহেব শেষ পর্যন্ত আপনাকে পুলিশের হাতে দিয়েছেন। আপনি—

হুজুর সহাস্যে বললেন,—আমি তারপর তিন মাস জেল খেটেছি। জেলে বসে জঘন্য খানা খেয়েছি তিন মাস। ছাড়া পেয়ে আজ একটু প্রাণ ভরে খানাপিনা করলাম। পয়সা-টয়সা দিতে পারব না বাপু। তা বলে মারধোর ক'রো না। ভরা পেটে, সত্যি বলছি, ও-সব ভালো লাগে না। আর মারধোর করলে তোমারও তো হাত-টাত ব্যথা হয়ে যাবে। অত ঝামেলায় কাজ কি রে দাদা? ম্যানেজার সাহেবকে ডাকো, আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিক, তাড়াতাড়ি থানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে হে।

তালপাতার সেপাই

শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্ত্তী

সেপাই ত' দেখেছ তোমরা কতই। এখনকার সেপাই নয়,—আগেকার ঢাল-তলোয়ার যুগের সেপাইয়ের কথা বলছি। তাদের ছিল ইয়া গোঁফ, লম্বা জুলফি, হাতে ঢাল-তলোয়ার, মাথায় পাগড়ী। কিন্তু তালপাতার সেপাই দেখেছ কখনও? সুকুমার রায়ের নিধিরাম সর্দারের ছবি অথবা ডনকুইকজোটের ছবি যারা দেখেছ তারা তালপাতার সেপাই কেমন তার একটা আঁচ করতে পারবে। লম্বা, পাতলা এদের চেহারা কিন্তু আস্ফালন খুব।

তালপাতার সেপাইকে দেখে তোমরা হয়ত বলবে

এক হাতে তলোয়ার আর হাতে ঢাল,
ফুঁ দিলে উড়ে যাবে এমনি তো হাল!

অথচ আস্ফালনে এই সেপাইরা কম যায় না কারও চেয়ে। এরা কখনও ঘোরায় তলোয়ার, কখনও দেখায় ঢালের কসরৎ, আবার কখনও ঢাল তলোয়ারের খেলা একসঙ্গে।

তোমরা এই রকম একটা খেলনা তালপাতার সেপাই নিজেরাও কিন্তু খুব সহজেই তৈরি করতে পার।

কি কি লাগবে?—বিশেষ কিছুই নয়। কিনতে হবে না কোন কিছুই। তবে তালপাতার সেপাই যখন, তখন কিছু তালপাতা ত' চাই-ই। না, কাঁচা পাতা হ'লে ভালো হবে না। শুক্‌নো পাতা চাই। আর চাই ছুঁচ-সুতো আর একটা বাঁশের কাঠি। ব্যস্, তার পরেই তুমি সেপাইকে তৈরি করতে লেগে যাও।

কাঁচি দিয়ে তালপাতা কেটে সেপাইয়ের তলোয়ার সহ ডান-হাত, ঢাল সহ বাঁ হাত, মাথা, বুক, পা তৈরি করে নাও।

খেলনাটির প্রত্যেক অংশের পরিমাপ এই রকম হবে :

মাথা থেকে কোমর—৬ ইঞ্চি

বুক থেকে কোমর (ডবল পাতা) ৩½ ইঞ্চি

বাঁশের কাঠি মোট লম্বা— ১৩½ ,,

তার মধ্যে কাঠির পাতার ভিতরকার অংশ ৩½ ,,

কোমর থেকে কাঠির শেষ — ১০ ,,

বাহুর ডবল অংশ — ৩ ,,

তলোয়ার সহ হাত — ৬½ ,,

গোলাকার ঢাল সহ হাত — ½ ,,

উরু থেকে হাঁটু (ডবল) —

হাঁটু থেকে পা — — ৩½ ,,
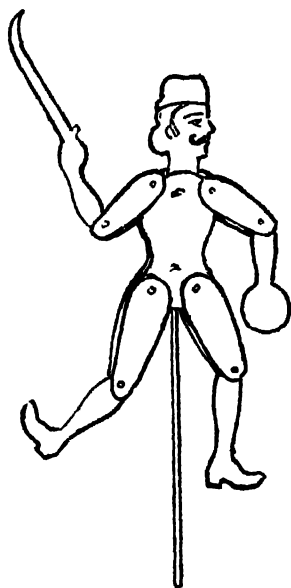
তালপাতার সেপাই

ছবিতে দেখতে পাচ্ছ—সেপাইয়ের দু' হাতের কনুই পর্যন্ত, উরু দুটি এবং বুক পেটে রয়েছে ডবল পাতা। এই ডবল পাতার সঙ্গে হাত পায়ের শেষের দিকের একক পাতা রয়েছে সুতো দিয়ে

সেলাই করা। কাঠিটার সঙ্গে বুক-পেটও সেলাই করা আছে।

সেলাই করা কিছু কঠিন নয়। আগে সুতোটায় একটা গিঁট দিয়ে নাও। তারপর সূচটা ফুঁড়িয়ে টেনে নিয়ে অপর দিকেও তেমনি একটা গিঁট দিয়ে সুতোটা কেটে নাও। বুকের দিক্‌টা কেবল কাঠির সঙ্গে ঘুরিয়ে সেলাই করতে হবে।

চোখ-মুখ কিন্তু পাতার দুদিকেই আঁকা থাকবে।

সেপাইকে তৈরি করার পর কাঠির হাতলটা ধরে নাড়া দাও বা ঘোরাও। দেখবে, সেপাই ঢাল তলোয়ারের কত রকম কসরৎ দেখাবে। তাকে জীবন্ত বলে মনে হবে তখন!

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইএর অনেক দিন পরে দেখা। বিদ্যাসাগরের পায়ে চটি, তার ডগাটা উঁচু দিকে উঠে গেছে। দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, "আপনার চটির মুখ উর্দ্ধপানে ছুটেছে, দু'দিন বাদে গিয়ে আকাশে ঠেকবে।"

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, "হ্যাঁ চট্টোপাধ্যায় পুরোনো হলেই বঙ্কিম হয়ে যায়।"

সেই বাঘটা

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

রাত্রে কাউকে সে পথে যাবার কথা বললে ভয়ে কেঁপে উঠবেই সে। দিনের বেলাতেই রীতিমতো সাহসী ছাড়া কেউ সে পথে যায় না, যদি একান্তই যাবার দরকার হয় তবে দল বেঁধে যায়। উঁচু গলায় এমনি ভাবে গল্প করতে করতে যায় যাতে ভয়টা আর ধারে-কাছে আসতে না পারে।

অমনি ভাবে না গিয়ে উপায় কি? যে বাঘটাকে ওখানে দেখা যায় মাঝে মাঝে, সে বাঘটা এদিকের জঙ্গলের সব চাইতে বড়ো বাঘ। যারা একবার তাকে দেখেছে, তারা অবশ্য আরেকটু বাড়িয়ে বলে। বলে, এই বাঘটার চাইতে বড়ো বাঘ আর কোথাও নেই। যেমন লম্বা তার চেহারা, তেমনি লম্বা তার ল্যাজ। হাঁ করলে পুরো একটা মানুষই নাকি চলে যাবে তার পেটের ভেতর।

কথাটা বাড়িয়ে বললেও কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বাঘটাকে মারবার জন্য বার কয়েক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মারতে পারে নি কেউ। বাঘটা নাকি খুব চালাক। জঙ্গলের ধারে-কাছে শিকারী পৌঁছুলেই সে উধাও। দু'চারদিনের মধ্যে আর কেউ তার দেখা পায় না। যেন বাতাসে উবে যায়। শেষ পর্যন্ত বন্দুক কাঁধে ক'রেই ফিরে যেতে হয় শিকারীকে। আবার সেখানে রাজত্ব চলে সেই বাঘের।

জঙ্গলের কাছাকাছি যারা থাকে, তারা বলে, বাঘটা যাদুর খেলা জানে। তাই উধাও হয়ে যেতে পারে। দু'-চারদিন অমনি ভাবে উধাও হয়ে থাকবার পর ফিরে আসে।

কথাটা সত্যি বলে বিশ্বাস না করে আর উপায় কি?

সেদিন অল্প-অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে

পথ চলে গেছে, জ্যোৎস্না আর বড়ো গাছের জাফ্রি কাটা ছায়ায় আরো যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সে পথ।

বাঘটা বসেছিলো সেই পথের ধারেই। সামনে বাড়ানো ছিলো তার থাবা দুটো। পথের ওপর মাঝে মাঝেই ল্যাজটা নড়ছিলো। যেন কালো ডোরাকাটা হলদে রঙের একটা সাপ নড়ছে। তার কালো ডোরাকাটা বিশাল হলদে রঙের শরীরের ওপর সেই জাফ্রি কাটা জ্যোৎস্না অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সত্যি সত্যি সে বনের রাজা।

বসে বসে পথের দিকে তাকিয়েছিলো বাঘটা। মাঝে মাঝে থাবা চাটছিলো। লাল টুকটুকে জিভটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো তখন। ঝকঝক ক'রে উঠছিলো দাঁতগুলো। রীতিমতো ভয়-পাওয়ানো সেই জিভ আর দাঁতগুলো।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ কাছেই শোনা গেলো একটা সাইকেল আছড়ে পড়বার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন ছিটকেও পড়লো পথের ওপর। সত্যিই একজন সাইকেল থেকে পথের ওপর ছিট্‌কে পড়েছে।

কান দুটো খাড়া হয়ে উঠলো বাঘটার। টান টান হয়ে উঠলো শরীরটা। ল্যাজটা নড়তে থাকলো আরো বেশী ক'রে। তীক্ষ্ণ চোখে সে সেই শব্দের দিকে তাকালো।

মাইল কয়েক দূরে জঙ্গলের মধ্যে যে পথটা তৈরী হচ্ছে সেই পথটা দেখতে গিয়েছিলেন সুধাংশু বাবু। তিনিই কাজটা নিয়েছেন। দিন পনেরো হলো তাঁর লোকেরা শুরু করেছে কাজ। প্রথম দুদিন এসে কাজ দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে গেছেন সুধাংশু বাবু। আজ সাইকেলের গোলমালে খানিকটা দেরী হয়েছে। দেরী হয়েছে বলেই খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ এখানে পথের ওপর পড়ে থাকা একটা পাথর সামনের চাকায় পড়ে যাওয়ায় সাইকেল শুদ্ধ ছিট্‌কে পড়েছেন তিনি। গাছের ছায়ায় পাথরটাকে দেখতে পান নি সুধাংশু বাবু। তাহলে এমনি ভাবে ছিট্‌কে পড়তেন না।

ছিট্‌কে পড়তেই কিন্তু সুধাংশু বাবু বুঝতে পারলেন, বাঁ পায়ে তাঁর দারুণ আঘাত লেগেছে। কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারবেন না কারো সাহায্যে ছাড়া। কিন্তু এখন এখানে কে তাঁকে সাহায্য করবে? যা ভয়ের জায়গা। বাঘটার কথাও মনে পড়লো। কথাটা ভেবেই কোনরকমে একা একাই উঠতে চেষ্টা করলেন সুধাংশু বাবু। পারলেন না।

কিন্তু কপাল থেকে গরম কি গড়িয়ে নামছে? জ্বালাও করছে জায়গাটা।

চম্‌কে উঠে সুধাংশু বাবু হাত দিলেন কপালের ওপর। সে হাত জ্যোৎস্নার আলোয় চোখের সামনে এনে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। ভীষণ ভাবে রক্ত পড়ছে যে! অনেকটা কেটে গেছে তাহলে। না হলে এতো রক্ত আসবে কি ক'রে?

অসহায় ভাবে বনের চারদিকে তাকালেন। ঝলমলে জ্যোৎস্নায় শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত বনটা! ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। তাতেই যেন বেশী করে নির্জন মনে হচ্ছে। ইস্, কেন যে সাইকেলটা খারাপ হয়েছিল। প্রায় কান্নাই পেলো সুধাংশু বাবুর।

ঠিক এই সময়েই তাঁর আরেকবার মনে পড়লো বাঘটার কথা। এখানেই তো তার চলাফেরা। এখন যদি হঠাৎ এসে পড়ে এখানে তাহলে—

প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন সুধাংশু বাবু। পারলেন না। ঘামে তাঁর সমস্ত শরীর ভিজে গেলো। মাথার ফেটে-যাওয়া জায়গাটাতেও এবার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। রক্ত তো পড়ছেই। সারারাত এমনি ভাবে রক্ত পডলে শরীরে আর রক্ত থাকবে?

সুধাংশু বাবুর বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে প্রবল ভয়ে সুধাংশু বাবু দেখলেন, তাঁর ঠিক মাথার সামনে দুটো ঝক্‌ঝকে চোখ জ্যোৎস্নায় জ্বলছে। চোখের যে মালিক সে আর কেউ নয়—সেই বিরাট বাঘটা।

সঙ্গে সঙ্গে আপনিই যেন সুধাংশু বাবুর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে।

বাড়ি-ঘরের কথা মনে হল সুধাংশু বাবুর। আর বাড়ীতে ফেরা হবে না কোনদিন। এখুনিই তো চলে যাচ্ছেন বাঘের পেটে।

চীৎকার করে সুধাংশু বাবু কেঁদে উঠলেন একবার। কিন্তু গলার স্বর ফুটলো না। ভীষণ ভাবে শরীরটা কাঁপতে থাকল কেবল। বাঘের মুখখানা ক্রমশঃ মুখের ওপর নেমে এল। চোখ বুঁজেও সুধাংশু বাবু তা বুঝতে পারলেন।

কপালের ফাটা জায়গাটা খরখরে জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল বাঘটা। তার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে চোখে-মুখে। সুধাংশু বাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

এর পরে আর কেউ জ্ঞান না হারিয়ে পারে? সুধাংশু বাবুও পারলেন না।

একসপ্তাহ পরে সুধাংশু বাবু যখন চোখ মেললেন তখন অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি।

বাঘটা তাহলে খেয়ে ফেলে নি তাঁকে?

কিন্তু খেলো না কেন? মুখের কাছে এমন একটা তরতাজা মানুষ পেয়েও—

সব ঘটনা যখন শুনলেন, আরো অবাক্ হলেন সুধাংশু বাবু। নিখিলেশ বাবু অনেক রাতে তাঁর জীপে ক'রে ফিরছিলেন সেই পথ দিয়ে। যেখানে সুধাংশু বাবু পড়ে ছিলেন তার কাছে এসে গাড়ীর আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন সুধাংশু বাবুকে। থাবার মধ্যে তাঁর মাথাটা নিয়ে বাঘটা বসে কপালটা চাটছিলো। সাইকেলটা দেখেই নিখিলেশ বাবু বুঝে ফেলেছিলেন, লোকটি সুধাংশু বাবু ছাড়া আর কেউ নয়।

নিখিলেশ বাবু কি করবেন ভাববার আগেই হঠাৎ বাঘটা

উঠে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির আলোর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়ে আরেকবার সুধাংশু বাবুর কপালটা চেটে দিয়ে জীপটার দিকে তাকিয়েছিল একবার। তারপর খুব আস্তে আস্তে বিরাট শরীরটা দুলিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্যে নেমে চলে গিয়েছিল।

আর দেরী করতে পারেন নিখিলেশ বাবু? জীপ থেকে নেমে এক ছুটে এসে তুলে নিয়েছিলেন সুধাংশু বাবুকে। কোন রকমে গাড়ির মধ্যে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে অসম্ভব জোরে গাড়ি চালিয়ে এসে থেমেছিলেন সুধাংশু বাবুর বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শুধু সুধাংশু বাবুদের বাড়ি নয়, গোটা শহরটাই যেন জেগে উঠলো।

না জেগে পারে? এমন অদ্ভুত ঘটনা যে কেউ শোনেও নি কোনদিন!

সেরে উঠে এসব ঘটনা শুনেও সুধাংশু বাবু আর কোন কথা বলতে পারেন না। কি-ই-বা বলবেন?

সবাই বলল, ভাগ্য ভালো, নিখিলেশ বাবু এসে পড়েছিলেন ঠিক সময় মতো। না হলে বাঘটা খেয়েই ফেলত আপনাকে।

সে সব কথারও উত্তর দেন নি সুধাংশু বাবু।

কারণ মনে মনে তিনি তো জানেন, বাঘটা তাঁকে খেতে চায় নি। তাহলে নিখিলেশ বাবু আসবার আগেই শুরু করতো খাওয়া। বাঘটা বোধ হয় ভালো বলেই ফেটে-যাওয়া জায়গাটুকু চেটে চেটে রক্ত বন্ধ করে দিয়েছে। না হলে যতক্ষণে নিখিলেশ বাবু এসেছেন, ততক্ষণে শরীরের প্রায় সব রক্ত শেষ হয়ে যেত।

এসব কথা যে কেউ বিশ্বাস করবে না তা জানেন সুধাংশু বাবু। বাঘ তো বাঘই; সে মানুষ পেলেই খাবে—এই কথাটাই তো সবার কাছে সত্যি।

সুধাংশু বাবু তারপর বহুদিন সেই পথে গেছেন, কিন্তু বাঘটাকে আর কোনদিন দেখতে পান নি। বাঘটাকে একবার দেখতে এখনও কিন্তু খুব ইচ্ছে ক'রে সুধাংশু বাবুর।

ছবির ম্যাজিক

শৈল চক্রবর্তী
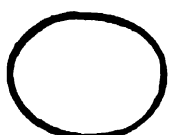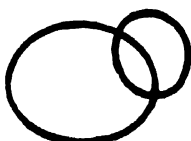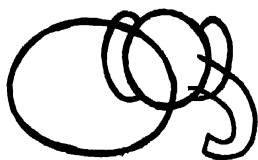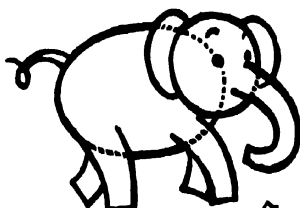
ভৌতিক

শ্রীঅলোক চট্টোপাধ্যায়

শিবুমামা ঘরে ঢুকতেই শ্রাবণী, রুম্পা, বান্টু আর কুমকুম তাকে ছেঁকে ধরল—শিবুমামা, একটা গল্প।

শিবুমামা বাটারফ্লাই গোঁফটাকে একটু নাচিয়ে বললেন, গল্প? কিসের?

রুম্পা চট্ করে বলল—ভূতের গল্প।

শ্রাবণী বলল—না না, অ্যাডভেঞ্চার।

আর শিবুমামা গম্ভীর চালে বললেন—আচ্ছা, দুটোই একসঙ্গে। ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার।

চার ভাইবোন শিবুমামার সামনে ঘন হয়ে বসে পড়ল। শিবুমামা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—হুঁ! তার পরে কিছুক্ষণ চুপ চাপ। অর্থাৎ সাসপেন্স দিয়ে শ্রোতাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তোলা। গল্প বলার শুরুতেই এমনি ধারা সাস্পেন্স হামেশাই দিয়ে থাকেন শিবুমামা।

—আমি তখন নেতারহাটে। শিবুমামা যেই বলতে শুরু করেছেন অমনি কুমকুম ফিক্ফিক্ করে হেসে ফেলল। শিবুমামা ধমকে উঠলেন—অ্যাই, হাসছিস কেন?

হাসিটা নেহাৎ অকারণে নয়। সবাইকারই হাসি পাচ্ছিল। কুমকুম সবচেয়ে ছেলেমানুষ তাই সামলাতে পারে নি, সামনেই হেসে ফেলেছে। আসলে গম্ভীর ভাবে কোন কথা বলতে গেলেই শিবুমামার বাটারফ্লাই গোঁফ ঢেঁ-কুচ-কুচের মত এধারে ওধারে দুলতে থাকে। কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। তাই রুম্পা একটা ঢোঁক গিলে বলল—ইয়ে, মানে জায়গাটা কি অদ্ভুত, নেতারহাট।

—অ। শিবুমামা বলতে শুরু করলেন আবার। জায়গাও

অদ্ভুত। রাঁচি থেকে বেশ কিছু দূরে সাড়ে তিন হাজার ফুট ওপরে। ভারী সুন্দর জায়গা।

—আমি গিয়েছিলাম মার্চ মাসের গোড়ায় দিকে। তখন ওখানে দেশী-বিদেশী টুরিষ্টের ভীষণ ভীড়। কোথাও এক ফোঁটা জায়গা খালি নেই। কি করি? কোথায় থাকি? ওদিকে ওখানে তখন ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষটা সাঁওতালী মজুর বললো যে একটা পোড়ো বাংলোপানা বাড়ী আছে বটে। কিন্তু সেটা একেবারে খালি নয়। মানে সেখানে ভূতের বাস—

শিবুমামা একবার গলা খাঁকারী দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রুম্পা আর শ্রাবণীর ভয়ানক কাসি পেল। কুমকুম কিন্তু মাথা নিচু করে ফ্রকের ফুলটা দেখতে লাগল। কারণ? বাটারফ্লাই আবার নেচে উঠেছে. গলা খাঁকারীর সঙ্গে সঙ্গে।

আর বাণ্টুটা সামনাসামনিই হাসল। — বলো কি শিবুমামা! বাড়ীর মধ্যে ভূতের—বাণ্টু হেসে গড়িয়ে পড়ল। রুম্পারও প্রায় সেই অবস্থা।

শিবুমামা একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সবাইকার দিকে তাকালেন। বোধ হয় জরীপ করে নিলেন ঐ তুচ্ছ কথাটা ছাড়া ওদের আর কোন হাসার কারণ আছে কিনা। তারপর আবার শুরু করলেন—হুঁ। আমি বললাম, কুছ পরোয়া নেই; আই ডোণ্টকেয়ার ভূতপেত্নী। আমি ঐ বাংলোতেই থাকব।

সাঁওতালটা আর কি করে, আমায় দূর থেকে বাংলোটা দেখিয়ে দিয়েই ছুটে পালিয়ে গেল। দেখি একেবারে লজ্‌ঝড়ে কণ্ডিশন। একতলা। জানালা-ফানালার কপাট ভাঙা, ধুলো ভর্ত্তি, তারই মধ্যে একটা ঘরে একটা চৌকি। সেটাকেই পরিষ্কার করে বিছানা পেতে ফেললাম। তারপর সঙ্গে আনা খাবার দাবার খেয়ে নিয়ে সটান শুয়ে পড়েই ঘুম।

চুপ করে গেলেন শিবুমামা। মানে সাস্‌পেন্স দিলেন আর কি! শেষটা শ্রাবণী বলল —তারপর?

—তারপর ? মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল হাড় কন্‌কনে শীতে। দু-দুটো পাহাড়ী কম্বল গায়ে জড়িয়েও শীত বাগ মানছে না। ঠাণ্ডা যেন গায়ে বিঁধছে। এমন সময়ে দরজায় শব্দ হল—ঠক্-ঠ ঠক্।

—অ্যাঁ! রুম্পা শিবুমামার কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল তুমি খুললে দরজা ?

বাংলোটা দেখিয়ে দিয়ে...

—পাগল। অমায়িক হাসি ফোটালেন শিবুমামা। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। তখন আমি কম্বল সরিয়ে চৌকি থেকে নেমে দরজা খুলব! ইয়ার্কী ? দরজায় সমানে টোকা পড়তে লাগল। শেষকালে আগন্তুক নাজেহাল হয়ে বলল—এই ভরদ্বাজ, কি হচ্ছে ? দরজাটা খোল না।

—আমি কোনক্রমে কম্বলের ভেতর থেকে জানালাম আমি ভরদ্বাজ নাই, এবং দরজা খুলতেও অপারগ। বাইরের লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ঢের রসিকতা হয়েছে, এবার দরজাটা খোল দিকিনি। তা নইলে আমি কিন্তু জানালা দিয়েই ঢুকে পড়ব—আগেই বলে রাখছি।

—তাই ঢোক। ক্ষীণ কণ্ঠে আমি বললাম। তার পরে জানালার দিকে চেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করলাম, লোকটার আব্দার দেখে। গরাদে লাগানো জানালা দিয়ে ঢুকতে চায়! এমন সময়ে হঠাৎ দেখি জানালার সামনে একটা বদ্খৎ চেহারার কালোপানা কি যেন এসে দাঁড়াল। আর আধ সেকেণ্ড বাদেই সেটা কি ভাবে, কে জানে, হুট্ করে গরাদের ফাঁক দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখে আমি সেই ঠাণ্ডার ভেতরেও ঘামতে শুরু করলাম।

—বলো কি শিবুমামা! রুম্পার বিস্ময় উথ্‌লে উঠল।

শিবুমামা বলতে লাগলেন—বুঝলাম সেটা একটা ভূত। সে ব্যাটা তো আমাকে দেখে রেগেই আগুন। বললে—কেন আমার ঘরে ঢুকেছো? মাশুল দিতে হবে।

আমি আমতা আমতা করে যেই বলেছি এটা যে আপনার ঘর তা কি ভাবে বুঝব?

অমনি সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলে উঠল—কেন? না বোঝার কি আছে? আমি তো দেয়ালে টিপসই দিয়ে রেখেছি।

এই বলে সে আমাকে এই মারে তো সেই মারে। তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে যত বলি আজকাল টিপ-সইতে কিছু হয় না, সে তত চটে যায়। শেষকালে আমি বললাম—আচ্ছা, আপনার নামটা কি?

ভূত গম্ভীরভাবে জানাল, ত্রিভঙ্গভূষণ চক্রপাণি।

আমি বললাম—আচ্ছা, ত্রিভঙ্গ বাবু, আপনি নেমপ্লেট বাইরে ঝুলিয়ে রাখেন না কেন? তাহলেই- তো—

ভূতটা সবটা না শুনেই ঘ্যান ঘ্যান করে বলে উঠল—সে

হবেখ'ন। আপাততঃ তুমি বিদেয় হও তো! নইলে রেগেমেগে কিন্তু কাম্‌ড়ে দেবো বলে দিচ্ছি। রাগলে আমার আবার জ্ঞান থাকে না।

—সর্বনাশ! কুম্‌কুম্ বলে উঠল।

শিবুমামা বললেন—তা ছাড়া আর কি? ঐ শীতে ঘরের বাইরে বেরোলে সর্বনাশ ছাড়া আর কি হতে পারতো? এদিকে ভূতটা আমার একটা হাত টিপে-টিপে দেখল, তারপর নাকের কাছে নিয়ে শুঁকেটুকে বলল—ম্যাগো, কেমন আঁশটে-পানা গন্ধ! অন্ততঃ দু-রাত্তির তেঁতুল-জলে ভিজিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে হবে। আমি দেখলাম মহাসমস্যা। অনেক করে বোঝালাম একসঙ্গে থাকো বাপু, ঝগড়া করে কাজ কি? সে ব্যাটা তবু গজ্‌গজ্ করে চলল না বাবু, তুমি বাইরে চলে যাও, না হলে আমার ঘুম হবে না। মানুষদের আবার শুনেছি ঘুমোলে ভয়ানক নাক ডাকে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারলাম না যে আমার নাক আদৌ ডাকে না, বেশ শান্ত ভাবে সাইলেণ্টলী ঘুমাই—রুম্‌পা ওদিকে কি বলছিস?

রুম্‌পা বাণ্টুর কানে কানে বলছিল—বেবাক গুল দিচ্ছে। ঘুমোলে শিবুমামার নাক এত জোরে ডাকে যে মশারি খাটাতে হয় না, শব্দ শুনলেই মশারা পিঠটান দেয়। শিবুমামার কথা শুনে থতমত খেয়ে বলল—না, মানে বলছিলাম যে কি সীরিয়াস অবস্থা!

—হ্যাঁ। শিবুমামা সন্তুষ্ট হলেন। ওদিকে ভূত তো কিছুতেই ছাড়বে না। দু'বার ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। একবার স্কন্ধকাটা আর একবার কঙ্কাল সেজে। আমার একটু দাঁত-কপাটি লেগেছিল অবশ্য। তাড়াতাড়ি কম্বলটা টেনে মুখ ঢেকে ফেলতেই সে কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে বলল—এবারে কিন্তু আমি আমার নরমুণ্ড-নৃত্যটা দেখাতে বাধ্য হব। জানো, সেটা দেখে একবার এক সাহেব ভয় পেয়ে একটা আস্ত চামচ গিলে ফেলেছিল।

আমি তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তারপর ঘরের মধ্যে দুমদাম, ক'টা ঝনন্ ঝপ্পর্-ঝাঁই ইত্যাদি ধরণের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ভূত সেই নরমুণ্ড-নৃত্যটা করছে। আধ-মিনিট বাদে সব চুপচাপ হয়ে গেল। ভূতটা তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—এখনও না গেলে কিন্তু গায়ে ঠাণ্ডাজল ঢেলে দেবো।

এই শুনেই আমায় উঠতে হল। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে গায়ে জল ঢাললে আর রক্ষে ছিল না। আমাকে উঠতে দেখে এতক্ষণে ভূতটার মুখে হাসি ফুটল। এদিকে তো বাছাধন জানে না যে আমি মনে মনে তাকে তাড়াবার একটা প্ল্যান এঁটে ফেলেছি।

—ও, তাহলে তুমি ততক্ষণ মনে মনে প্ল্যান করছিলে? বান্টু বলল।

শিবুমামা মুচকি হাসির সঙ্গে বাটারফ্লাই নাচিয়ে বলল—তা হলে তোরা কি ভাবছিলিস্ আমি চুপচাপ চলে আসবো? হুঁ-হুঁ বাবা, এ শম্মা পোড়খাওয়া লোক। যাই হোক, আমি তো উঠে ভূতটাকে বললাম—ধন্যবাদ ত্রিভঙ্গ বাবু, আপনি আমায় এই সুন্দর ঘরে থাকতে দিয়ে বড়ই বাধিত করেছেন।

ভূতটা রেগে-মেগে বলল—তুমি বেরিয়ে গেলে আমি আরও বাধিত হব।

আমি তবু বলে চললাম—আপনার এ উপকার আমি এ জীবনে ভুলব না। বেরিয়ে আমি যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা—

ভূত বলল—আবার কি কথা?

—আমি বললাম—আমার একটা অনুরোধ রাখলেই আমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাব।

ভূত অধৈর্য হয়ে বলল—ঠিক আছে, বলে ফেল। আমার ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

—যদি অনুগ্রহ করে,— আমি পকেট হাতড়ে ডায়রী আর পেনটা বার করলাম;—যদি অনুগ্রহ করে—; পেনটা খুলে নিলাম—

মিষ্টার ত্রিভঙ্গভূষণ চক্রপাণি, যদি অনুগ্রহ করে আপনার একটা অটোগ্রাফ দেন—তাহলে এক্ষুণি—

বুঝতেই পারছিস একটা অশিক্ষিত ভূত, তার ওপরে একটা অমন যুক্তাক্ষর-কণ্টকিত নাম। ভূতটার আবার সম্মানবোধও টন্‌টনে, সরাসরি 'না' বলতে পারল না। সে বার-দু'য়েক কাসল। মাথাটা চুলকাল। তারপর ভোঁ-দৌড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

আর আমিও বাকি রাতটা ওখানেই দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পরদিনই নেতারহাট ছেড়ে চলে এলাম।

ছড়া

শ্রীতনুশ্রী ভট্টাচার্য

কোথায় গেল পুষি?
বাটি ভর্তি ভুষি দেখলে
হবেই হবে খুশি।

*

চালের কিলো ছয়, তেলের হ'ল নয়,
এমন নয় ছয়— তবু তো সব সয়!

*

সব রাত কালো রাত আলো নেই আর
সবদিন ফ্যানহীন এ কি অবিচার!

আত্মরক্ষার হাতিয়ার চাই

শ্রীস্নেহাংশু সেন

বাগানের অনেক ফুলের মধ্যে ফুটে আছে টকটকে লাল গোলাপ। দেখে ছোট্ট পিণ্টুর লোভ হল ফুলটি হাতে নেবার। কি সুন্দর ফুল, মাকে দেখাবে। কিন্তু তুলতে গিয়ে হলো বিপত্তি। গোলাপের কাঁটা বিঁধে গেল তুলতুলে কচি আঙ্গুলটিতে। একটু বুঝি রক্তও বের হয়ে এলো। পিণ্টু মার কাছে নালিশ জানালো কাঁদো কাঁদো গলায়।

শিশু জানতো না গোলাপের কাঁটা আছে গোলাপের আত্ম-রক্ষার জন্য। মা শিখিয়ে দিলেন সে কথা। পিণ্টু মনে রেখেছে, গোলাপের কাঁটার ভয়ে সে আর ফুল তোলার লোভ করে না।

প্রাণিজগতের তুলনায় উদ্ভিদ্‌জগৎ প্রকৃতির দুর্বল সৃষ্টি। তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে প্রকৃতিই তাদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কিছু কিছু করে দিয়েছে। এটা জানা কথা যে সমগ্র প্রাণিজগৎ হয় প্রত্যক্ষভাবে নয়তো পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ্‌জগতের ওপর খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে পুরোপুরি নির্ভরশীল। উদ্ভিদ্‌কুল যদি নিজেদের প্রাণিজগতের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে একদিন পুরো উদ্ভিদ্‌জগৎই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রাণিজগতের মত উদ্ভিদ্‌জগৎও সমান তালে লড়াই করে যাচ্ছে। তবু কেবলমাত্র বনের পশুদের চলাফেরার পথে পথে তাদের পায়ে পায়ে কত যে উদ্ভিদ্‌ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তারই কি শেষ আছে? তবু চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। প্রাণিজগ-তের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে অনেক রকম "অস্ত্রের" সমারোহ ঘটিয়েছে গাছপালারা। অবশ্য এটা খুবই সত্যি যে গাছপালারা নিজেদের ইচ্ছেয় এই অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করে লড়াইয়ে নামতে পারেনি। ক্রমবিকাশের ধারায় তারা এমন এমন সুবিধের

সাজসজ্জা পেয়ে গেছে যা থাকার দরুণ বেঁচে থাকার যুদ্ধে কোন-না-কোন উপায়ে তাদের হয়েছে লাভ। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য উদ্ভিদ্‌জগতের বাসিন্দারা দৌড়ে পালাতে পারে না, লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাড়া করতেও পারে না। তাই যা ছোটখাট অস্ত্র তাদের জুটেছে তাই দিয়েই তারা শক্তিশালী প্রাণিজগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের যথাসম্ভব রক্ষা করে চলেছে।

গোলাপের কাঁটা তেমনিই এক অস্ত্র। বেগুন গাছের পাতার ওপরের কাঁটা, ফণিমনসার কাঁটা, শেয়ালকাঁটা গাছের কাঁটা—এ সবই যেন আমাদের তীর, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রের রকমফের, তবে খুব

ফণিমনসার কাঁটা শেয়াল কাঁটার পাতার ও কুঁড়ির কাঁটা

ছোট ছোট। বেলগাছের কাঁটা আক্রমনকারী শত্রুকে যে সামলাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি? বনের পশুদের কাছে এ ধরণের নানারকম কাঁটা বেশ পরিচিত। তাই তারাও এ অসুবিধেকে এড়িয়ে চলে।

বিছুটি গাছের পাতায়, কাণ্ডে ও ফলে ছোট ছোট চুলের মত কতগুলো শুঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ভর্তি থাকে বিষাক্ত পদার্থে। কোন প্রাণীর সংস্পর্শে এলে শুঁয়াগুলোর সূচের মত ডগা ভেঙে যায়, আর ভিতরের বিষাক্ত রস একটা চাপের দরুন চামড়া

ভেদ করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিষের ক্রিয়ার জায়গাটা ফ লে ওঠে আর জ্বালা করে। বিছুটির চুলকানিতে নাস্তানাবুদ হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে।

তামাক, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে আছে এক ধরণের গ্রন্থি, যা থেকে চটচটে আঠা-জাতীয় একটি পদার্থ নির্গত হয়। কোন পশু ভুল করে এসব গাছে মুখ

বেলগাছের কাঁটা

লাগালে গাছের পাতা এবং ডাঁটা এমন ভাবে মুখে আটকে যায় যে দ্বিতীয়বার তারা সে গাছ থেকে পাতা খাবার লোভে আর মুখ ঠেকায় না।

বড় বড় গাছের ছাল যেন সৈনিকের গায়ের বর্ম। সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখে গাছকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে গাছের ছাল।

কিছু পরিমাণ বিষাক্ত দ্রব্য অনেক গাছেই থাকে। এসব বিষাক্ত দ্রব্যই তাদের পশুদের হাত থেকে রক্ষা করে। বট, অশ্বত্থ বা গোলাপ প্রভৃতি গাছে আঠা (latex) আছে বলে প্রাণীরা হয় অভিজ্ঞতায়, নয়তো সহজাত জ্ঞানে জানে যে এসব গাছের খাদ্য তাদের পক্ষে অনুপযোগী।

অত্যন্ত বিষাক্ত দ্রব্যের মধ্যে আছে তামাকের নিকোটিন, আফিঙের মরফিন, সিনকোনার কুইনিন প্রভৃতি নানারকম অ্যাল্‌কালয়েড (alkaloids)। গাছপালার বেঁচে থাকার পক্ষে এসব হলো মস্ত হাতিয়ার। অবশ্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এইসব বিষাক্ত পদার্থ থেকেই নানারকম অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের আবিষ্কার করেছে।

গাছপালার তেতো স্বাদ, বিদঘুটে গন্ধ ইত্যাদিও অনেক সময় গাছপালাকে প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করে।

পশুপাখিদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে কয়েক রকমের গাছ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। তারা নিজেদের চেহারা একদম বদলে দেয়। কখনো কখনো গাছটি দেখতে দেখায় অন্য কোন প্রাণীর মত। এক ধরণের কচুগাছ আছে যার রঙ এমন যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি সাপ বসে আছে। এমন গাছও
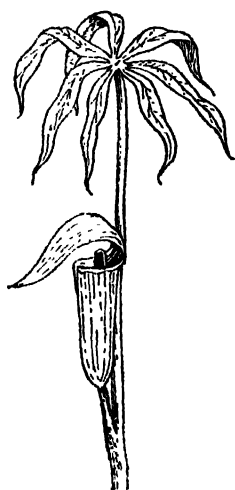
সাপফুল দেখতে হয় যেন ফণাধরা সাপ

আছে, যাদের পাতায় নানারকম রঙের বৈচিত্র্য দেখে মনে হয় কোন পশুর দেহের অংশই বুঝি দেখা যাচ্ছে। শিলং ও দার্জিলিঙের পাহাড়ে কয়েক রকমের কচুগাছ আছে যাদের ফুলের মঞ্জরীর

inflorescence) আকার দেখতে হয় ঠিক ফণাধরা সাপের মতন। বর্ষাকালে এই ফুল ফোটে প্রচুর পরিমাণে। তাদের রঙ আর চেহারা দেখে দূর থেকে সাপ বলে ভুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এদের নামও তাই সাপ ফুল। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতেই এ ব্যবস্থা। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে বোকা বানাবার ক্যামোফ্লাজিং-এর কৌশল। উদ্ভিদের এই অনুকরণের নাম অনুকৃতি (mimicry)।

কম ক্ষতি স্বীকার করে বেশি ক্ষতির হাত এড়ানো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। উদ্ভিদের মধ্যেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। আম, জাম ইত্যাদি গাছে এক রকমের পিঁপড়ে এসে বাসা বাঁধে। গাছের পাতা ইত্যাদি খেয়েই এরা জীবন ধারণ করে। কিন্তু অন্য কোন প্রাণী, তা মানুষও হতে পারে, গাছের কাছে এলে পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণায় পালাবার পথ পায় না। গাছ, পিঁপড়ের সাহায্যে এমনি ভাবে আত্মরক্ষা করে। অন্য গাছেও এ রকমের উদাহরণ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ আর প্রাণীর এই অদ্ভুত মিতালিকে বলে সহকৃতি (myrmecophily)।

নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার জীবন উদ্ভিদেরও নয়। তারাও সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে আছে নয়, সে সংগ্রামে তারা যে জয়ী হয়েছে পর্যাপ্ত গাছপালায় ভরা বনজঙ্গলই তার প্রমাণ।

মায়ার অবতার

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

মেয়েকে কারো সঙ্গে মিশতে দেয় না রিণা। কারো সঙ্গে না। মেয়ে পাছে আর সব মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকা আর গিন্নী হয়ে যায় এই ভাবনায় ঘুম হয় না রিণার।

সবেমাত্র একটা মেয়ে তার, আর সবে মাত্র পাঁচ বছর বয়স মেয়ের। এই মেয়ে পাকাঘটি হয়ে উঠলে আর রইল কি রিণার? অথচ রাজ্যিসুদ্ধু মেয়েই একেবারে পাকার রাজা গো! রিণার ভাইঝির, রিণার দিদির মেয়েরা, রিণার পাড়ার অন্য সব বৌদের মেয়েরা,—সব—সব। একধার থেকে পক্কান্ন।

ওদের কথাবার্ত্তা শুনলে গা জ্বলে যায় রিণার। রিণার দিদির মেয়ে রিণার খুকুর থেকে বরং ছোটই, তবু তার কথা যদি শোনো! কি হাত নেড়ে সে বলবে, আর পারি নে বাবা! ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অরুচি ধরে গেল!

রিণার ভাইঝি দুটো খুকুর থেকে একটু বড় আর ছোট, কিন্তু দুটোই সমান ওস্তাদ। দুই বোনে যখন কথা বলে তখন কে বলবে চার বছর আর ছ' বছরের দুটো মেয়ে কথা বলছে? যেন রিণারাই দুই বোন গল্প চালাচ্ছে, এমনই ভাষা-ভঙ্গী ভাইঝিদের। ওইটুকু মেয়ে বলে কিনা—'মা যা সেকেলে করে চুল আঁচড়ে দেয়, ভাল লাগে না। কিন্তু দেখেছিস ভাই, মা-টা কি দুষ্টু! একবারও আমাদের নিজে সাজতে দেবে না। চিরুণী, পাউডার, স্নো, লিপষ্টিক, কুঙ্কুম, নেলপালিশ সব উঁচুতে তুলে রাখবে। দেখে দেখে মাথা গরম হয়ে যায়।'

হঠাৎ একদিন বাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ভাইঝিদের এই আক্ষেপ শুনতে পেল রিণা, আর শুনে তারও মাথা গরম হয়ে গেল। এদের সঙ্গে যদি তার খুকু মেলামেশা করে খুকুর আর পদার্থ থাকবে?

ভয়ে ভাবনায় বাপের বাড়ী যাওয়াই ছেড়ে দিল রিণা। দিদির বাড়ীটা তো আগেই ছেড়েছিল—যে দিন দিদির ওই খুকুর থেকে ছোট মেয়েটাই বলেছিল, 'হুটো রসগোল্লা তুই আর খেতে পারছিস্ না খুকুদি। এত ঢং-ও করতে পারিস।' সেই দিন নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল রিণা, 'আর বাবা, দিদির বাড়ীতে নয়।'

তা মেয়ের জন্যে না হয় সাধের বাপের বাড়ী, দিদির বাড়ী যাওয়াই ছাড়ল রিণা। মা হলে অমন কত কি-ই ছাড়তে হয়।

খুকুর কাকা দেবু বলে, 'কি বৌদি, তোমার বাপের বাড়ী যাওয়ার কি হ'ল? আগে তো রাতদিন যেতে। ঝগড়া হয়ে গেছে বুঝি?'

রিণা ভয়ে ভয়ে বলে, 'ও-রকম ঠাট্টা কোরো না ভাই, খুকু এক্ষুনি শিখে ফেলবে। ঝগড়া হতে যাবে কেন? এমনি সময় পাই না।'

হ্যাঁ, শুধু পাকা পাকা সমবয়সীদের ভয়েই কাতর নয় রিণা, বড়দের ভয়েও। বলতে গেলে সারা পৃথিবীর লোকের ভয়েই। বড়রা বড়র মত ছাড়া কি রকম কথা বলবে বল? বলবেই তো! রিণা শুনলেই কাঁদো-কাঁদো হবে, 'বোলো না ভাই, ওর সামনে ওসব কথা বোলো না। এক্ষুনি শিখে ফেলবে।' কথা শিখবে না, কাজ শিখবে না, ফুলের মত শিশুটি থাকবে তার খুকু—এই বাসনা রিণার।

ফলে রিণার খুকু এই পাঁচ বছর বয়সেও কাঁথায়-শোওয়া বাচ্চাদের মতই রয়ে গেছে। বোতলে দুধ খায়, মায়ের হাতে ছাড়া চকোলেটটি পর্যন্ত খেতে পারে না, আধো-আধো কথা বলে, আর রাতদিন কোলে চাপে।

খুকুর বাবা বলে, 'এটা যে মোটেই বড় হচ্ছে না।'

রিণা জোর গলায় বলে, 'বড় হচ্ছে না মানে? এই, তো এ মাসে ওজন নিলাম। গত মাসের চেয়ে—'

হ্যাঁ, মাসে মাসে মেয়ের ওজন নেয় রিণা। আর, বলতে নেই, মেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্টই। খুকুর বাবা বলে, 'সে বড় হওয়ার কথা বলছি না, এমনিতে যে একেবারেই বাচ্ছার মতো।'

রিণা মুখ হাঁড়ির মত করে বলে, 'বাচ্ছা বাচ্ছার মত না হয়ে পাকা ঢেঁকি হলেই বুঝি খুব ভালো?'

কিন্তু এ তো চলছিল এক রকম, এখন খুকু এই পাঁচ বছরের হতেই খুকুর বাবা, কাকা দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে খুকুকে স্কুলে দেবার জন্যে। বলছে, 'দু-বছর তিন বছরে স্কুলে যায় আজকাল ছেলেমেয়েরা। আর খুকু এই এত বড় হল—'

খুকুকে কেউ 'বড় হয়েছে' বললে রিণার রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়। মনে হয় কে যেন রিণার হাত থেকে তার একটা আদরের পুতুল খেলনা কেড়ে নিচ্ছে। — কিন্তু পাঁচ-বছরকে তো আর 'পাঁচ বছর-হয়-নি' এ কথা বলা যায় না।

আর পাঁচ বছরটা যে 'হাতেখড়ির' কাল তাও 'না' বলা যায় না। কাজেই খুকুর বাবা, কাকার এই ঘোষণায় রিণার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

স্কুল?

স্কুলে যাবে খুকু?

তার মানে সেই রাশি রাশি গাদা গাদা পাকাঘটি মেয়ের সঙ্গে মিশতে যাবে? স্কুলের দিদিমণিরা তো শুধু পড়ানোর দিকেই মন দেবেন, ওরা কি করছে, কি বলছে, তা দেখবেন?

এই তো রিণার ননদের মেয়ে ফুলটুশ, স্কুলে গিয়ে এই শিখেছে, —রাতদিন ক্লাশের মেয়েদের বাড়ীর গল্প করছে:

'জানো মা, আমাদের ক্লাশে রেখা বলে একটা মেয়ে আছে, তার দিদা না, হি-হি-হি, কি মোটা! ইয়া এক হাতীর মত।… জানো মা, আমাদের ক্লাশে একটা মিতা বলে মেয়ে আছে, তার দিদি আর জামাইবাবু রোজ সিনেমা দেখে। জানো মা, আমাদের

ক্লাশে একটা স্বর্ণ বলে মেয়ে আছে, তার কাকা মেম বিয়ে করেছে। …জানো মা, আমাদের ক্লাশে একটা ভারতী বলে মেয়ে আছে, তার মা পূজোর সময় শুধু নিজের জন্মে পঁচিশটা শাড়ী কেনে।' এই সব গল্প।

রিণার খুকু যদি ওই রকম সব কথা শিখে বসে স্কুলে গিয়ে? যদি এই রকম গল্প করে মার সঙ্গে?

রিণা মারাই যাবে।

রিণা অতএব ঘোষণা করে, 'খুকুকে আমি স্কুলে দেব না।'

'স্কুলে দেবে না! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

খুকুর বাবা আর কাকা বলে, 'খুকুকে যদি স্কুলে দিতে না হয়, তোমাকে তাহলে পাগলা-গারদে দিতে হবে। বলি রাজ্যিসুদ্ধ মেয়ে যদি পাকা হয় তোমার মেয়েও তাই হবে, উপায় কি?

রিণা প্রথমে রেগে আগুন হয়, তারপর কেঁদে আকুল হয়। 'আমার মেয়েও তাই হবে? কত কষ্টে খুকুকে শিশুর মত রেখে মানুষ করছি আমি। খুকুর জন্যে বাপের বাড়ী যাই না, দিদির বাড়ী যাই না, খুকুকে নিয়ে একদিনের জন্যে সিনেমা যাই না, গিন্নী হয়ে যাবে বলে নিজে হাতে খেতে দিই না, বোতলে ছাড়া দুধ দিই না, এখনো কোলে করে সিঁড়ি উঠি, এখনো ওর বিছানায় অয়েলক্লথ পাতি। আর স্কুলে দিয়ে 'বড়' করে দেব ওকে?'

'তাহলে মুখ্য একটা বুড়োখুকী হয়ে থাকুক ও, এই তোমার ইচ্ছে?' খুকুর বাবা রেগে বলে।

খুকুর কাকা বলে, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

রিণা কিন্তু অটল। রিণা বলে,—'আমি পড়াবো খুকুকে। স্কুলের থেকে ভালোই পড়াবো। সেই ক্লাশ সেভেন এইটে স্কুলে দেব ওকে। ততদিনে বুদ্ধি হবে, বুঝবে পাকামি করতে নেই, গিন্নী-গিন্নী কথা বলতে নেই, ছেলেমানুষ হয়ে থাকাটাই সুন্দর।'

খুকুর ছোট কাকা দুই হাত উল্টে বলে, 'সুন্দর!'

রিণা ওতে কান করে না।

রিণা ছুটে গিয়ে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'খুকু—খুকু, আমার সোনার খুকু, তোকে আমি নিজে পড়িয়ে পড়িয়ে বিদ্বান্ করবো, কেউ বলতে পারবে না মুখ্যু খুকু। কেমন রে?'

খুকু মাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলে, 'মা-মণি, মা-মণি! আমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হবো, কেমন?....বাবা বলবে, খুকু আমার সোনা, কাকা বলবে, খুকু কত বুদ্ধিমান্। তাই না? তার-পর বড় হয়ে কত পাশ করবো আমি, বিলেত যাবো, আমেরিকা যাবো। তুমিও যাবে মা-মণি। তুমি আর আমি।'

রিণা বিগলিত স্নেহে বলে, 'দূর, আমি কি যেতে পারি? আমি তখন বুড়ী হয়ে যাবো।'

খুকু মাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে, আরো আদুরে গলায় বলে, 'না—আ—আ। তুমি যাবে। তুমি না গেলে আমি কাঁদবো।'

খুকুর মুখে ফুলের সুষমা।

খুকুর চোখে দেবদূতের স্বর্গীয় আলো।

তারপর খুকু বলে, 'মা, আমি আজ ছাতে যাব-না..

বিকেল বেলা ছাতই খুকুর খেলার মাঠ। পার্কে যেতে দেয় না রিণা। রাজ্যের বিচ্ছু বিচ্ছু ছেলেমেয়ে, তাদের ঝি-চাকর, কতই না জানি পাকা কথার চাষ হয় সেখানে। তার থেকে ছাতই ভালো। খোলা হাওয়াটাই পাচ্ছে, পৃথিবীর 'মলিন হাওয়া' লাগছে না গায়ে।

কিন্তু খুকু ছাতে যেতে চায় না। বলে 'মা, তোমার কাছে থাকি।'

মার কাছে থাকা মানেই রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে, 'খাবার ঘরে। তাতে তো স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার ভয়। তাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দেয়। বলে, 'আমার কাছে তো একটু পরেই আসবি সোনা!'

আজও তাই বললো।

খুকুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ছাতে বেড়াতেও পাঠালো, কিন্তু

কপালটা আজ মন্দ, তাই একটু পরেই রিণার দিদি এসে হাজির হ'ল।

সঙ্গে সেই তার গিন্নী প্যাটার্নের মেয়েটা, শাবু—প্রায় খুকুরই বয়সী, কিন্তু কথায় রিণাকেও হার মানায়।

এসেই সে বলে ওঠে, 'ছোট মাসী একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে। একদিনও যায় না। বাবা তোমার যা নিন্দে করে!'

কথা শুনে গা জ্বলে যায় রিণার। নিজের দিদির মেয়ে হলেও যায়।

তবু কষ্টে, বাচ্ছাদের সঙ্গে কথা বলার সুরেই বলে, 'সময় পাই না সোনা! এসো, বোসো!' কিন্তু বসছে কে? ··শাবু সেই কথাটিই বলে ওঠে,—সেই ভয়ঙ্কর কথাটি।

'খুকু কোথায়?'

'খুকু!'

খুকুকে এখন অন্ততঃ দু'ঘণ্টা এই বিচ্ছু মেয়ের কাছে রাখতে হবে! · রিণা চোখে অন্ধকার দেখে।

কিন্তু উপায় কি?

বলা তো যাবে না, 'খুকুর কাছে যাস্ না তুই!' তাই ম্লানমুখে বলে, 'খুকু ছাতে বেড়াচ্ছে, আসবে একটু পরে। তুই আবার কষ্ট করে যাবি?'

শাবু হি-হি করে হাসে, 'ছোট মাসীটা যেন কি! ছাতে যেতে আবার কষ্ট কি? আমি কি ঠাকু'মা? তাই বলবো বাবা রে, কোমর গেল!'—ছুটে উঠে যায় ছাতে।

রিণা না বলে পারে না।—'দিদি, শাবুটা বড্ড পাকা হয়ে যাচ্ছে।'

দিদি রাগ করবে?

করুক!

পষ্ট কথা বলবেই রিণা, 'অতটুকু মেয়ে, অত কথা! অত কথা কইতে দাও কেন?'

দিদি মুখ ভার করে বলে, 'শোন কথা! কথা কইতে আবার দিতে হয় নাকি? ভগবান্ মুখ দিয়েছেন কথা বলার জন্যে, সে কথা ওরা জানে না।'

এ কথার উত্তর আছে।

কিন্তু রিণা দিদিকে আর রাগায় না।

শুধু ভাবে একটু পরেই ছুতো করে ছাতে উঠে যাবো। দেখবো শাবুটা খুকুর সামনে বেশী কথা বলছে কি না।

দিদিকে চা-টা দিয়ে রিণা ছুতো আবিষ্কার করে, 'যাই, শাবুটাকে ডেকে আনি। সন্দেশ, বিস্কুট কিছু খাক একটু।'

দিদি হেসে বলে, 'সন্দেশ মুখেও করবে না। বিস্কুট? ঝাল ঝাল সিঙাড়া, ডালমুট, পাঁপর ভাজা, এই সব ওর খাদ্য!'

'তার মানে তোমরাই এক একটি অখাদ্য!' বলে রেগে ছাতে উঠে যায় রিণা।

হ্যাঁ, ছাতে।

যেখানে শাবু আর খুকু জমিয়ে গল্প করছে। সিঁড়ির দিকে পিছন করে স্রেফ ঠাকু'মাদের মত ভঙ্গীতে পা ছড়িয়ে বসেছে ওরা, তাই রিণাকে দেখতে পায় না।

কিন্তু রিণা?

সে কি সামনে যেতে পারে না?

না, পারছে না।

পারল না।

তার খুকুর কথা তাকে মাটিতে পুঁতেই ফেলেছে প্রায়! খুকুদের কথোপকথন!

কিন্তু এই কি খুকুর গলা?

আধো নয়, আদুরে নয়, চাঁচাছোলা পরিষ্কার। শাবুকে ঠেলে ঠেলে, হেসে হেসে বলে চলেছে সে, 'আর বলিস্ না ভাই, আমার যা অবস্থা! মা আমার জীবন মহানিশা করে তুলেছে। আচ্ছা, বল তো ভাই, রাজ্যিসুদ্ধ মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে—আমি গেলেই দোষ?

'ইস্কুলে যাবি না তুই ?'

'না রে! তবে আর শুনলি কি! মা নিজে পড়াবে। তার মানেই আমার দফা শেষ! সব মেয়ে মজা করে স্কুলে যাবে, আর আমি বাড়ি বসে থাকবো।'

শাবু হিহি করে হেসে বলে, 'তা তুই তো কচি খুকীই আছিস্! এখনো বোতলে দুধ খাস্, নিজে হাতে ভাত খেতে পারিস্ না, কোলে চাপিস্—'

খুকু তাকে থামিয়ে দেয়।

গোল গোল মোটাসোটা হাতটা ঘুরিয়ে বলে, 'আহা রে! নিজের জন্যে যেন ? শুধু ওই মার জন্যেই। আমি বড় হয়ে গেলেই যে মার মনে দুঃখু হবে। আর দুঃখু হলেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। তাই তো বানিয়ে বানিয়ে 'বাচ্ছা'র মতন হয়ে থাকি। আধো-আধো কথা বলি। যতই হোক্, মা তো! আহা বেচারা! একটাই মোটে মেয়ে আমি মার, আমাকেই তো দেখতে হবে মার কিসে কষ্ট, কিসে সুখ! তাই ইচ্ছে করে ন্যাকামি করি।'

'ইচ্ছে করে ন্যাকামি করিস্ তুই ?

শাবু ছিটকে ওঠে।

খুকু অটল।

বলে, 'না করলে ? মা তো তা'হলে রাতদিন কাঁদবে! ভেবে মায়া হয় না ? মায়ার জন্যেই এই করতে হয়।

মানুষ স্বপ্ন দেখে। তুমি দেখো, আমি দেখি, সবাই দেখে। আবার কেউ কেউ আছে যারা শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের সেই স্বপ্নকে সফল করার চেষ্টা করে। কোনও বাধাকেই তারা বড় করে দেখে না। কঠোর পরিশ্রম, অসীম মনোবল ও সাহসকে পাথেয় করে ধৈর্যের সঙ্গে তারা স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। ইউরোপের এক কোণে এ রকম নানারকমের স্বপ্ন দেখত ছোট্ট একটি ছেলে। নরওয়ের বর্জে শহরে জাহাজ-ফেরতা বড়দের কাছে বিভিন্ন দেশের গল্প শুনতে শুনতে অজানা অচেনা স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যেত ছোট্ট ছেলে রোল্ড অ্যামুণ্ডসেন। জাহাজযাত্রীদের কাছ থেকে রোল্ড মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনত নাম-না জানা দেশ আর দুস্তর সাগরের কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের জাল বুনত কবে সেও ওদের মত দূরদিগন্তে পাড়ি দেবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ছোট্ট রোল্ড পড়ত অভিযাত্রীদের কাহিনী। পনেরো বছর বয়সে বৃটিশ অভিযাত্রী স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ অভিযানের কাহিনী পড়ে সে বিমোহিত হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর অনাহারে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁর ১২৯ জন সহযাত্রী মৃত্যুবরণ করেন।

নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাজয়কে রোল্ড মনে মনে বরদাস্ত করতে পারেনি। পরবর্তী কালে অ্যামুণ্ডসেন নিজেই লিখে গেছেন যে স্যর ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁর সহযাত্রীদের কাহিনী তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল এবং তখনই তিনি স্থির করেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনিও একজন অভিযাত্রী হবেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আঠারো বছরের অ্যামুণ্ডসেন স্নাতক উপাধি

লাভ করার পর চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে শুরু করেন। কিন্তু অভি-যানের দুরন্ত আকর্ষণ তাঁকে টানতে লাগল; ডাক্তারি পড়া তাঁর জন্য নয়। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে অসহিষ্ণু অ্যামুণ্ডসেন বাইশ বছর বয়সে শুরু করলেন সাগর পাড়ি দেবার জন্য জাহাজ চালনো শিক্ষা এবং কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ নাবিক হিসেবে একটি অভিযাত্রী দলে যোগ দেবার এক সুযোগ পেয়ে গেলেন। এর পর বেলজিয়াম সরকার তাঁকে "বেলজিকা" নামে এক জাহাজের বিশিষ্ট কর্মচারী-পদে নিযুক্ত করে দক্ষিণ মেরুর দিকে অ্যাণ্টার্কটিক অঞ্চলে এক অভিযানে পাঠায়। অ্যাণ্টার্কটিক অঞ্চলে পৌঁছে অ্যামুণ্ডসেন সেখানকার দুঃসহ শীতের সম্মুখীন হন। দীর্ঘ তেরো মাস তিনি তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে সেখানকার তুষারস্তূপে আটকা পড়েন সেই অকল্পনীয় ঠাণ্ডায়।

এই অভিযানের ফলে অ্যামুণ্ডসেনের মেরুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হয়ে উঠল। দেশে ফিরে এসে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন নিজস্ব অভিযান চালানোর জন্য। প্রস্তুতি চললো তাঁর নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ অভিযানের। এই প্যাসেজ জয়ের আগের প্রতিটি প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি প্রচুর পড়াশোনা করলেন। ঐ অঞ্চলের ল্যাপল্যাণ্ডবাসীরা কি উপায়ে নিদারুণ শীতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে সে সম্বন্ধেও যথাসম্ভব খবর যোগাড় করলেন। বরফের রাজ্যে চলাচলের একমাত্র গাড়ী কুকুরচালিত শ্লেজগাড়ী চালনা রপ্ত করলেন। জমাট বরফের ওপর মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হবে, তাই শিখে নিলেন বরফের দেশের বিশেষ রকমের খেলা স্কিইং। এরই সঙ্গে চলল অর্থ সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম। অল্প কিছু অর্থসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কিনে ফেললেন একটি ছোট্ট জাহাজ। ২১ মিটার লম্বা ৪৭ টন ওজনের জাহাজটিকে আদর করে নাম দিলেন "গ্জোয়া"। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে শুরু হল খাদ্য সংগ্রহ করা। পরবর্তী পাঁচ বছরের সঞ্চয় হিসাবে

জাহাজে মজুত করলেন শুক্‌নো মাংস ও অন্যান্য উপযুক্ত খাবার। নানা রকম প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও যোগাড় হলো। এই সব সাজসরঞ্জাম দীর্ঘদিনের জন্য মজুত থাকলেও যাতে নষ্ট না হয় অথবা অকেজো না হয়ে পড়ে তার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে প্যাকিং বাক্স তৈরী করালেন। এই বাক্সগুলির আর একটি বিশেষত্ব হলো যে মেরু-প্রদেশে ছোট ছোট কুটীর তৈরীর করার কাজেও এদের ব্যবহার করা যাবে। বরফের রাজ্যে দীর্ঘদিন বাসের শেষ এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হিসেবে তিনি সংগ্রহ করলেন ছজনের একটি ছোট্ট দল।

সম্বলহীন অ্যামুণ্ডসেনের অভিযানের এই সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে গিয়ে প্রচুর দেনা হয়ে গেল। পাওনাদারদের তাগিদ ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল। তারা শেষে হুমকি দিল ২৪ ঘণ্টার ভেতরে ঋণ শোধ না হলে তারা অভিযানের যা কিছু সরঞ্জাম সবই নিলাম ক'রে টাকার বন্দোবস্ত করবে। নিরুপায় অ্যামুণ্ডসেন পাওনাদারদের দেওয়া ২৪ ঘণ্টা সময়ের সদ্ব্যবহার করলেন। সকলের অলক্ষ্যে ছ'জন সহযাত্রী নিয়ে সেই রাত্রেই তিনি জাহাজে পাড়ি দিলেন তাঁর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্য নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজের উদ্দেশে।

পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অ্যামুণ্ডসেনের কাজ নয়। তাঁর আগে যে সমস্ত অভিযাত্রী উত্তরমেরু বা আর্কটিক অঞ্চলে অভিযানের চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই কানাডার উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। অ্যামুণ্ডসেনই প্রথম ধরলেন দক্ষিণের পথ। তখন আর্কটিক অঞ্চলে শীত পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্র জমে ক্রমশঃ চাঁই চাঁই বরফ দানা বাঁধছে। বরফ কেটে "গ্‌জোয়া" এগিয়ে চলল বহু কষ্টে, ঢুকে পড়লো অনেক ভেতরে যেখানে জাহাজ হিসেবে 'গ্‌জোয়াই' প্রথম। বহু কষ্টে একদিন "গ্‌জোয়া" এসে পৌছল নির্জন শৈবালাচ্ছন্ন 'কিং উইলিয়াম্‌স্‌' দ্বীপে। কৌশলে প্যাকিং বাক্স পর পর জোড়া দিয়ে অ্যামুণ্ডসেনের দল সেখানে বানিয়ে ফেললেন বাসোপযোগী ছোট্ট একটি কুটীর।

আর্কটিকের তীব্র শীত 'গ্‌জোয়াকে' আর এগোতে দিল না। অভিযান বন্ধ রেখে বাধ্য হয়ে অ্যামুণ্ডসেন 'কিং উইলিয়াম্‌স' দ্বীপেই রয়ে গেলেন। একটা শীত পেরিয়ে গেল কিন্তু নিরেট বরফ গলল না। সেই তুষার রাজ্যে প্রকৃতির বন্দী হ'য়ে রইলেন অ্যামুণ্ডসেন আর তাঁর ছ'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। পশুপাখী শিকার করেই আহার্য যোগাড় হত। সঙ্গের মজুত খাবার তাঁরা ভবিষ্যতের পাথেয় হিসেবে রেখে দিলেন। স্থানীয় এস্কিমোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশলেন। আহরণ করলেন তাদের কাছ থেকে মেরু অঞ্চল সংক্রান্ত বহু মূল্যবান্ তথ্য। পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুর সন্ধানে এসে প্রকৃতির খেয়ালে বাধ্য হয়ে তিনি অনেক নতুন তথ্য যোগাড় করলেন। পৃথিবীর 'চৌম্বক উত্তর মেরু' যে ভ্রাম্যমাণ সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা জানতে পারলেন প্রচুর মূল্যবান্ সংবাদ।

দীর্ঘ দু'বছর বরফে বন্দী থাকার পর অবশেষে বরফ গলতে শুরু করল; সেটা ছিল ১৯০৫ সালের অগাষ্ট মাস। হিমশীতল জল কেটে 'গ্‌জোয়া' এগিয়ে চলল। সমুদ্রের আরও ভেতরে—আরও গভীরে। কিং উইলিয়াম্‌স্ দ্বীপ ছাড়ার পর ক্রমাগত দু'সপ্তাহ জাহাজ চালানোর পরে তাঁরা একদিন তাঁদের জাহাজের পশ্চিমে আর একটি জাহাজ দেখতে পেলেন। উল্লাসে অ্যামুণ্ডসেনের দল তাঁকে জড়িয়ে ধরল। স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দে অ্যামুণ্ডসেনও আত্মহারা। নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ তাঁরা অতিক্রম করতে পেরেছেন।

ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলেন বিজয়মাল্য গলায় নিয়ে। দেশে প্রচুর সম্মান পেলেন অ্যামুণ্ডসেন। কিন্তু পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কিন্তু কোনও প্রতিকূল পরিবেশেই দমবার পাত্র ছিলেন না লোহার মানুষ অ্যামুণ্ডসেন। নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ জয়ের নেশা তাঁকে মাতাল করে তুলল। এবার লক্ষ্য স্থির করলেন তখন পর্য্যন্ত মানুষের অজেয় উত্তর মেরু। টাকা চাই। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতিতে তাঁর অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে যোগাড় করলেন কিছু অর্থ। পুরোনো ঋণ শোধ হ'ল। তার

পর শুরু করলেন উত্তর মেরু অভিযানের বিস্তারিত প্রস্তুতি। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি যখন প্রায় সমাপ্ত তখন স্তম্ভিত পৃথিবী খবর পেল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে আমেরিকার অভিযাত্রী রবার্ট পিয়েরি উত্তর মেরু জয় করেছেন।

অ্যামুণ্ডসেনের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি বিফল হ'ল। কিন্তু তাঁর অভিধানে বৈরাগ্য কথাটির স্থান ছিল না। তিনি জানতেন উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্য তার আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। বিশ্বজয়ের নেশায় তখন তিনি মশগুল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি গোপনে অভিযানের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন উত্তর মেরুর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। শুরু করলেন তিনি দক্ষিণ মেরু অভিযান। দক্ষিণ মেরুর অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে পৌঁছুতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সেখানে পৌঁছে জাহাজ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পুরোনো কায়দায় তৈরী করলেন প্যাকিং বাক্সর কুটির। যন্ত্রপাতি ও আহার্য সেখানে মজুত করা হ'ল। তাছাড়া ফিরে এসে খাবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য আর একটি কুটিরে রাখলেন। বরফের রাজ্যে যাতে সেই কুটির হারিয়ে না যায় নিশানা স্বরূপ তাঁদের যাত্রাপথের ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বসিয়ে দিলেন রঙিন পতাকার সারি।

দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে তাঁদের যাত্রা শুরু হ'ল বসন্তকালে। ৪টি স্লেজ গাড়ীতে মাল বোঝাই ক'রে ১৪৫০ কিলোমিটার তুষার রাজ্যে পাড়ি দেবার জন্য শুরু করলেন পদযাত্রা। যতদূর দৃষ্টি যায় বরফের পর বরফ। কোন মানুষ নাই, নেই কোন পশুপক্ষী। হাঁড়কাঁপুনী শীত এসে জমিয়ে দেয় হাত-পা। কিন্তু অভিযাত্রীদল এগিয়ে চলেন অসীম সাহসে, অসীম ধৈর্য্য নিয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে তাঁরা এসে পৌঁছলেন দক্ষিণ মেরুর দ্বারপ্রান্তে —সুদীর্ঘ তুষারাবৃত পর্বতমালার পাদদেশে। কোথাও বা আছে গভীর খাদ, কোথাও আবার বরফ অপলকা সেতুর আকার নিয়েছে। মরণকে হাতের মুঠোর ভেতরে নিয়ে চললো তাদের অক্লান্ত

অভিযান। চারদিন পরে তাঁরা এক মালভূমিতে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ মিটার ওপরে। আনন্দে যখন তাঁদের মন ভরে উঠেছে তখন হঠাৎ তাঁদের পথরোধ ক'রে দাঁড়াল এক ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড়। অবর্ণনীয় সাহস আর মনোবল নিয়ে অ্যামুণ্ডসেন আর তাঁর সঙ্গীরা প্রকৃতির সেই ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে দিলেন। বেলা তিনটে, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়ল পৃথিবীর পায়ের তলায়—দক্ষিণ মেরুতে। বিজয়-পতাকা—নরওয়ের জাতীয় পতাকা পুঁতে দিলেন নরওয়ের বিশ্বজয়ী সাতটি ছেলে। ৯১ দিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অমানুষিক পরিশ্রম ও অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করার পরে তাঁদের স্বপ্ন সফল হ'ল। বর্জে শহরের সেই কিশোর তার স্বপ্নরাজ্যে পৌছাল।

দক্ষিণ মেরু জয় করে দেশে ফিরে এসে অ্যামুণ্ডসেন কিন্তু স্বস্তিতে বাস করতে পারলেন না। উত্তর মেরুর তুষার সমুদ্রের আহ্বান তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। 'মাউড্' নামে একটি জাহাজে ক'রে ১৯১৮ সালে সাইবেরিয়ার উত্তর দিক্ ধরে তিনি আবার রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য সমুদ্রপথে উত্তর মেরু পৌছুনো। পর পর চার বছর তিনি চেষ্টা করলেন সাইবেরিয়ার উত্তরের আর্কটিক সাগরে জাহাজ চালাতে। কিন্তু আর্কটিক সাগরে জমাট-বাঁধা বরফ চার বছরেও গলল না। অগত্যা তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রকৃতির কাছে হার মানতে তিনি রাজী ন'ন। পরিকল্পনা শুরু করলেন আকাশপথে উত্তর মেরু পৌছবার জন্য। চিরন্তন অর্থের সমস্যা আবার দেখা দিল। কপালগুণে লিঙ্কন এলস্‌ওয়ার্থ নামে এক আমেরিকান-ধনকুবের তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এলস্-ওয়ার্থের বহুদিনের সখ ছিল অভিযানের। অ্যামুণ্ডসেনের মত অভিজ্ঞ অভিযাত্রী পেয়ে তিনিও তাঁর সঙ্গী হলেন। জলযান ও আকাশযান হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন দুটি উভচর এরোপ্লেন জার্মানী থেকে কিনে নিলেন এলস্‌ওয়ার্থ।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অ্যামুণ্ডসেন ও এলস্‌ওয়ার্থ আর চারজন সঙ্গী নিয়ে

উত্তর মেরু অভিমুখে উভচর এরোপ্লেন ছুটি করে যাত্রা করলেন লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রায় ২৫০ কিলোমিটার আগে হঠাৎ অ্যামুণ্ডসেনে বিমান যান্ত্রিক গোলযোগে বিকল হয়ে পড়ল। জমে-যাওয় আর্কটিক সাগরের ওপর তিনি বিমান নামাতে বাধ্য হলেন। সঙ্গীবে সাহায্য করতে এল্‌স্‌ওয়ার্থও তাঁর বিমানটিকে আর্কটিক সাগরের উপ নামাবার চেষ্টা করলেন। তুষার-মিশ্রিত জলে নামতে গিয়ে তাঁ এরোপ্লেনটিও ভীষণ ভাবে জখম হ'ল। ছ'জন মিলে তখন দুটি এরোপ্লেন সারাবার কাজে লেগে গেলেন। কিন্তু খালি একটিই সারানো সম্ভবপর হ'ল। ছ'জন অভিযাত্রী সেই একটিতে চড়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আর্কটিক সাগরে তখন জলের চেয়ে বড় বড় ভাসমান বরফের টুকরোই বেশী। সেখানে এরোপ্লেন ওড়ানো গেল না। তখন জমাট বরফের ওপর চালু করিয়ে উভচর এরোপ্লেনটিকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। অমসৃণ তুষার সাগরে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। অভিযাত্রীদল তখন নিরুপায় হয়ে কোদাল এবং কুড়ুল নিয়ে লেগে গেলেন বরফ কাটার কাজে।

ওদিকে মজুত খাবার কমে এসেছে। এই ভাবে দীর্ঘ ২৫ দিন ধরে কল্পনাতীত পরিশ্রম করে অভিযাত্রীদল বরফ কেটে উভচর এরোপ্লেন ওড়াবার জন্য প্রায় ৫০০ মিটার লম্বা এক জলপথ তৈরী ক'রে ফেললেন। ভাগ্যি ভাল যে ছ'জন অভিযাত্রীই সেই উভচর প্লেনে করে প্রথম চেষ্টাতেই আকাশে উড়তে সক্ষম হলেন; এবং স্পিৎস্‌বুর্গেনের সীমানায় এসে পৌঁছতে দেরী হল না। নর্থ পোলে পৌঁছতে হ'লে স্পিৎস্‌বুর্গেন থেকে আর্কটিক মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু ভগ্ন যান নিয়ে আর এগোতে সাহস পেলেন না তাঁরা।

অ্যামুণ্ডসেন দেশে ফিরে এলেন। তাঁর এবং তাঁর অভিযাত্রী দলের ততদিনে পৃথিবীজোড়া নাম হয়ে গেছে। ১৯২৬ সালে এল্‌স্‌ওয়ার্থের সাহায্যে আবার তিনি একটি ইতালীয়ান্ এরোপ্লেন কিনলেন। প্লেনটির ডিজাইনার আমবার্টো নোবাইলও তাঁদের

অভিযানে যোগ দিলেন একজন পাইলট হিসেবে। ইওরোপ থেকে আর্কটিক সাগর পাড়ি দিয়ে অভিযাত্রীদলের এরোপ্লেন ছুটে চলল কানাডার উত্তরে নর্থ পোলের উদ্দেশ্যে। নীচে আর্কটিক সমুদ্র। দীর্ঘ বাহাত্তর ঘণ্টা ক্রমাগত প্লেন চালিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন আলাস্কার উত্তরতম প্রান্ত পয়েণ্ট ব্যারোতে। পয়েণ্ট ব্যারো থেকে ৫৪৫৭ কিলোমিটার দূরে আর্কটিক সাগরের মধ্যে পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু। সহজেই উত্তর মেরুর জলরাশির ওপর দিয়ে অভিযাত্রীদলের প্লেন উড়ে এল। অভিযাত্রী হিসেবে অ্যামুণ্ডসেনের স্বপ্ন সফল হল।

জীবনের স্বপ্ন সফল হওয়ায় দিগ্বিজয়ী অভিযাত্রী অ্যামুণ্ডসেন ঠিক করলেন যে তিনি এবার অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর জন্য নয়।

নর্থ পোল জয় করে ফিরে আসার দু'বছর পরে তাঁর অভিযানের অন্যতম সঙ্গী আমবার্টো নোবাইল আবার উত্তর মেরুর উদ্দেশ্যে এরোপ্লেনে যাত্রা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই খবর এল নোবাইলের প্লেন দুর্ঘটনায় পড়েছে। বন্ধুর এই বিপদে অ্যামুণ্ডসেন নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। একটি প্লেন নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নর্থ পোলের উদ্দেশ্যে তাঁর মেরু অভিযানের সঙ্গী নোবাইল্‌কে উদ্ধার করতে। সারা বিশ্ব অধীর প্রত্যাশায় পথ চেয়ে রইল। বিশ্ববাসী আশা করেছিল অ্যামুণ্ডসেনের মত অভিযাত্রী, যিনি জীবনের কোনও অভিযানে ব্যর্থ হন নি, নিশ্চয়ই এবারও বন্ধুকে নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু না, এবার আর অ্যামুণ্ডসেন ফিরলেন না। মানবতার ডাকে তিনি যে দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার থেকে তিনিও ছাড়া পেলেন না। বন্ধুর সঙ্গে তিনিও হারিয়ে গেলেন নর্থ পোলের গভীর অনন্ত তুষারসমুদ্রের বুকে। পৃথিবীর মানুষ তাঁর সন্ধান পেল না। শুধু তাঁর স্মৃতি বয়ে নিয়ে এল সমুদ্রের জলে ভেসে-আসা তাঁর বিমানের একটি ভাঙা টুকরো।

ইকারাসের উৎপাত

শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর সভাপতির সেদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন সবার আগে তাঁর চোখ পড়লো সামনের দেয়ালে আঁটা বড় ক্যালেণ্ডারের ওপর। তাই দেখে আপন মনেই তিনি বললেন, "আজ তা হলে পয়লা জানুয়ারী, তু'হাজার ছেষট্টি সাল।"

চাকর খবরের কাগজ বিছানার পাশে রেখে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে কাগজটি তুলে নিলেন সভাপতি। প্রথম পাতার ডানদিকের তলায় বড় একটি বিজ্ঞাপন। একটু হেসে তিনি বিজ্ঞাপনটি দেখতে লাগলেন। বিজ্ঞাপনটা ছিল এই রকম ঃ

"পৃথিবীর ভার কমানোর জন্য বিশ্বরাষ্ট্রসজ্বের তৃতীয় চেষ্টা। চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য একলক্ষ জমির প্লট বিক্রী করা হবে এই তৃতীয় বারে। প্রতি প্লটে পাঁচ কাঠা জমি। ভারতের ভাগে তু'শো প্লট। প্রতি প্লটের দাম দশ হাজার টাকা। এই তৃতীয় উপনিবেশে বাসিন্দাদের সুখ-সুবিধার জন্য সর্বাধুনিক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, সিনেমা, থিয়েটার, হাটবাজার, দোকান, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, আভ্যন্তরীণ যানবাহন, রকেটড্রোম (রকেট-এরোড্রোম) ইত্যাদির অসংখ্য ব্যবস্থা করেছেন বিশ্বরাষ্ট্রসজ্ব।

"যাঁরা এই জমি কিনতে চান তাঁরা আজ থেকে দশদিনের মধ্যে আবেদন করুন। আশা করা যাচ্ছে অনেক আবেদন পড়বে। জমি বন্টনের মধ্যে যাতে কোন রকমের দোষ না থাকে তার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রার্থীদের মধ্যে লটারী করে তু'শোটি নাম তুলবেন এবং এই তু'শো প্রার্থীর দরখাস্ত বিশ্বরাষ্ট্রসজ্বে পাঠাবেন। প্রার্থীর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাতে হবে ঃ

"সেক্রেটারী জেনারেল, চন্দ্র কন্ট্রোল কমিটি, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ, ওয়াশিংটন (ইউ-এস-এ)। তবে ঐ দরখাস্ত পাঠাতে হবে সেক্রেটারী, হোম ডিপার্টমেণ্ট, চন্দ্র উপনিবেশ শাখা, ভারত গবর্ণমেণ্ট, নয়া দিল্লী—এই দপ্তরের মারফৎ।"

ডঃ সভাপতি যেখানে শুয়ে আছেন সেটা তাঁর ল্যাবরেটরী। নানারকমের যন্ত্রপাতিতে ঘর ভর্তি। দূরে ছোট একটি খাট। দিনরাত্রি তিনি গবেষণা করেন এখানে। যখন ঘুম পায় তখন ঐ বিছানায় শুয়ে পড়েন। গতকাল রাত্রি সাড়ে তিনটে পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন। তারপর ঘুম এলো। এই মাত্র সেই ঘুম ভেঙেছে। ঘড়িতে তখন ছ'টা। অন্যান্য দিন সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়েন। কিন্তু আজ আর উঠলেন না। চাঁদে লোক পাঠানোর কথা ভাবতে লাগলেন। পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেছে। ফলে, মানুষের থাকবার জায়গা নেই, আর নেই খাবার। তাই চাঁদে বসতি বিস্তারের আয়োজন করে চলেছেন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ। কাজটি প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু মাত্র একটি চাঁদ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে কি? চাই আরো চাঁদ। কিন্তু পৃথিবীর ঐ একটি মাত্র উপগ্রহ ছাড়া আর উপগ্রহ নেই। যদিও একটি মাত্র উপগ্রহ, কিন্তু কি কষ্টই না সে দিয়েছে মানুষকে তাকে জয় করবার জন্য। গত শতাব্দীর মাঝ থেকে বৈজ্ঞানিকেরা সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করছিলেন চাঁদে যাবার জন্য। অনেকবার তাঁরা হেরেছেন। তবু তাঁরা দমেন নি। অবশেষে তাঁরা জয়ী হলেন। তাঁদের প্রথম রকেট যেদিন চাঁদে নামলো সেদিন পৃথিবীতে কি ভয়ানক আনন্দ! তারপর চাঁদে যাওয়া-আসা ডাল-ভাত হয়ে গেল। তারপর মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাঁদে বাতাস তৈরী করলো, জল বানালো, আর উন্নত সার মিশিয়ে চাঁদের জমিতে ফসল উৎপন্ন করলো। তারপর শুরু হয়ে গেল চাঁদে মানুষের উপনিবেশ পত্তন।

শুধু বিজ্ঞানে নয়, মনুষ্যত্বের দিক থেকেও মানুষ অনেক এগিয়ে

গেছে। সারা দুনিয়ার মানুষেরা ঠিক করেছে যে চাঁদ কোন একটি মাত্র দেশের প্রদেশ হবে না। চাঁদ সকলের। চাঁদকে শাসন করবে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি নিয়ে গড়া চাঁদ কণ্ট্রোল কমিটি মারফৎ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ চাঁদ শাসন করবেন।

চিন্তায় বাধা পড়ে। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলেন জাতীয় অধ্যাপিকা ডক্টর মানসী রায়।

"সুপ্রভাত ডঃ রায়।"

"সুপ্রভাত সভাপতি বাবু। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ডঃ রায়?"

"কিন্তু, মানে, আমি কি দেখলাম!"

"আপনি কি দেখলেন তা আমি নিজে না দেখে কেমন করে বলবো যে আপনি কি দেখলেন!"

"ঠাট্টা রাখুন সভাপতি বাবু! এই সাত সকালে আমার ছুটে আসবার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে। আর নিশ্চয়ই না থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আসতে যাবেন কেন? এখন বলুন, ব্যাপার কি?"

মানসী বলে চলেন, "কাল রাত্রিতে দূরবীন নিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে গেলাম। জ্বলজ্বলে কি যেন একটি ভয়ানক বেগে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটি এত আকস্মিক যে আমি ভয় পেয়ে দূরবীন ছেড়ে চলে এলাম। তারপর ভয় জয় করে যখন আবার দূরবীন ধরলাম, তখন আর সেটিকে দেখতে পেলাম না। সূর্যোদয়ের জন্য তখন অন্ধকার চলে যাচ্ছে।"

ডক্টর সভাপতি বললেন, "হয় তো কোন উল্কা।"

মানসী জোর দিয়ে বললেন, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। উল্কা আমি চিনি না?"

"তবে হয় তো কোন নাম-না-জানা ধূমকেতু।"

"ধূমকেতুর চেহারাও আমি জানি। এটি ধূমকেতুও নয়।"

"তবে এটি কি ?"

"সেই জন্যই তো আসা। আপনিই বলুন, এটি কি হতে পারে ?'

"কিন্তু না দেখে তো আমি বলতে পারছি না। দেখবার জন্য রাত্রি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কি বলেন মানসী দেবী ?"

"বেশ। তবে তার আগে আরও একটি কাজ আমরা করতে পারি। আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিকেরাও হয়তো এটি দেখে থাকবেন। আর দেখলে নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টকে জানাবেন। গভর্ণমেণ্ট জানলে খবরটা নিশ্চয়ই আকাশবাণীতে শোনা যাবে। অতএব, সভাপতি বাবু, দয়া করে আপনার রেডিওটি খুলুন।"

ডঃ সভাপতি রেডিও খুললেন। একটু পরেই রেডিওর সংবাদবিচিত্রা আরম্ভ হল। ঘোষিকা বলছিলেন, "আজকের বিশেষ খবর হচ্ছে পৃথিবীর আকাশে ইকারাস নামে দুষ্ট গ্রহের উদয়। আকাশে যে হাজার খানেক নামগোত্রহীন গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইকারাস তারই একটি। এর কক্ষপথ আর পৃথিবীর কক্ষপথ আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আর পনের দিন পরেই ইকারাস পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গতকাল শেষ রাত্রিতে কাঞ্চনজঙ্ঘার মানমন্দিরে সদাজাগ্রত বৈজ্ঞানিকদের দূরবীনে ইকারাসের পৃথিবীর-দিকে-এগিয়ে-আসা মূর্তি ধরা পড়েছে। তাঁরা তখুনি ব্যাপারটি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য কি করবেন আমরা পরে তা আপনাদের জানিয়ে দেব।"

আকাশবাণীর খবর শেষ হ'ল। সেই খবর শুনে দুই বৈজ্ঞানিক হতবাক্। হতবাক্ পৃথিবীবাসী। তবে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বিচলিত হলেন না। তাঁরা সব দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের এক বিশেষ সভা আহ্বান করলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মানমন্দিরে। রকেট-প্লেনে

চেপে বৈজ্ঞানিকেরা এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজির হলেন সভায়। সভার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন মানসী রায়। বাঙলার মেয়ে মানসী রায়ের নেতৃত্বে আরম্ভ হ'ল পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মহাসভা।

মহাসভার উদ্বোধন করে ডঃ মানসী রায় বললেন: "পৃথিবীর এখন খুব খারাপ সময়। আমাদের আগেকার বৈজ্ঞানিকেরা যে আশঙ্কা একদা করেছিলেন, সেই ভয়াবহ সম্ভাবনা আজ বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। পৃথিবীর পথের দিকে এগিয়ে আসছে ইকারাস। দশ হাজার মিলিয়ন টন ওজনের এই গ্রহটি যদি পৃথিবীর ওপরে আছড়ে পড়ে তবে কি হবে জানেন? ওর গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে, ইকারাস পৃথিবীর স্থলভাগে না পড়ে জলভাগের ওপর, অর্থাৎ মহাসমুদ্রের মধ্যেই পড়বে। ফলে, সে যে জায়গায় পড়বে সেই জায়গা থেকে পর্বত প্রমাণ ঢেউএর সৃষ্টি হবে। সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে সাত সমুদ্রে। সেই সাত সমুদ্রের জল তখন তাদের উপকূল ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়ে এসে ঢুকবে গ্রামে, বন্দরে, নগরে। ঐ সঙ্গে আরম্ভ হবে ভূমিকম্প অর্থাৎ প্রলয়। যদি স্থলভাগে পড়ে, তবে কিহবে? ইকারাস যদি পৃথিবীর মাটিতে হুড়মুড় করে পড়ে তবে যেখানে পড়বে সেখানে এমন একটি গর্তের সৃষ্টি হবে যা হবে প্রায় চার কিলোমিটার গভীর এবং অন্ততঃ কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার চওড়া। শুধু কি এই? এই পতনের ফলে যে ঝাপ্টার সৃষ্টি হবে সেই ঝাপ্টার থাপ্পড়ে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশের (যার ব্যাস আনুমানিক দু'শো কিলোমিটারের কম নয়) যাবতীয় গাছপালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি সব চুরমার হয়ে যাবে। এই অবস্থায় বাঁচতে হলে পৃথিবীর দিকে আসার পথেই ইকারাসের গতিরোধ করা দরকার। এখন, আপনারাই বলুন, কি ভাবে তার গতিরোধ করা সম্ভব?"

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "পারমাণবিক বোমা দিয়ে পৃথিবীর পথে আসবার আগেই ওকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া আবশ্যক।"

আর এক বৈজ্ঞানিক বললেন, "লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে

অবস্থিত এবং লম্বায় আর চওড়ায় এক পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার আকারের এই দুষ্ট গ্রহকে ধ্বংস করবার জন্য চাই নির্ভুল নিশানা এবং অমিত শক্তিশালী পারমাণবিক বিস্ফোরক পদার্থ। আমাদের সেই শক্তি আছে কি?"

আর একজন বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "আমাদের সেই শক্তি আছে। রকেটের মাথায় এই বিস্ফোরক পদার্থ রাখতে হবে। তারপর নিশানা ঠিক করে সেই রকেট ফায়ার করলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই রকেট আছড়ে পড়বে ইকারাসের মধ্যে। ফলে ধুলোর মত না হলেও ক্ষুদে গ্রহটি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়বে। সেই টুক্‌রোগুলির বেশ কয়েকটি পড়বে পৃথিবীর ওপর। কিন্তু তখন আর তা ভয়াবহ থাকবে না, নিরীহ সুন্দর সুন্দর উল্কা-রূপে তখন তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

সভানেত্রী শুনে বললেন, "আর কোন উপায় নেই? এই কি আপনাদের শেষ কথা?"

এবার ডক্টর সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমার মনে হয় আরও একটি পথ আছে। চাঁদ জয় করার আগে গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা নকল উপগ্রহ আকাশে আটকিয়ে ছিলেন। এদের নাম স্পুটনিক ইত্যাদি। পৃথিবী থেকে পদার্থ ছুড়ে যদি আমরা নকল উপগ্রহ আকাশে আটকাতে পারি, তবে আকাশ-থেকে-নেমে-আসা পদার্থকেও আমরা পৃথিবীর উপগ্রহ করতে পারব না কেন? অতএব, আসুন, আমরা সবাই মিলে ইকারাসকে দখল করি। দখল করে চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝপথে ওকে স্থাপন করি। ফলে, পৃথিবীর আকাশে দুই চাঁদ শোভা পাবে। আমাদের আরও চাঁদের দরকার। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য চাই গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন। আমরা চাঁদে উপনিবেশ গড়েছি। ইকারাস যদি দ্বিতীয় চাঁদ হয় তবে সেখানেও আমরা উপনিবেশ গড়বো। ফলে, পৃথিবীর ভার আরও কিছু কমবে। সুতরাং আমি বলবো, ইকারাস উৎপাত হয়ে

আসছে না, সে আসছে আমাদের মঙ্গল করবার জন্য। তাই, আমার বলতে ইচ্ছা করছে,—সুস্বাগতম্‌ ইকারাস, সুস্বাগতম্‌।"

ডক্টর সভাপতির বক্তৃতার পর সভায় ঘন ঘন হর্ষধ্বনি এবং করতালি সুরু হ'ল। তারপর একদল বৈজ্ঞানিক ছুটে এলেন সভাপতির সঙ্গে করমর্দনের জন্য। তাঁরা তাঁর হাতে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে হাতে ব্যথা পেয়ে তিনি যন্ত্রণায় চোখ বুঁজে ফেললেন। যখন চোখ খুললেন তখন দেখলেন যে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরী ঘরে আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন। পাশে দূরবীন!

ডক্টর সভাপতি স্বপ্ন দেখছিলেন। গবেষণা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নে কত কিছু দেখলেন, বললেন! কিন্তু সত্যি, ইকারাস আজও মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে একদিন পৃথিবীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যদি সত্যিই তাই ঘটে, তবে তার সবচেয়ে ভাল সমাধান কি হতে পারে, স্বপ্নের ঘোরেই তিনি তা ঠিক করে ফেলেছেন।

ছড়া

শ্রীতমাল চট্টোপাধ্যায়

আয় রে টুটুন, আয় রে তুতুন,
মেলায় যাবি চল্‌,
মেলায় তোদের গড়িয়ে দেবো
ঝুমকো লতার মল।
লাল টুকটুক কাচপোকা টিপ,
কাণে দোহল্‌ দুল;
মুখ দেখে সব বলবে ভুলে
টাটকা ফোটা ফুল।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

কথা চলছিল মৃত্যু সম্বন্ধে।

গড়গড়া গাঙ্গুলী মশাই বললেন, তবে শোন একটা কাহিনী বলি :

তাঁর কাহিনী শোনবার আগে তাঁকেই জানা প্রয়োজন। গাঙ্গুলী মশাইয়ের বয়স কিঞ্চিদধিক ষাট। হাতে নলহীন একটি মিনি গড়গড়া সদা-সর্বদাই থাকে, তা কলকেতে আগুন থাকুক, চাই নাই থাকুক। যে কোন আলোচনাই হোক না কেন, তিনি ঠিক তাতে ফোড়ন দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কিছু-না-কিছু কাহিনী শোনাবেনই। না শুনলে বা বাধা দিতে গেলে রেগে যাবেন।

এ হেন গড়গড়া গাঙ্গুলী মশাই আরম্ভ করলেন : মৃত্যু সম্বন্ধে যদি বললি, তবে শোন, আমার ভাগ্নে পদার মৃত্যুকাহিনী।

(আমরা চোখেমুখে যথা সম্ভব বেদনা-বেদনা বিষণ্ণ ভাব এনে উদগ্রীব হয়ে শুনতে লাগলাম তাঁর গল্প)

: বুঝলি, আমার ভাগ্নে পদার ছিল অলৌকিক শক্ত নার্ভ। নয়তো অপর যে কোন শর্মাই ওরকম একটা মারাত্মক সংবাদ শুনলে ধ্রুব নিশ্চিত মূর্চ্ছা যেত। সংবাদটা হল : পদার আয়ু নাকি আর সাতটি দিন মাত্র আছে।

হায়, মোটে সাতটি দিন আর রাত্রি সে এই সুন্দর ভুবনে বিচরণ করতে পারবে।

না না, যা তোরা ভাবছিস তা মোটেই নয়। জ্যোতিষি-ফোতিষিতে আমাদের পদার কোন কালেই বিশ্বাস নেই।

এই ভয়াবহ সংবাদ বা অভিমতটি প্রকাশ করেছেন একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ডাক্তার কি ভাবে এই নিদান দিলেন তাই বলি।

শ্রীমান্ পদার স্বাস্থ্য, যাকে বলে আইডিয়াল, ঠিক তাই। কিন্তু কি কুক্ষণেই সে শুনেছিল যে কলকাতার অর্ধেক লোকই নাকি টি. বি রোগাক্রান্ত।

আর এ তথ্য কানে যাওয়া মাত্র মনে হতে লাগল ওর রোজই বিকেলে গা যেন গরম হয় আর সঙ্গে সঙ্গে খুসখুসে কাশি তো আছেই।

অর্থাৎ অবধারিত সেই সব সিম্পটম—খুসখুসে কাসি, ঘুসঘুসে জ্বর, অতএব ফ্ুসফুসে······ আর ভাবতে সাহস পেল না। কালবিলম্ব না করে পদা সোজা এক চেষ্ট-ক্লিনিকে গিয়ে এক্স-রে করিয়ে এল বুকের।

সেখানকার রিপোর্টেই প্রকাশ পেল······আর সাতটি দিন মাত্র এ মর দুনিয়ায় তার মেয়াদ রয়েছে।

এ সংবাদ প্রথম যখন শুনল শ্রীমান্ পদা, অত শক্ত-নার্ভ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, মনে হল ক্লিনিক ঘরের দেয়ালগুলি আপন কক্ষপথে বোঁ-বোঁ করে বার কয়েক যেন পাক খেয়ে গেল···· পরে সামান্য অন্ধকার নেমে এল····এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে ঝিকিমিকি হয়ে জ্বলতে লাগলো সর্ষেফুল সম বিন্দু বিন্দু আলো।

দরজার পাল্লাটা ডান হাতে ধরে ফেলে সে আসন্ন পতন থেকে নিজেকে সামলে নিল।

প্রথম ধাকাই ধাক্কা। তারপর বুঝি সবই সামলে ওঠা যায়। শ্রীমান্ পদাও সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবতে বসল, তাই তো, মাত্র সাতটি দিন আর তার সিনেমা-থিয়েটার-কফিহাউস-ফ্ুটবল-হকি-ক্রিকেট-রকবাজি ও রেস্তোঁরা-ভরা এই পৃথিবীতে আয়ু?

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! ধুস··তাহলে আর লজ্জা-সঙ্কোচ কি জন্যে, আর কার জন্যে?

জীবনে এতাবৎ যতগুলো গোপন ও অসাধু বাসনা এতকাল চাপা ছিল, আজ সেগুলো যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো প্রচণ্ড ভাবে।

ঝট করে রক্ত চড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বেপরোয়া ভাব। মরেঙ্গে তো বটেই, তখন কোন্ ব্যাটাকে আর ভয় বা তোয়াক্কা?

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে পদা উদ্‌ভ্রান্তের মত যথেচ্ছ ভাবে পথ হাঁটতে লাগল। ক্ষ্যাপার মত যাকে-তাকে ধাক্কা দিতে দিতে চললো।

একটা মোড়ে পৌছে ট্র্যাফিক পুলিশের পাশে গিয়ে চট্ করে তার হেলমেটটা খুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল। পরক্ষণেই একটা চলতি বাসে একলাফে উঠে পড়ল।

যাত্রীরা আঁতকে উঠে বলল, ওরকম সাংঘাতিক রিস্ক্ নিয়ে উঠবেন না মশাই, পড়ে মরবেন যে—

পদার মনে মনে হাসি পেল। করুণা হল লোকগুলোর প্রতি। বিজ্ঞের হাসি হেসে সে বলে উঠল, এ তুনিয়ায় কেউ অমর হয়ে আসে নি দাছ! একদিন না একদিন সবাইকে টেঁসে—মানে মরতে হবেই।

বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ভেবে যাত্রীরা চেপে গেল।

অতঃপর টিকিট চাইতে এলে শিখ কণ্ডাক্টরের দাড়ি ধরে আদর করে বললে, টিকিট? কিসের টিকিট দাছ? আমরা স্বাধীন হয়েছি না, স্বাধীন দেশে আবার ভাড়া কি বাবা? বলে, তার ব্যাগটাকে উল্‌টে দিল। অজস্র খুচরো পয়সা চতুর্দিকে ঝন্‌ঝনিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

বাস্-শুদ্ধ সবাই মার-মার করে উঠতেই ঘণ্টি টেনে প্রায় চলন্ত বাস্ থেকে এক লাফে পদা রাস্তায় নেমে পড়ল।

একটি ট্যাক্সি ডেকে বললে, চল ডালহাউসী।

সেখানে গিয়ে যেখানে চাক্‌রী করে সেই সওদাগরী অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল।

অফিসে ঢুকে সটান চলে গেল বাঘা বড় সাহেব মিঃ ফক্সের কেবিনে।

একটা নগণ্য কেরাণী কোন সংবাদ না দিয়েই তার কামরায়

ঢুকল, এই ধরনের অভাবনীয় স্পর্ধা দেখে সাহেবের চোখ প্রথমে ছানাবড়া, তৎপর ক্রোধে জবাফুলের মত রক্তবর্ণ ধারণ করল। সগর্জনে বাজখাঁই-কণ্ঠে বলে উঠল মিঃ ফক্স, হোয়াট দি ডেভিল ডু ইউ মিন বাই দিস? ইউ সো অ্যাণ্ড সো!

পদা অকুতোভয়ে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে, মুখে বিচিত্র কৌতুকের হাসি। অতঃপর বাঘে-গরুতে-জল-খাওয়ানো বাঘা সাহেবের চোখের সামনে তার টেবিল থেকে ফাইলপত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে সেই টেবিলে উঠে বসল।

সেই টেবিলে উঠে বসল।

—আহা, চটছো কেন সাহেব? তোমার নাম যেমন ফক্স, তোমার বুদ্ধিও তো জানি খ্যাঁকশিয়ালের মতই। তবে শোন, তোমায় কত ভালবাসি সাহেব! তাই দুটো প্রাণের কথা বলতে এলাম তোমার সঙ্গে।

—হোয়াট !! বজ্র হুঙ্কারে সাহেব বলে ওঠে, ইউ ইডিয়ট, গেট আউট ফ্রম মাই কেবিন।

—ঝুটমুট রেগে যাচ্ছ সাহেব, আমার ওপর। মুখে তেমনি বিচিত্র কৌতুকহাসি পদার।—রেগে আর বেশি কি হবে বাছাধন? এই বলে সে লাল কালির দোয়াতটি মিঃ ফক্স-এর মাথায় ঢেলে দিল প্রথমে, তারপর মেঝে থেকে বেতের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটি উল্‌টে গাধার টুপীর মত করে সাহেবের মাথায় বসিয়ে দিল।

—হেল্‌প্‌! হেল্‌প্‌! বলে মিঃ ফক্স পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠল।—সেভ মি ফ্রম দিস পাগলা আদমী!

আপিস সুদ্ধ্‌ সবাই ছুটে এল কেবিনের কাছে। কিন্তু পদার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে কেউ আর এগোতে সাহস পেল না।

চিয়ার ইউ বয়েজ্‌! বলে পদা অফিস থেকে মার্চের ভঙ্গীতে পদচালনা করতে করতে বেরিয়ে গেল।

আর কোন্‌ ব্যাটাকে ভয়? ছোঃ, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ··· ? সাত দিন···সাত দিন মাত্র আয়ু তার। চৌরঙ্গীর একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পেট পুরে চপ কাটলেট কালিয়া কোর্মা খেল।···

এর পর কয়েকদিন ধরে সে যা করে বেড়ালো তা আর কহতব্য নয়। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। একটা পাগলা বেপরোয়া ছেলে কলকাতার যত্রতত্র যা-তা করে বেড়াচ্ছে।

পঞ্চম দিন বিকেলে পদা ভাবলো একবার খোঁজ-খবর নেওয়া যাক উক্ত ক্লিনিকের ডাক্তারের কাছে গিয়ে। সঠিক ভাবে আর কত ঘণ্টা সে এই পৃথিবীতে আছে সেটা বুঝে আরও চরম হুলস্থুল করা যাবে।

একটু লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েই যেতে হল এক্স-রে ক্লিনিকে, কেননা এই ক'দিন সে এত রকম নিষ্পাপ (?) আনন্দ ও মজা করে বেড়িয়েছে যে কম করে তার বিরুদ্ধে দেড়শোটি কেস ঝুলছে। বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—গুড আফটারনুন. ডাক্তার বাবু!—হাত তুলে পদা বললে।

ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ এত চমকায় না। দারুণ ভড়কে গিয়ে ডাক্তার বাবু তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হাত দুটি তুলে গুটি গুটি পায়ে পেছু হটতে লাগলেন।

মুখে বেসুরো আওয়াজে বলতে চেষ্টা করলেন, দেখুন, দ-দয়া ক-করে শুনুন, প্লীজ। শুনলাম আপনি নাকি চা-চারদিকে যা-তা মানে—ইয়ে আরম্ভ করেছেন। তবে প্লীজ এখানে ওরকম কিছু করবেন না। দোহাই, শান্ত হোন। আ-আমার কোন দো-দোষ ছিল না। বিশ্বাস করুন।

—আহা, ব্যাপার দেখে পদাও কম ভড়কে গেল না,—আপনি ডাক্তার বাবু—এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি শুধু জানতে এসেছি···।

—মানে, মানে, ডাক্তার বাবু খুবই ভীতকণ্ঠে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন,—ভুলটা, সত্যি বলছি, বিলিভ মি, আমার দ্বারা হয় নি। আমার অ্যাসিষ্টেন্টই সব দেখাশোনা করে কিনা। এক্স-রে প্লেট-গুলো যে এভাবে ওলটপালট হয়ে যাবে তা ভাবতে পারি নি।

—কি বললেন? এক্সে-রে প্লেট ওলটপালট। পদা বিহ্বল ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় এবার।

—কেন, আপনি কি আমাদের এক্সপ্রেস লেটার পান নি?

—না, কোন পত্র পাই নি তো।—অবশ-হওয়া ভাবে পদা বললে।—তা ছাড়া আমি আজ ক'দিন ধরে বাড়ির বাইরে বাস করছি কি না।

—আমি তো ঐ পত্রে আপনাকে সবই সবিস্তারে জানিয়ে দিয়েছি যে ভুল বশতঃ অন্য একজন মারাত্মক রোগীর এক্স-রে প্লেটের রিপোর্ট আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সে লোকটির ফুসফুস প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার লাংস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নীরোগ, মার্ভেলাস, ফাইন।

শ্রীমান পদা বোকার মত একটা ঢোক গিলে কোন মতে বলতে পারলো,—তাহলে ডাক্তার বাবু, আপনি বলছেন আমি শী-শীগ্‌গির মরবো না?

—না না, পদাবাবু, ডেফিনিটলি না। আপনার মত সুস্থ লোক কম করে আরো ৭০। ৮০ বছর বাঁচবেন।—ডাক্তারবাবু ভীতমুখে ম্লান হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলে যান: আমি সত্যিই দুঃখিত, ভেরী সরি। এরকম মারাত্মক ভুলের জন্য আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। মানে—আমার নতুন অ্যাসিষ্টেন্টটার আহাম্মুকীর জন্যেই—

ততক্ষণে পদা রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসলো সে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে,—কিধার যাইয়ে গা বাবুজী?

পদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—জাহান্নামে।

স্মিতহাস্যে কাহিনী শেষ করে গাঙ্গুলী মশায় নিভে-যাওয়া গড়গড়াটায় টান দিলেন।

আমাদের তরুণ আমার কাছে ফিস ফিস করে বললে, এ স্রেফ কোন একটা বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে তৈরী করা গল্প। স্রেফ ভাগ্নে পদার নামে চালিয়ে দিলে।

আমি সভয়ে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিলাম। গাঙ্গুলী মশাই পাছে শুনতে পান। শুনলে কুরুক্ষেত্র হবে।

ডাক

শ্রীশৈলেন দত্ত

হুল্লোড় হৈ হৈ
খেয়াঘাট থৈ থৈ
পাখীদের হৈ চৈ চলছে,
তোলা থাক বই টই
সারাদিন টই টই
আকাশটা মা ভৈঃ বলছে।

আজ কোন ভাবনাই নেই নেই;
দুধ সাদা কাশবন
খুশি খুশি উন্মন
উল্লাস পড়ে তার উপচেই।

সারাদিন মাঠে মাঠে থাকব;
গুণ গুণ অলি হয়ে
কানে কানে কথা কয়ে
শিউলির রেণু গায়ে মাখব।

ভেসে যাক আমাদের ইচ্ছেই;
মাছরাঙা বিলটা
আকাশের নীলটা
সকাল দুপুর শুধু ডাকছেই

রিপোর্টার নাকমামা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী

'যাই বলিস, আমার হীরো কিন্তু গ্রেগ! ইস, একাই খেলল যেন! যেমন ফীল্ডিংএ, তেমনি বলে, আর ব্যাটে তো কথাই নেই। দুটো ইনিংসেই নট-আউট!'

দিল্লী টেস্ট নিয়ে ওদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা চলছে, সামনের টেবিলে খবরের কাগজের খেলার পাতা। অতন্দ্রর কথার উত্তরে তূর্য কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। এ শব্দ ওদের খুব ভাল করেই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে অর্চন এক দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল নাকমামাকে পাকড়াও করে।

নাকমামা ঘরে ঢুকতেই সমবেত কণ্ঠে একটা আওয়াজ উঠল, 'গল্প।'

একটা সোফা টেনে তাতে গদিয়ান হলেন নাকমামা। তারপর চশমাটা মুছে নিয়ে বললেন, 'হবে, হবে। কিন্তু তার আগে শুনি তোদের কী কথা হচ্ছিল?'

'আমরা দিল্লী টেস্ট নিয়ে আলোচনা করছিলুম নাকমামা।' তূর্য বলল, 'এই দেখ, কাগজে কতখানি জায়গা জুড়ে লিখেছে।'

'কবেকার কাগজ ওটা?' খুব গম্ভীর প্রশ্ন নাকমামার।

এ কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। তূর্য বলল, 'তুমি কী গো নাকমামা! কবেকার কাগজ তাও জিজ্ঞাসা করছ? কালই তো টেস্ট খেলা শেষ হল,—জান না, ভারত হেরে গেছে? আজকের কাগজ না হলে কি এ সব খবর থাকে?'

তেমনি গম্ভীর গলায় নাকমামা বললেন, 'খবর অন্তত: এক দিনের পুরোনো না হলে আমি তার উপর নির্ভর করি না।'

'সে কি নাকমামা, পুরোনো খবর আবার কেউ পড়ে নাকি?' তূর্য

বিস্ময় প্রকাশ করে।—'নিশ্চয় কিছু ব্যাপার হয়েছিল যে জন্যে তুমি নতুন খবরের উপর এমন চটা। বল না নাকমামা।'

'ঠিক আন্দাজ করেছিস। কিন্তু সে কোন্ কালের কথা, সব মনেও নেই ভাল করে। একেবারে আমার জীবনের প্রথম দিক্কার ঘটনা—সেই যখন আমি "বার্ত্তাবহ" পত্রিকার স্টেজ রিপোর্টার ছিলুম। কী কারণে সেই চাকরি ছেড়ে দিলুম সেই নিয়েই এই গল্প।'

শ্রোতাদের চোখে-চোখে যে বিদ্যুৎঝলকের বিনিময় হল সেটা যেন দেখেও দেখলেন না নাকমামা। কোন কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে হাতে হাত ঘষে তিনি বললেন, 'গোড়া থেকেই শোন্ তাহলে।

'আমি তখন সবেমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি, আমার নতুন বই "বীর বিক্রম", বলতে কি, বেশ খানিকটা সাড়া জাগিয়েছে সাহিত্যের আসরে। একদিন একটা ছোটখাট সাহিত্য-সভাও হয়ে গেল ষ্টুডেণ্ট হল্-এ "বীর বিক্রম" নিয়ে।

'সভার শেষে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, 'আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি চিনি আপনাকে।' এই বলে ভদ্রলোক আমায় নিয়ে গেলেন বসন্ত কেবিনে।

'চা খেতে খেতে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন: আমার নাম মহিমারঞ্জন ঘোষ, আমি "বার্ত্তাবহ"-র সম্পাদক। আপনাকে আমরা চাই।

'আমি শুরু করলুম—কিন্তু আমি তো—

'জানি। কিন্তু আপনাকে সাংবাদিকের কাজ করতে হবে না, আপনি হবেন আমাদের স্টেজ রিপোর্টার।

'সেকি, আমি তো—

'এবারেও ভদ্রলোক আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। বলে উঠলেন, আরে, কিছু ভাববেন না। কাগজ তো দেখেন,

এই রকম একটা দাঁড় করিয়ে দেবেন যা হোক। মানে, আপনার নামটা আমরা চাই মশাই!

'ভদ্রলোক এমন করে বললেন যে আমি আর না বলতে পারলুম না। তা ছাড়া কাজের অনুপাতে দক্ষিণাটাও বেশ লোভ-নীয়। রাজী হয়ে গেলুম বিশেষ দর না বাড়িয়ে।

'পয়লা জানুয়ারী থেকে কাজে যোগ দেব। ক'টা দিন বিভিন্ন কাগজের স্টেজ রিপোর্ট পড়ে পড়ে মোটামুটি খানিকটা আত্ম-প্রত্যয় হল।

'সে আমার প্রথম দিন। গেছি একটা শো দেখতে। পরদিন তার রিপোর্ট প্রকাশিত হল এবং সম্পাদক মশাই সেই লেখার রীতিমত তারিফ করলেন। বললেন, বাঃ, এই তো চমৎকার হয়েছে! এমনটিই তো চাই! চালিয়ে যান, চালিয়ে যান!

'চালিয়েই যাই। যত চালাই, দেখি তাই এর চেয়ে সোজা কাজ আর কিছু হতে পারে না। আর যাই লিখি ঐ সম্পাদকের পছন্দ। কাগজের নাকি অনেক কাটতি বেড়ে গেছে।

'কেটে গেল অনেক সপ্তাহ। সেদিন অফিসে গিয়ে দেখি, টেবিলের উপর তিনটি কার্ড—অর্থাৎ সেদিন তিনটি নাটক দেখবারই নিমন্ত্রণ। এমন ব্যাপার আগেও হয়েছে। সম্পাদকের নির্দেশে একটা নাটক বেছে নিয়ে কেবল সেইটেই দেখেছি আর বাকিগুলো সম্বন্ধে না দেখেই রিপোর্ট লিখেছি। একটা সুবিধে হয়েছিল, প্রত্যেক শো হাউসের অভিনেতাদের নাম আমার কাছে ছিল; তাই বিশেষ অসুবিধে কখনও হয় নি। সেদিনও করলুম তাই। যে দুটো অভিনয় দেখি নি সে দুটো সম্বন্ধে এমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে রিপোর্ট লিখলুম যে পড়ে নিজেই অবাক্,—সমস্ত অভিনয়টা যেন চমৎকার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পুলকিত হয়ে বাড়ি ফিরলুম এই ভেবে, যে, পরদিন এডিটর মশায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাব।

'ঘুম ভাঙল কাগজওয়ালার বেল্‌এর শব্দে। তড়িঘড়ি গিয়ে

নিয়ে এলুম কাগজটা। সটান খুললুম মঞ্চের পৃষ্ঠাটা। হ্যাঁ, এই তো. পাশাপাশি তিন কলমে দিব্যি ফলাও করে ছাপা তিনটি অভিনয়ের রিপোর্ট।

'কলম বেয়ে চোখ নেমে চলেছে। "অজয়কুমার", "ভাল্লা কা লড়কা।"

'রাজ্যের অন্ধকার আমার চোখে নেমে এলো। যেখানে 'পাগলা ষাঁড়ের ল্যাজে আগুন'-এর বিজ্ঞাপন, তার নীচে—আরে, এ কি! 'ধর শালাকে মোড়ের মাথায়'-এর ফলাও করে রিভিউটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচেই একটা খবর। খুব সংক্ষিপ্ত সে খবর: বিশেষ কারণে 'ধর শালাকে মোড়ের মাথায়'-এর অভিনয় গতকাল অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

স্বাক্ষর

শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ

জীবনের যাত্রাপথ অতিক্রম করি
প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছিলাম,—
মহৎ ও বৃহতের মাঝে
এ-ক্ষুদ্র স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানিনা এ রবে কিংবা
কালস্রোতে হয়ে যাবে লীন
অক্ষম প্রয়াস শুধু শুধিবারে
বরদাত্রী শ্বেতভূজা ঋণ॥

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এক ধরণের লোক আছে যারা নানারূপ টোনাটানা ও তুক্‌তাক্ মন্ত্রে বিশ্বাস করে। আজকাল শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এ সব অন্ধবিশ্বাস কতক দূর হলেও অনেক স্থানেই কিছু-না-কিছু এর প্রভাব রয়ে গেছে। তবে বলা হয় আফ্রিকা এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে 'উইচ ডক্টর'দের ব্ল্যাক্ ম্যাজিকের উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আজ আফ্রিকার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর একটা গল্প বলছি। উইচ ডক্টরকে আমরা বাংলায় ওঝা-বদ্যি-গুণিন্ বলতে পারি।

এ সব উইচ ডক্টরদের একটা শক্তি আছে—তারা কোন জিনিষ হারালে বলে দিতে পারে বা চোরকে সনাক্ত করতে পারে। একবার আফ্রিকার এক বড় শহরে একজন ইংরেজ চিকিৎসক গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে স্থানীয় লোকদের চিকিৎসা করে বেশ সুনাম অর্জন করলেন। একদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন টেবিলের উপর তাঁর মূল্যবান্ হাত-ঘড়িটি নেই। তিনি বহুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ খুঁজলেন, সমস্ত জিনিষ ওলটপালট করলেন, তবু হাতঘড়ি কোথাও পেলেন না।

ডাক্তার তাঁর ঘড়িটি হারিয়ে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন তাঁর এক আফ্রিকান বন্ধু পরামর্শ দিলেন একজন উইচ ডক্টরকে ডাকিয়ে আনতে। সে চোর ধরে দিতে পারবে।

সেই বন্ধুই পাশের গ্রামের একজন নামকরা উইচ ডক্টরকে নিয়ে এলেন। লোকটি খুব সেজেগুজে এল। তার সর্বাঙ্গ নানা রং দিয়ে চিত্রিত, মাথায় ও কোমরে পাখীর পালক গোঁজা। সঙ্গে তার তুকতাকের জন্য এক ঝোলা ভর্তি সরঞ্জাম। সে এসেই যাঁর ঘড়ি হারিয়েছে সেই চিকিৎসকের কাছ থেকে কি হারিয়েছে, কবে হারিয়েছে ইত্যাদি সব বৃত্তান্ত জেনে নিল। তারপর চিকিৎসকের অধীনস্থ ক্যাম্পের সব লোককে ডাকিয়ে এনে গোল করিয়ে দাঁড় করাল। তারপর সে নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে প্রত্যেকটি লোকের দিকে কট্‌মট্‌ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। লোকগুলো সে দৃষ্টির সামনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল, তাদের গলা-বুক শুকিয়ে উঠল, তারা অস্থির ভাবে এক-পা অপর পায়ের উপর তুলে ঘষতে লাগল।

এবারে উইচ ডক্টর তার ঝোলা থেকে নানা রকম জিনিস বের করে খানিকক্ষণ তুক্‌তাক করে নানা মন্ত্র আওড়াতে লাগল। তারপর ঝোলা থেকে একটা শুকনো লাউ বের করল, আর হাতে নিল একমুঠো চূর্ণবস্তু। এবার শুক্‌নো লাউটা বাজাতে বাজাতে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল ও হাতের চূর্ণবস্তু থেকে এক এক চিম্‌টি তুলে প্রত্যেকের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে তার টোনাটানা শেষ করল। দু'দিন পর সে ফের আসবে বলে সে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন দেখা গেল ঐ লোকগুলির মধ্যে একজনের চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে, মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। লোকটা সারারাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে ভোরে এসে চিকিৎসকের হাতে তাঁর হারানো ঘড়িটা তুলে দিয়ে পায়ে পড়ে নানাভাবে তাঁর দয়া ভিক্ষা করতে লাগল।

চিকিৎসক মূল্যবান্ হাতঘড়িটা পেয়ে আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু অপরাধীর মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার চোখ দুটো শুধু রক্তবর্ণ নয়, ফুলে ঢোল হয়ে আছে। আর অনবরত

ঋতু ফুল ও বীথি

জীবন সর্দার

আমার এমন একটি ফুলবাগান দেখার শখ যে বাগানটি শুধু ফুল চেনা আর তার রং দেখার জন্য হবে না, হবে ঋতুচক্র বোঝার জন্য। তার মানে সে বাগানে গিয়ে পথে পথে ঘুরে ফুল গাছ চেনার সাথে সাথে কোন্ কালে কোন্ ফুল ফুটছে তা দেখে ঋতু জানাও হবে। তা কি সম্ভব? কেন নয়! আমাকে যদি এই বাগানের মালীর কাজটি দেওয়া হয় তবে আমি ছ'ঋতুর জন্য ছ'টি পথ ভাগ করে নেব, তারপর এমন ছ'টি দেশী গাছ ঠিক করে নেব যাদের এক-একটি এক এক ঋতুতে তাদের ফুলের জন্য বিখ্যাত।

আমাদের বছর শুরু গ্রীষ্ম ঋতুতে। তখন অমলতাসের পাতা ঝরে যায় আর পুরোনো পাতা ঝরার সাথে সাথে প্রথম ফুলের সোনালী আভায় সারা গাছ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পাতা বড় হয়ে উঠলেও, থোকা থোকা সোনালী ফুলগুলো ঝুলন্ত বোঁটায় ঝাড়ের মত ঝুলবে। বাগানের সে পথটির নাম হবে গ্রীষ্মবীথি, দু'-পাশে অমলতাস। অমলতাসকে যে নামে যে ডাকুক—সোঁদাল, বাঁদর-লাঠি বা কর্ণিকার,—ফুল তার ফুটে উঠবে গরম কালে। কেউ হয়তো বলবে, কেন, পলাশ, জাড়ুল এরা কি দোষ করল? গরম কালে এরাও ফোটে।

বাগানের মালী হিসেবে দেখি বিচার করে: জাড়ুল খুব সুন্দর ফুল। গোলাপী রং। ফুল ঝরার আগে সে রং উবে সাদা হয়ে যায়। গরম কালে জাড়ুল ফুল যেমন ফোটে, বর্ষাতেও আবার তেমনি ফোটে। পলাশ ফুল অবশ্য দু' ঋতুতে ফোটে না। সে ফুলের রংও ঝরার আগে মলিন হয় না। ফুলগুলি হয় কমলা, নয় হলদে—চমৎকার দুটি রং। এ গাছকে গ্রীষ্মকালেও জায়গা দিতে

মালী হিসেবে আমার আপত্তি নেই। বরং পলাশ, অমলতাস, দু-রঙের ফুল থাকলে পথে রং-এর বাহার হবে। এদের কাছেই গাছের নীচে ফাঁকা সবুজ ঘাসের বুকে লাগিয়ে দেব সূর্যমুখীর চারা। যে দেখবে সেই বলবে গ্রীষ্মবীথি নাম সার্থক।

বর্ষাবীথির জন্য কদম। তার চেয়ে ভাল এ ঋতুর জন্য কোন ফুলগাছের নাম মনে করতে পারছি না। কদম ফুলের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি কারণে। নাড়ুর মত কদমের যে ফুলটি আমরা দেখি, আসলে সেটি কয়েকশ' ফুল 'মিলে' একটি গোলক। গোলকের উপর আর একটি সাদা গোলক দেখা দেয় যখন ছোট্ট ফুলগুলির গর্ভকেশর ছাপিয়ে ওঠে ফুলকে। বর্ষাতেই ফুলগুলি ঝরে গেলে শুধু থাকে সবুজ গোলকটি—যেটি এত ফুল এক বৃন্তে ধরে রেখেছিল।

বর্ষাকালের এই পথের দু'পাশে কদম গাছের সার, আর তার পায়ের কাছে থাকবে দোপাটির 'আসন', যাতে নীচের জমি কখনো শূন্য মনে হবে না। দোপাটি যে বর্ষার ফুল, তারও কত রং-এর বাহার! সাদা, লাল, গোলাপী। কি মনে হয়? বর্ষাবীথি দেখে খুশি হবেনা মন?

শরৎকালে কী ফোটে স্থলপদ্ম আর শিউলি ছাড়া? শরৎ-সরণী যদি পথটির নাম হয়, তবে তার দু-পাশে বুনে দেব শিউলি আর স্থলপদ্মের গাছ। পদ্ম ভোর না হতেই ফুটে থাকবে গাছ-ভর। আর শিউলি ফুটতে শুরু করবে সন্ধ্যা থেকে। রাতভর শিউলি ফুটবে, ভোরের আলো ফোটার আগেই গিয়ে দেখব মাটিতে বিছানো ঝরা শিউলি। দু'-একটি পদ্ম বা শিউলি বসন্তেও ফোটে, তা গ্রাহ্যের মধ্যে নয়।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ—তিন ঋতুর তিন ফুলবীথি যেখানে গিয়ে মিশবে সেখানে থাকবে একটি পদ্মপুকুর। জলজ আর একটি ফুল থাকবে সে পুকুরে—শালুক। জলজ এই ফুল দুটি শরৎঋতুর ইঙ্গিত দেয়। পুকুরটি ঐখানে রাখার একটি বিশেষ কারণ আছে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য, সূর্যের আলো বিষুবরেখা থেকে কর্কট-ক্রান্তি, ফের বিষুবরেখায় লম্বভাবে কিরণ দিতে তিনটে ঋতু পার করে। আবার তিনটে ঋতু পার হয় বিষুবরেখা থেকে কর্কটক্রান্তি গিয়ে বিষুবরেখায় ফিরে আসতে। সূর্যকিরণ বাঁকা ভাবে আমাদের এখানে আসে ঐ সময়ে। এই ব্যাপারটির একটি ইঙ্গিত থাকবে পুকুরটির উত্তরের তিনটি পথ, আর দক্ষিণের তিনটি পথ দিয়ে।

সূর্যকিরণ বিষুবরেখা থেকে দক্ষিণে গিয়ে বাঁকা ভাবে যখন আসতে শুরু করবে তখন আমরা পাব বাকি তিনটে ঋতু—হেমন্ত, শীত আর বসন্ত। হেমন্তঋতুর জন্য যে গাছটি আমার মনে রয়েছে তার নাম রক্তকাঞ্চন। কেউ কেউ বলে দেবকাঞ্চন। রক্ত-কাঞ্চন নাম হলে হবে কি? ফুলের রং হয় বেগ্‌নি বা লালচে বেগ্‌নি। লালচে বেগ্‌নিকে অবশ্য রক্তনীল বলতে পারা যায়, গাঢ় গোলাপী বললেও বাধা নেই। রক্তকাঞ্চনের পাঁচটি পাপড়ি সম্পূর্ণ ফুটে গেলে পেছন দিকে বেঁকে যায়। সব কাঞ্চন গাছের পাতা দেখেই খুরের ছাপ বলে মনে হয়। তবে, সব জাতের কাঞ্চন ফুল একটি ঋতুতে ফোটে না।

শীত এসে গেলেও রক্তকাঞ্চন ফুটে থাকে কিছুদিন। তবে, ফুল ঝরা দেখে বোঝা যাবে এখন এ ফুলের ঋতু শেষ। এবার শীত ঋতুর ফুল গাছ চাই শীত সরণীর জন্যে। এ পথের দু'ধারে থাকবে আকাশ নিম।

আকাশ নিম রক্তকাঞ্চনের মত ছোট গাছ নয়। পাঁচতলা বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে যেতে পারে পূর্ণবয়স্ক 'আকাশ নিমের' মাথা। ফুলগুলো ধবধবে সাদা। রাত্রে তার মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ফুল ফুটে ওঠার খানিক বাদেই সেটি ঝরে পড়ে মাটিতে। শিউলির মত নয়, ঐ ফুলের ডাঁটি খুব লম্বা, পাপড়ি ছোট। উঁচু গাছের ডাল থেকে ফুলগুলি যখন খসে পড়ে মনে হয় হিম ঝরছে। কবিগুরু তাই দেখে হয়তো এ গাছের নাম দিয়েছেন হিমঝুরি। কোন কোন হিমঝুরি গাছে আরেক বার ফুল আসে গরম

কালে। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। কেউ যদি আমাকে বলে, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া এরাই শীতের ফুল, হিমঝুরি নয় তাদের আমি বলব, 'ভুল। হিমঝুরি বা আকাশ নিম শীতসরণীতে শীতকালের ফুলগাছ বলেই থাকবে।' মৌসুমী ফুল থাকবে বড় গাছের নীচে। তাতে পথের এবং দুটি গাছেরই শোভা বাড়বে বৈ কমবে না।

হেমন্ত বা শীতের পথের পাশে পাশে একই জাতের গাছ লাগাব বলেছি। বসন্তে, ফুলের থাকে সমারোহ। কত শত গাছে কত বাহারে ফুলের শোভা। মনে হচ্ছে কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি। বসন্ত উৎসবের রং যদি আবিরের লাল রং ধরি, তবে কাজটা সোজা হয়। বসন্তবীথির দুপাশে থাকবে অশোক, অর্জুন, গুলমোহর, লাল ফুলগুলোর সার, তার মাঝে মাঝে শিরীষ আর স্বর্ণচাঁপা। অনবরত লাল ফুলের মাঝে একটু নতুন বর্ণ দেবে শেষের গাছ দুটির ফুল। লালফুলের সব গাছে যখন ফুল আসবে, পাপড়ি ঝরবে তলায়। তা দেখে মনে হবে পথটি যেন আবিরে রাঙানো। বসন্ত উৎসবে মনকে রঙিন করতে এ পথে আসতে হবে সবাইকে।

: বলতে পার :

[২৫১ পৃষ্ঠা দেখ]

উত্তর

১। গুবরে পোকা ২। ধামসা পোকা

৩। ঘুণ পোকা বা কাঠ পোকা ৪। মাকড়সা

৫। কেঁচো ৬। প্রজাপতি

৭। শামুক

সাধে ঘুম ভাঙ্গাই ?

শ্রীঅতীন মজুমদার

বিকট সুরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন বাবু,
তাই না দেখে অবাক্ হ'য়ে ডাকল চাকর হাবু,—
ব্যাপারটা কি ? একটু আগেই ছিলেন জেগে দেখি,
এখন আবার ঘুমিয়ে পড়ে নাকটা ডাকান—এ কি !

বাবু— বাবু— উঠুন উঠুন— শুনুন তো একবার,—
এই না বলে হাবু জুড়ে দিল যে চীৎকার।
তবু বাবুর ভাঙ্গে না ঘুম,— হাবুর হল ভয়,
এই মরেছে, করবে কি সে ?— ভেবেই সারা হয়।

শেষকালে সে কানের কাছে মুখটি নিয়ে তার
বা - বু উ - ঠু - ন -- এই ব'লে যেই ডেকেছে একবার,
ধড়মড়িয়ে উঠেই বাবু চোখ রাঙিয়ে হেঁকে
বলেন,—হতচ্ছাড়া, পাজি—বেরো এখান থেকে।

একেই আমার আসে না ঘুম,—তবু যা'হোক ক'রে
যেই না ঘুমাই,— অম্নি জাগাস, আচ্ছা বেকুব যেরে !
বল্লে হাবু,—এম্নি ক'রে বকেন কেন বাবু ?
আপনি-ই তো' বলেছিলেন, মনে করাস হাবু,

যা ভোলা মন হয়তো আমি ভুলেই যাব খেতে,
বলুন, বলেছিলেন কি না ?—আমার কি দোষ এতে !
এমন ক'রে ডেকে ডেকে সাধে ঘুম ভাঙ্গাই !—
ঘুমের ওষুধ না খেয়ে যে ঘুমোচ্ছিলেন—তাই।

ভবতোষ বাঁড়ুয্যে রোজই গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসেন। আজও এসেছিলেন। বরাত ভাল, আজ একটা বেঞ্চ খালি পেয়ে গেলেন; মাত্র একজন বুড়ো ভদ্রলোক একপাশে বসে আছেন। আড়চোখে একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বাঁড়ুয্যে মশাই অন্য ধারে আরাম করে বসলেন।

তখনও সন্ধ্যে হয়নি, গোধূলি বেলা। জেটিতে নোঙর করা একটা বড় জাহাজে লোকজনের কর্মব্যস্ততা দেখে মনে হয় ওটা আজ-কালের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রা করবে। বাঁড়ুয্যে মশাই অলস কৌতূহলে জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুড়ো ভদ্রলোক একসময় উঠে চলে গেলেন। আবছা অন্ধকারে তার চেহারা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভাল পোষাক পরা একজন যুবক যেন বেশ রাগত ভাবেই বাঁড়ুয্যে মশায়ের গা ঘেঁষে ধপ্ করে বসে পড়ল। ছোকরা যে বেজায় চটেছে তা বাঁড়ুয্যে মশায়ের বুঝতে কষ্ট হল না, কারণ তার ক্রুদ্ধ অথচ অস্পষ্ট স্বগতোক্তিই সে কথা বলে দিচ্ছিল।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের মনে হল যুবকটি যে চটেছে তা সে গোপন করতে চাইছে না বরং যেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চাইছে।

"আপনি খুব চটেছেন মনে হচ্ছে?" ভদ্রতার খাতিরে তিনি বললেন।

যুবকটি যেন এটুকুরই অপেক্ষায় ছিল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের দিকে ফিরে বলল, "আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না। জীবনে এত বোকামি আর কখনও করি নি।"

"কি ব্যাপার?" বাঁড়ুয্যে মশাই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

"ঘণ্টাখানেক আগে আমি হাওড়া স্টেশনে এসেছি, থাকি মেদিনীপুর। প্রত্যেকবার বড়বাজারের মুখে অন্নদা হোটেলে উঠি। এবার সেখানে গিয়ে দেখি হোটেলটা ভেঙ্গে সারানো হচ্ছে। আমার সঙ্গে মালপত্র ছিল, তাই ট্যাক্সি করেছিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারই বলল আমাকে অন্য একটা ভাল হোটেলে নিয়ে যাবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

"হোটেলে মালপত্র রেখে আমি একটু বেরিয়েছিলাম। অনেকদিন পর কলকাতায় এসেছি, এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরব আর একটা সাবান কিনব। হোটেলের সাবানে আমার ঘেন্না করে। সাবান কিনে আমি হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা চলে গেছি, ফিরতে গিয়ে আর রাস্তা ঠাওর করতে পারি না। তখুনি খেয়াল হল, যে হোটেলে উঠেছি তার নামটা তো দেখা হয়নি! বুঝুন আমার অবস্থাটা! কাউকে যে জিজ্ঞেস করব তারও উপায় নেই। আমার টাকাপয়সা, জিনিষপত্র সবই ওই হোটেলে, মাত্র কয়েকটা টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সাবান কেনার পর একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে আবার চপ কাটলেট খেয়েছি, এখন পকেটে মাত্র কয়েকটা আনা পয়সা পড়ে আছে। রাতটা যে কোথাও কাটাব তারও উপায় নেই।"

কাহিনী শেষ করার পর যুবকটি একটু থামল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল তিনি তার কাহিনী

বিশ্বাস করেছেন কিনা, তারপর বলে উঠল, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি মনগড়া কাহিনী আপনাকে বললাম।"

"না, তা ঠিক নয়, তবে আপনার গল্পের দুর্ব্বল দিক্‌টা হ'ল আপনার হাতে কোন সাবান নেই।" বাড়ুয্যে মশাই গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন।

যুবকটি লাফিয়ে উঠে তার প্যাণ্টের পকেট হাতড়াল, তারপর বলল, "আমি নিশ্চয়ই সাবানটা সেই চায়ের দোকানে ফেলে এসছি।" তার গলা দিয়ে যেন তিক্ততা ঝরে পড়ল।

"একই সঙ্গে হোটেল আর সাবান হারানো বড্ড বেশী অসাবধানতার পরিচয়, তাই না?" বাঁড়ুয্যে মশাই মৃদু খোঁচা দিলেন।

যুবকটি কিন্তু কোন জবাব দিল না, ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলে গেল। যেন সাবানের খোঁজেই যাচ্ছে।

বাঁড়ুয্যে মশাই মনে মনে হাসলেন। ছোকরা গল্প ফেঁদেছিল ভাল কিন্তু বুদ্ধি করে যদি একটা সাবান কিনে আনত তবে হয়তো তিনি ওর কাহিনী অবিশ্বাস করতেন না। সামান্য ভুলের জন্য ছোকরার মতলব ভেস্তে গেল।

বাঁড়ুয্যে মশাই বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। বেঞ্চের ওদিক্‌টায় মাটিতে পাৎলা কাগজে মোড়া একটা গায়ে মাখার সাবান পড়ে আছে। যুবকটি মিছে কথা বলে নি, যখন সে বেঞ্চে বেশ রাগমাগ করে ধপ্‌ করে বসেছিল তখনই যেমন করে হোক সাবানটা তার পকেট থেকে পড়ে গেছে।

সাবানটা কুড়িয়ে নিয়ে বাঁড়ুয্যে মশাই যুবকটি যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন। যে ভুল তিনি করেছেন তা শোধরাতে না পারলে নিজের কাছেই তিনি অপরাধী থেকে যাবেন।

এদিক্ ওদিক্ খুঁজে যখন তিনি প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক তখুনি তাঁর নজর পড়ল যুবকটির ওপর। একটা গাড়ির কয়েক হাত

দূরে দাঁড়িয়ে সে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে, যেন গাড়ির আরোহীর কাছে এগুবে কিনা তা মনস্থির করতে পারছে না।

তিনি পেছন থেকে তার কাঁধে হাত দিতেই সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বাঁড়ুয্যে মশাইকে দেখে সে যে মোটেই খুশী হল না তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।

"আপনি যে মিছে কথা বলেন নি তার প্রমাণ আমি পেয়েছি," বাড়ুয্যে মশাই মুখে একটু হাসি টেনে বললেন। "সাবানটা নিশ্চয়ই আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল, আপনি টের পান নি। আপনি চলে যাবার পর আমি ওটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

যুবকটি বেশ আশ্চর্য হয়েই বাঁড়ুয্যে মশায়ের মুখের দিকে তাকাল। যেন ভদ্রলোকের ব্যবহারের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে সে রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

"আমি দুঃখিত," বাঁড়ুয্যে মশাই আবার বললেন, "আপনার সঙ্গে আমি ভাল ব্যবহার করি নি। আপনি এখানে এসে বিপদে পড়েছেন, আমার উচিত আপনাকে সাহায্য করা।"

একটা দশ টাকার নোট যুবকের হাতে তিনি গুঁজে দিলেন আর সেই সঙ্গে দিলেন তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড। "আমার ঠিকানা এই কার্ডে আছে," তিনি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার সুবিধে মত টাকাটা ফেরৎ দেবেন। আর এই নিন আপনার সাবানটা—এটা আর হারাবেন না, আপনার বিপদে বন্ধুর মত কাজ করেছে সাবানটা।" একটু রসিকতা করার লোভ তিনি সামলাতে পারলেন না।

যুবকটির গলা যেন আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল। কোনমতে একটা ধন্যবাদ দিয়ে সে বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঁড়ুয্যে মশাই মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলেন, একজনের উপকারে আসতে পেরেছেন ভেবে তিনি খুব খুশী। যা দিনকাল পড়েছে, কে সাধু আর কে জোচ্চোর বোঝাই দায়। তখুনি বাড়ি ফিরতে তাঁর ইচ্ছে হ'ল না, আর একটু বসে গেলে কেমন হয়?

তিনি আবার সেই বেঞ্চের কাছে ফিরে এলেন। একজন বুড়ো মত লোক নীচু হয়ে কি যেন খুঁজছে। লোকটিকে তিনি চিনতে পারলেন। প্রথম যখন তিনি এসেছিলেন তখন এই বুড়ো ভদ্রলোকই বেঞ্চে বসেছিলেন।

"কিছু হারিয়েছে নাকি ?" ভদ্রতার খাতিরেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ···একটা সাবান," ভদ্রলোক বিমর্ষমুখে জবাব দিলেন, "কোথায় যে ফেললাম··· ।"

বিদেশী গল্পের ছায়ায়।

জান কি

[১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ]

উত্তর

১। ২০৬ খানা। ২। জন বার্‌ডিন, উইলিয়ম শকলী এবং ওয়ালটার ব্যাটেন। ৩। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। ৪। ছাগল ও ভেড়া। খৃঃ পূঃ ৮০৫০ সালে মধ্য ইরাণের অধিবাসীরা যে ছাগল ও ভেড়া পুষত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৫। ম্যালেরিয়া (Mal – খারাপ, Aria – বাতাস। ইটালীর সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল খারাপ বাতাসের জন্য এ জ্বর হয়।) কালাজ্বর (যে জ্বরে রোগী কালো হয়ে যায়)। কোয়াশিওরকর (আফ্রিকার লোকেরা শিশুদের একরকম অপুষ্টির এই নাম দিয়েছিল ; এর অর্থ সেই ব্যায়রাম যা নতুন ছেলে হলে আগের ছেলের হয়ে থাকে)। ৬। টি বি. মানে টিউবারক্যুল ব্যাসিলাস। কাজেই কেউই টি. বি-তে ভোগে না, টি. বি-র প্রকোপে যে অসুখ হয় তাতে ভোগে অর্থাৎ যক্ষ্মায়। ৭। সিগারেটের অনেক দোষ—ফুসফুসে ক্যান্সার রোগ করতে পারে, হৃৎপিণ্ডে করতে পারে করোনারীর ব্যায়রাম, পেটে অগ্নিমান্দ্য, চোখে দৃষ্টিহ্রাস, নাকে ঘ্রাণের হ্রাস, মন হয় একটা নেশার চাকর, আর অযথা পয়সা খরচ তো হয়ই। কাজেই সিগারেট বর্জনীয়। ৮। নিউটন ছিলেন একজন মস্ত বড় ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বের করার জন্যই তাঁর খ্যাতি বেশী। ৯। সম্রাট শেরশাহ, যিনি কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করিয়েছিলেন—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ১০। আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল। ১১। রাজা রামমোহন রায় (উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায়)। ১২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইনি বিধবা বিবাহ আইনসংগত করান। ১৩। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা—এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৪। শিশুসাহিত্য পরিষদ। এঁদের প্রবর্তিত ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক প্রথম পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৮ সালে। ১৫। সতীনাথ ভাদুড়ী, জাগরী উপন্যাসের জন্য।

সর্বনেশে পায়রা

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অনেক—অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম বল্লাল সেন। বিক্রমপুরে ছিল তাঁর রাজ্য। রাজার যেমনি ছিল শক্তি, তেমনি প্রজারা তাঁকে করত ভক্তি। দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে রাজবাড়ী গম্ গম্। দাসীদের পায়ের মল বাজত ঝম্ ঝম্। পুরনারীদের কিঙ্কিনী বাজত কিনিকিনি, রিনিঝিনি, ঠিনিঠিনি। চলত পা ফেলে গা দুলিয়ে। রাণী আসতেন হেলেদুলে।

রাণী বলেন—রাজা, বলি?

রাজা বলেন—বল। কি বলবে বল।

—এমন কাজ কর যাতে সবাই গুণ গায়।

তাই তো, রাজা ভাবেন, এমন কাজ করব যাতে সবাই গুণ গায়।

প্রজার ক্ষেতে ধান আছে
পুকুর তাদের ভরা মাছে।
সবারই মনে সুখ
শুধু—শত্রুর মনে দুখ।

রাণী বলেন—মহারাজ, প্রাণ ভরল। মন ভরল। প্রজার আশীর্ব্বাদ দেবতার আশীর্ব্বাদ। এমন কাজ কর, যাতে শুধু রাজ্যের প্রজা কেন, ভিন দেশ, দূর দেশের প্রজারাও গুণ গায়।

বদ্যি জাতির ছেলে, জাতির কাজ তো কিছু করা চাই। রাজা মেতে উঠলেন, দূত, পুত ছুটল। যত কুলীন, বৈদ্য তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করার চেষ্টা চলল। বৈদ্য-সমাজের যত দোষত্রুটি, যত খুঁত-খাঁত ছিল সব এবার শোধরানো চাই, রাজার আর চেষ্টার ত্রুটি নেই। সারা পূববাংলা ভরে পড়ে গেল ধন্যি ধন্যি।

—মহারাজ, সংবাদ আছে।

—সংবাদ! কি সংবাদ? কার কন্যার বিবাহ? কার ঘরে চাল নেই? কার অন্নাভাব? সাহায্য কি চাও নিয়ে যাও।

—না মহারাজ, তা নয়। বাবা আদম্ অনেক অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছে বিক্রমপুর আক্রমণ করতে।

বীর রাজা বল্লাল, কোমরে বাঁধা তলোয়ার, ঝনঝন করে উঠল। মন্ত্রী-সান্ত্রী বলল রণ—রণ। রাজ্যময় পড়ে গেল হৈ রৈ। দলে দলে জোয়ান এসে দাঁড়াল,—মাথায় বাঁধা পাগড়ী, হাতে ঢাল, কোমরে তলোয়ার। ঘোড়ার ক্ষুরের ধূলায় আকাশ হল কালো, পাশের মানুষ যায় না দেখা ভালো।

রাজা চললেন রাণীর কাছে। যুদ্ধে যাবেন, বিদায় চাই। —রাণী, আমি চল্লাম যুদ্ধে।

—চলি না, আসি। একটু দাঁড়াও দেবতার আশীষ দিই, নিয়ে যাও।

রাজার মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন রাণী দেবতার আশীর্বাদী ফুল।

—জয়ী হয়ে ফিরে এসো।

—দেবতা করেন জয়ী হয়ে ফিরে আসব। কিন্তু রাণী, যদি না জয়ী হই! সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি এই পায়রা, যদি যুদ্ধে হারি, একে উড়িয়ে দেব। যদি পায়রা উড়ে আসে জানবে হার হয়েছে।

কুলমান রক্ষা ক'র।

রাজা একবার চাইলেন প্রাসাদের দিকে, একবার পরিবার-বর্গের পানে। যুদ্ধের কথা বলা যায় না। তবুও রাজা। যুদ্ধ করতেই হবে।

টগবগ টগবগ। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন রাজা।

তলোয়ারের ঝন-ঝন, তীরের শন-শন। ঘোড়ার হ্রেষা রব।

ত্রিভুবন ভরে যায়
নাহি কিছু শোনা যায়।
চারিধারে পড়ে আছে শব।

কে হারে আর কে জেতে! কে বড় আর কে ছোট!

যুদ্ধে রাজার জয় হল।

শত্রুসৈন্যদের হারিয়ে, দেশ থেকে তাড়িয়ে, রাজা ফিরে চললেন দেশে। পথের পর পথ, ঘাটের পর ঘাট, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে রাজা চললেন। সৈন্যদের বললেন, তোমরা এস, আমি আগু হই। রাজা চললেন। যুদ্ধের শ্রম গেছে কম নয়।

টগবগ ছোটে তবু ছোটে হয়।

মাথার উপর খর রোদ, দেহ শ্রান্তক্লান্ত। রাজা টানলেন ঘোড়ার রাশ। সামনে এক পুকুর। টলটল করছে জল। রাজা এসে বসলেন পুকুরের ধারে। পরিষ্কার জল। রাজা ভাবেন যাই; গা ধুয়ে আসি। যেমনি ভাবা অমনি কাজ।

রাজা জলে নামলেন। আঃ, ঠাণ্ডা জল। দেহ শীতল হল।

রাজার সেই পায়রা, রাজা পুকুরপারে রেখে জলে নেমেছেন। ছাড়া পেয়ে সে উড়ে চলল। পায়রা চলল উড়ে।

উড়তে উড়তে উড়তে পায়রা চলল রাজবাড়ীর পানে। রাণীর সখী রাজবাড়ীর ছাদে ছিল। দেখে, উড়ে আসছে রাজার পায়রা।

—সই।

—সই।

—পায়রা যে উড়ে আসে। তবে বোধহয় হয়েছে সর্বনাশ। সই, চল।

দাস-দাসী, পরিজন ঘিরে দাঁড়াল রাণীকে।

—সই বলে দাও জ্বালাক আগুন।

লকলকে আগুন উঠল জ্বলে।

—সই, রাণী! সত্যিই কি আগুনে ঝাঁপ দেবে?

—হ্যাঁ সই! কুলমান রক্ষা করতে হবে। প্রাণটা কি অতই বড়? বিধর্মী এসে মানসম্মান নষ্ট করবে। না বোন, প্রাণ যাক ক্ষতি নেই, তবু রাজার মান, দেশের মান, রাজবাড়ীর মান বিসর্জ্জন দিতে পারব না। পরাধীন হয়ে মরার চেয়ে, এখনও আমি স্বাধীন, এই মরণ-ই ভালো।

—ঠিকই বোন।

সারি সারি সেজে দাঁড়াল রাজবাড়ীর মহিলারা। ঝাঁপ দিল সবাই সেই আগুনে।

ঘোড়া ছুটছে, রাজা ফিরে আসছেন। শব্দ হচ্ছে খট-খট-খট।

রাজা ফিরে আসছেন। কিন্তু কই!

শঙ্খ নাহি বাজে,

পুর নাহি সাজে!

তাই তো এ কি হল! বাতাস যেন কাঁদে, আকাশ যেন কাঁদে।

মনে অমঙ্গল উঁকি মারে।

প্রাসাদে এসে রাজা চমকে ওঠেন অগ্নিকুণ্ড দেখে। আর প্রাসাদশীর্ষে—

বসে সেই পায়রা।

তারপর?

রাজার মনে ভেসে উঠল সব কথা, সেই বিদায়বেলার কথা। খাঁ খাঁ করে উঠল রাজার মন। নেই নেই নেই! কেউ নেই, কিছু নেই। আমি বা কাকে নিয়ে থাকি? কেন থাকি?—

রাজাও ঝাঁপ দিলেন সেই অগ্নিকুণ্ডে।

লক লক করে উঠল আগুনের শিখা। বাতাসে উড়তে লাগল ছাই।*

গল্পটি গৌড়রাজ বল্লাল সেনের নয়। ইনি বিক্রমপুরের বৈদ্য রাজা বল্লাল সেন।

স্পর্শমণি

শ্রীরেণুকা দেবী

পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। টেবিল টেনিস খেলে, বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করে ফিরতে আটটা বেজে যায়। বাড়ীর প্রায় সামনে একটা জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে হিরণ। মাঝখানে একটি ছোট ছেলেকে ধরে মারমুখী দুজন লোক, আশে-পাশে সবাই যেন মজা দেখছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল হিরণ, দেখলো মুখ-নীচু-করা ছেলেটিকে, তারপর লোক দুটির হাত থেকে ছেলেটাকে টেনে এনে বলে—একে মারছো কেন, এ কি, এত বেশ মেরেছো দেখছি।

—ও চোর।—বলে একজন।

—আবার ছেলেটাকে ভাল করে দেখে হিরণ বলে, কি চুরি করেছে? তোমার কিছু চুরি করেছে?

—না, মানে চুরির তালে ঐ খাবারের দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল, ধরা পড়ে গিয়ে এই দিকে পালিয়ে আসে···

—তোমারই দোকান নাকি?

হিরণের জেরা শুনে লোকটা চুপ করে পালিয়ে গেল।

দেখা গেল ছেলেটার পায়ের কাছে একটা পুঁটুলি পড়ে আছে। হিরণ বলে—এটা তোমার? খোল তো দেখি পুঁটুলি? খোলা হলে দেখা গেল, একটা পুরানো প্যান্ট, ছেঁড়া গামছা আর দু'খানা বই। মলিন হয়ে যাওয়া, ইংরাজী-বাংলার প্রথম ভাগ। হিরণ বলে, এগুলো নিশ্চয়ই তোমার নয়, ক্রুদ্ধ ভাবে অন্য লোকটির দিকে তাকিয়ে। ছেলেটার হাত ধরে হিরণ বলে,—এস আমার সঙ্গে।

হিরণের স্পষ্ট কথা শুনে লোকে অবাক্ হয়ে যায়—আর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। হিরণ ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ঢোকে।

হিরণের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে মা বলেন, এ আবার কে? একে কোথা থেকে জোটালি এখন?

বাড়ার সামনে গোলমাল শোন নি? একেই তো চোর বলে সবাই মারছিল—দেখ না কেমন মেরেছে!

—তা বাপু আজকাল কিছুই বলা যায় না—কে যে ভাল আর কে যে চোর…

—না মা! তুমি দেখ ওর মুখ, ও চোর নয়।

—তা তুই আনলি কেন?

—বাঃ, তা না হলে, ওকে তো মেরেই ফেলতো!

মা এগিয়ে এসে দেখেন ভাল করে। বলেন,—তোর নাম কি!

ও কোনমতে বলে—সুবল। দেশ কোথায়, কে আছে এ সব প্রশ্নে চুপ করে থাকে।

হিরণ বলে—ও এখানে থাকুক মা!

মা ছেলের মুখের দিকে একটু তাকান। তারপর, ঠাকুর বৈকুণ্ঠকে ডেকে বলেন—ছেলেটাকে নিয়ে যাও। হাতমুখ ধুতে বল, আর কিছু খেতে দিয়ে তোমাদের ঘরে শুতে দাও।

সকলের ছোট হলেও, বাড়ীতে মা, বাবা, দাদাদের সকলের কাছেই হিরণের ইচ্ছার একটা মূল্য আছে। অত্যন্ত কোমল হৃদয়, অথচ স্বমতে সুদৃঢ় চরিত্রের এই ছেলেটির ইচ্ছাকে তাঁরা অপূর্ণ রাখতেন না। এ ভিন্ন দেখা গিয়েছে, যখনই হিরণ কি পশু, কি মানুষ কাউকে, দুঃখে, বিপদে আশ্রয় দিয়েছে, তারপরই বাড়ীর কারও-না-কারও উন্নতি, কল্যাণজনক কিছু ঘটেছে। আশ্রিত লোকেরা চলে যাবার পরেও তাদের পয়মন্তার ফল ফলেছে। একবার বৃষ্টিতে-ভেজা এক মৃতপ্রায় বেড়াল-ছানাকে আশ্রয় দেয় হিরণ। তারপরই ওর বাবার আশাতীত উন্নতি হল চাকুরীতে। জ্বরে অচৈতন্য বুড়ো ভিখিরিকে বাড়ী এনে সেবা করে ভাল করে হিরণ। ভাল হয়ে সে তার দলে চলে গেল—আর তখনই অফিস থেকে বিদেশ যাবার সুযোগ পেল ওর বড়দাদা জ্যোতি। এমনিই ঘটেছে নানা ভাবে।

পরের দিন দেখা গেল মারের চোটে কান-গলা ফুলে বেশ

জ্বর হয়েছে সুবলের। জ্বর ছেড়ে শরীরটা একটু ভাল হলে, ওকে দেখে বোঝা গেল, ও হিরণের চেয়েও ছোট। বছর-চোদ্দ মতন হবে, আর বেশ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। এদিকে খবর বার হল, দুটো লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে হিরণ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হল হিরণ। আর সুবলের পয়মন্ততার প্রমাণ দিয়ে হিরণের ডাক্তারি-পাশ-করা দাদা কিরণ লণ্ডন যাবার সুযোগ পেয়ে গেল। সকলেই খুব খুশী। আগেকার আশ্রিতদের মত সুবল কিন্তু চলে যায় নি। রোজ হিরণ যখন পড়তে বসে, সুবল এসে বসে কাছে, ওর পড়া শোনে। হিরণের মনে পড়ে ওর পুঁটলিতে পাওয়া বইএর কথা। বলে, তুই পড়বি? সুবলের চোখ দুটো চকচক করে। ওকে পড়াতে আরম্ভ করে হিরণ। দেখা গেল যে অক্ষরগুলো কিছু মনে থাকলেও লিখতে একদম ভুলে গিয়েছে। ওকে লেখাপড়া শেখাবার ফাঁকে ফাঁকে ওর সব কথা জানতে চায় হিরণ। বোঝা গেল ছোটবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়েছে সুবল। আস্তে আস্তে সব জানতে পারে। প্রশ্ন করে—

গাঁয়ের নাম ভুলে গেছিস? বাবার নাম? আর সব?

বাবার নাম দুলাল দাস, কাঠের দোকান ছিল। পিঁড়ি হত, চৌকি হত, বেঞ্চি হত। মা ছিল না, আর নতুন মা আমায় দেখতে পারতো না। ভাল করে খেতে দিত না, আর বোনের জন্যে পাঁউরুটি, বিস্কুট এ সব আনতো ওকে দিত না। তাই ও নতুন মা কোথায় পয়সা রাখে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে পয়সা চুরি করে ওই সব কিনতো। ধরা পড়ে গেলে বাবা খুব মারতো। তারপরে ও পয়সা না নিলেও মিথ্যে দোষ দিয়ে ওকে মার খাওয়াতো ওর নতুন মা। তাই ও একদিন নতুন মার সব পয়সা নিয়ে বাড়ী থেকে পালায়।

—কোথায় গেলি?

মাঝে মাঝে আমার এক মেসো আসতো। জানতাম পাশের গাঁয়ে তার বাড়ী—খুঁজে খুঁজে গেলাম। সব শুনে মেসো রাখলো। তা মাসী ছিল না। আর মেসোর বোন খুব রাগী। মেসো ওকে

পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেয়। মেসোর মুদিখানার দোকান, অবসর সময়ে সেখানে কাজ করাতো। মেসোর ছেলেরা ওকে মারতো, আর বোন ভাল করে খেতে দিত না। তাই ও ক্রমশঃ মেসোর দোকান থেকে পয়সা চুরি করে খাবারের দোকানে খেতো। ধরা পড়ার পর মেসো শুধু বকেছিল কিন্তু অশ্রুরা মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

—কতদিন ছিলি ওখানে? কোথায় গেলি তখন?

—তা দুটো দুর্গাপূজো দেখেছি। ওখান থেকে গেলাম একটা ইষ্টিশানে। সেখানে একটা চায়ের দোকানে কাজ পেলাম। তা মালিক সব দিন মজুরি দিত না, ক্রমশঃ খদ্দের পয়সা দিলে তা থেকে সরাতাম। ধরা পড়ার পরে পালালাম।

—কোথায়? আবার দোকানে?

—না, রেলগাড়ীতে। এক মহিলা আমাকে দেখে, কি কাজ করি, বাড়ীর কাজ করবো শুনে, তেনার বাড়ীতে নিয়ে এল। তা পেট ভরে ভাত দিত না, আর খুব বকতো—কাজ না পারলে। তবু ছিলাম। কিন্তু দেখি ছেলেদের এঁটো ভাত-তরকারি দিচ্ছে, তাই চলে গেলাম।

—কিছু চুরি করিস নি?

—না, দাদাবাবু! ওরা টাকাপয়সা কোথায় রাখতো জানতাম না, নীচের ঘরে আমি থাকতাম।

—ওঃ, তুই বুঝি টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছু চুরি করতিস না?

চুপ করে মাথা হেঁট করে সুবল।

হিরণ ভাবে, তাহলে সুবল চুরি করেছে। তবে সব জায়গায় সেই একই দুঃখ, পেট ভরে খেতে পেত না, স্নেহ-ভালবাসা পেত না। তাই বলে, কি রে, এখানে খেতে পাস তো?

—হ্যাঁ দাদাবাবু। মা, বৈকুণ্ঠদা খুব যত্ন করে খেতে দেন।

—তা এখান থেকে পালাবি কবে?

হিরণের দিকে মুখ তোলে, ভাবটা যেন কেন পালাব?

—তা পালায় নি। আই. এ পাশ করে বি. এ পাস করেছে হিরণ, আর এই চার বছরে ক্লাস নাইন স্ট্যাণ্ডার্ডে পড়ছে সুবল।

এম. এ পড়ছে হিরণ, এমন সময় দুমাসের জন্য বম্বে থেকে কলকাতা অফিসে এলেন হিরণের ছোট মামা।

বাড়ীর ছেলের মতন আছে সুবল, নিজের পড়াশোনা করে, হিরণের পড়ার টেবিল গুছিয়ে দেয়, বাড়ীর সব ঘড়িতে দম দেয়, টেবিল ক্যালেণ্ডার ঠিক করে রাখে। মার সঙ্গে কালীবাড়ী বা মন্দিরে, দোকানে যায়। শুধু হিরণ বলেছে, ওর হাতে কোন টাকাপয়সা দিও না। কিছু না ভেবেই মা বলেছেন, সুবল, হিরুর টেবিল গুছোবার সময় মামাবাবুর টেবিলটাও একটু গুছিয়ে রাখিস। টেবিল ঝেড়ে, ক্যালেণ্ডারের তারিখ ঠিক করতে গিয়ে, সুবল দেখে টেবিলের ওপর মামাবাবুর ব্যাগ-ভরতি টাকাপয়সা। আবার দেখে হয়তো, কোটের ভিতরেও টাকার ব্যাগ। টাকা দেখেই কেমন আনমনা হয় সুবল। কিন্তু একমাসও তখন হয় নি, একদিন দেখা গেল সুবল নেই আর মামাবাবুর টাকার ব্যাগও নেই। সুবলের জামা, বই সবই পড়ে আছে। খোঁজ—খোঁজ। এত বড় সহরে শুধু সুবল দাস বলে কাকে পাওয়া যাবে? এতদিন আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ওর একটা ফটো তোলানও হয় নি। মাত্র একশো সাতাশ টাকা আর বাইশ পয়সা নিয়ে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল। এমনটা ভাবা যায় নি যেন।

এম. এ পাশ করে, আই. এ. এস পরীক্ষায় পাশ করে মুসৌরি ট্রেনিং শেষ করে বাড়ী এসেছে হিরণ। এক হিরণ ছাড়া সুবলের কথা আর কেউ ভাবে না। হঠাৎ একদিন চিৎপুর থানা থেকে ফোন এল —সুবল দাস বলে একজনকে চুরির দায়ে ধরা হয়েছে। সে বারে বারে মিনতি করে এই নম্বরে জানাতে বলছে—আপনি কি একে জানেন?

হ্যাঁ, আমিই হিরণ্ময় চৌধুরী! ওকে খুব জানি, ও চোর নয়। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। একজন বন্ধুকে নিয়ে হিরণ থানায় গেল। তারপর অনেক বলে-কয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনল। অবশ্য সুবল চুরি করেছে—প্রমাণ ছিল না।

আবার ওকে বাড়ীতে আনলো হিরণ, কিন্তু মামার টাকা চুরির কথা কিছুই বললো না। সুবল বল্ল, সে একটা হোটেলে কাজ করতো। অন্য কাজের লোকের সঙ্গে এক হয়ে চুরিটা সুবল করেছিল, কিন্তু টাকা তাদের হাতেই দেয়, আর ওরা তাকে ভাগ না দিয়ে মালিককে জানায় যে সেই টাকা নিয়েছে।

এর পরেই হিরণের পোষ্টিংএর খবর এল। চাকুরীর স্থলে যাবার সময় সুবলকে নিয়ে এল হিরণ। এসে একটা অদ্ভুত কাজ করলো এবার। বাবা যে টাকা দিয়েছিলেন, নিজের মাইনের টাকা—সবই সুবলের হাতে দিল। সব খরচ সুবল করে। খাওয়া-দাওয়া, ইনসিওর প্রিমিয়াম, ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া, এমন কি নিজের হাত খরচ পর্য্যন্ত। বলে আমার ব্যাগে দেখ কত আছে। কম থাকে তো আর পাঁচটা দে। কি হল সুবলের। যে টাকাপয়সা অন্যের দখলে থেকে ওকে চুরি করার লোভ দেখাতো, সেই টাকাপয়সা সবই তার আছে। একটা হিসাব পর্য্যন্ত চায় না ছোড়দাবাবু। ভাগ্যিস, সেদিন থানায় তার মনে হয়েছিল ছোড়দাবাবুর কথা। সে যেন জানতো, হিরণ তাকে বাঁচাবেই। হিরণও বুঝতে পারে সুবলের এই পরিবর্ত্তন। তাই বলে, এইবার বই পত্তর নিয়ে বস। কিছু মনে আছে? না সব ভুলেছিস?

এখানে তেমন কোন কাজই নেই সুবলের। তাই বই নিয়েই বসে আর দু'বছর পরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। দ্বিতীয় বিভাগে পাশও করে। এখনও হিরণের সব টাকাপয়সা, খরচ, হিসাব—সব সুবলের হাতে। নিজের জন্য চুরি করার লোভ তার সত্যিই লোপ পেয়েছে। এরপর হিরণ চেষ্টা করে ওকে একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করে দেয়। শিডিউল্ড কাষ্ট বলে অসুবিধাও কিছু হয় নি। আরও পড়তে বলে। ক্রমশঃ বি. এ পাশ করলো সুবল। তার ইচ্ছা হিরণ চেষ্টা করে ওকে একটা অফিসের চাকরী দিক।

যে হিরণ ওকে কোন দিন কিছু বলে নি, না উপদেশ, না বকুনি, এমন কি কোনও সান্ত্বনাও দেয় নি, সেই হিরণ ওকে কাছে

ডেকে বলে—বি. টি. পড় চাকরী করতে করতে, আর শিক্ষকতা নিয়েই থাক। পিঠের ওপর হাত রেখে বলে,—নিজে কোন অবস্থা থেকে এই মহৎ পথে এসেছিস ভুলে যাস নে। এই তোর সবচেয়ে ভাল পথ। এতে কত ছেলেকে কাছে পাবি। যারা ভাল, তারা নিজেরাই ভাল। তোর ব্রত হোক যারা মন্দ, যারা বিপথগামী, যারা কোন স্নেহ-ভালবাসা পায় নি, তাদের আপন করা, ভাল করা। তাদের জীবন সফল করে আনন্দে ভরিয়ে তোল, তুই নিজেও আনন্দ পাবি।

তাই শিরোধার্য্য করে নিয়েছে সুবল। সেই তেইশ বছর বয়সে স্কুল ফাইনাল পাশ করবার পর আরো পনেরো বছর গিয়েছে। বি. টি পাশ করে এম. এ. পাশ করেছে সুবল। আর ছাত্রদলকে জীবনের সঙ্গী করে বড় আনন্দ পেয়েছে। সার্থক হয়েছে সে। নিজের কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে হিরণের কথা। নিজের চাকরীতে উন্নতির শিখরে উঠেছে হিরণ! আজই কাগজে দেখেছে, বিশেষ পদ নিয়ে ভারতের বাইরে যাচ্ছে হিরণ।

স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে কেবল মনে হচ্ছে ক্লাসে পড়ানো কবিগুরুর স্পর্শমণি কবিতার লাইন দুটি—"লোহার মাদুলী দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি ছুঁতে নাহি ছুঁতে।" একখণ্ড পাথরই কি কেবল স্পর্শমণি যা লোহাকে সোনা করে?

না, মানুষের হৃদয়ও আছে ওই পরশ পাথরের মত, যা সত্যিই পারে কলুষকে পবিত্র করতে, পাপীকে পুণ্যবান্ করতে আর ঘৃণ্য চোরকে সৎ করে, মহৎ কাজে সার্থক করে তুলতে। ওই ছোড়দাবাবু— হিরন্ময় চৌধুরির স্পর্শেই তাঁর কলঙ্কিত জীবন এমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ঠিক খাঁটি সোনার মত। হিরণই তার স্পর্শমণি।

অন্ধকারের গল্প

শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী

না ভাই, সত্যি বলছি, একদম বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না আর। সমস্ত পৃথিবীটা দারুণ বিশ্রী লাগছে আমার। যা দেখেছি আর যা শুনেছি তারপর আর খামাখা বেঁচে থেকে কি লাভ? যা দেখেছি, মনে হলে, এখনও আমার কানের পাশের চুলগুলি ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে; আর যা শুনেছি, তা মনে হলে, এখনও সেই কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দেয় হুড়হুড় করে।

অথচ আমার কি দোষ? ওই বটকেষ্ট আর দোলগোবিন্দ! আমাদের কেলাশের একচল্লিশটা ছেলের মধ্যে যাদের আমি সবচেয়ে পছন্দ করি, যাদের সঙ্গে ঘুমোনোর সময় ছাড়া সব সময়ে একসঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে—তারাই তো! বটকেষ্ট বললে: ভাই আশুতোষ, দোলগোবিন্দর পিস্তুতো দাদার বিয়েতে যাবি?

একটুও হ্যাংলাপানা না করে বললাম: কোথায়?

পাশে দাঁড়ানো দোলগোবিন্দ বললে: বেহালায়—তের নম্বর বাসে গিয়ে তারপরে—

বটকেষ্ট বললে: তারপরে একটু হাঁটতে হবে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম: না ভাই, বেহালা বড্ড দূর। অত রাতে বাড়ী ফিরলে মেজমামা আবার, বুঝলি কিনা—

দোলগোবিন্দ বেশ জোর দিয়ে বললে: চল চল কিস্যু হবে না। পিসেমশাই কেষ্টনগরের পোষ্টাপিসে বড় চাকরী করেন, ছেলের বিয়েতে হাঁড়ি করে করে সরভাজা এনেছেন।

ভারী রাগ হল কথাটা শুনে। ইস, সরভাজা শুনে যেন গলে গেলাম আর কি! ইচ্ছে হল তক্ষুণি বলে দি কিছুতেই যাব না। কিন্তু দোলগোবিন্দের পিসেমশাইর কথা ভেবে একটু কষ্ট

হল। আহা, ও বেচারী ভদ্রলোকের কি দোষ? ঠিক হল আমি আর বটকেষ্ট আর দোলগোবিন্দ একসঙ্গে যাব বেহালায়।

আর বিপদ্ সুরু হল তখন থেকেই। খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা মিটিয়ে যখন উঠলাম তখন বটকেষ্টর ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে বারোটা বেজে কাঁটাটা আরও একটু এগিয়ে গেছে। ট্রাম, বাস কখন বন্ধ হয়ে গেছে আর রিক্সার পয়সা কি পকেটে কখনো থাকে নাকি? এখন এত রাত্রে ভরপেট খেয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে ভেবে আমার কেমন কান্না পেতে লাগল, কেন এসেছিলাম ছাই! আর রাস্তায় নেমে তো আমাদের প্রায় ভিরমী খাওয়ার জোগাড়। একি সর্বনাশ! এত ঘুটঘুটে অন্ধকার কোথা থেকে এল? আকাশে আজ চাঁদ নেই কেন একটুও? দোল-গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্ করে বলল: দেখেছিস, রাস্তায় কোন আলো জ্বেলে দেয় নি।

বটকেষ্ট বলল: চোরেরা চুরি করে নেবে বলে পাড়ার ছেলেরা বোধ হয় বাল্‌বগুলি খুলে রেখেছে।···মাঝে মাঝে কোনো জেগে-থাকা বাড়ির জানলা গলিয়ে একটু-আধটু আলো গড়িয়ে পড়ছে রাস্তায় আবছা-আবছা নক্সা কেটে। কি হবে ওটুকু আলোয় এই জমাট পিচের মত অন্ধকারে? দোলগোবিন্দ যদি ওর সাদা শার্টটা না পড়ে আসতো আমি কিছুতেই জানতে পারতাম না ও আমার এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আর কথাটা বললাম না। কিন্তু সাবাস বটকেষ্টকে! ও না থাকলে আমরা সেখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তাম। ও-ই বলল: চল্, বাড়ী তো যেতেই হবে, হাত ধরাধরি করে এগোই বরং। কতটুকু আর রাস্তা, দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব। তোর মেজমামা জানতেও পারবে না, বুঝলি আশুতোষ?

ভেবে দেখলাম বটকেষ্ট ঠিকই বলেছে। যেতে যখন হবেই, আর দেরী করে লাভ কি তবে?

এই সব ভেবে-টেবে আমরা রাস্তায় নামলাম।···ভয়ে ভয়ে

পা টিপে টিপে চলেছি হাত ধরাধরি করে, অন্ধকার আর অমাবস্যা রাত্রে, আমি আর বটকেষ্ট আর দোলগোবিন্দ ছায়াছায়া ভূতের মত। ছোট রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়লাম, তারপরে আবার একটা ছোট রাস্তায়—উঃ, বটকেষ্ট না থাকলে কি যে হত!

সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর তেমন ভয় লাগছে না, আর অন্ধকারের মধ্যেও যেন মনে হচ্ছে কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি; বুঝতে পারছি কোন্ পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। আমাদের পাড়ার কাছাকাছি যে এসে পড়েছি বুঝলাম জনার্দ্দন ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গ্যাসের আলোটা দেখে। কি যে ভাল লাগলো! আমরা তিনজনেই আবছা অন্ধকারে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে খুশী-খুশী মুখে হাসলাম।

আমাদের পাড়াটা কলকাতার মধ্যে হলেও কেমন যেন গেঁয়ো-গেঁয়ো গোছের। দশ মিনিট পা চালিয়ে হাঁটলে পরে বাস ধরা যাবে, ট্রাম ধরতে হলে আরও বেশী। মাঝে মাঝে আমাদের মনেই হয় না যে কলকাতাতে আছি। যাই হোক, পাড়ায় যখন ঢুকে পড়েছি তখন আর ভয় কিসের? হেদায়েতুল্লা লেন দিয়ে চলেছি, কষ্ট করে আর একটু হাঁটলেই প্রথমে পড়বে আমার বাড়ী। এমন সময়—

এমন সময় আর কিছুই নয়—

আমাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ালে কোণাকুণি যে দোতলার বাড়ীটার কিছু কিছু দেখা যায়, যে বাড়ীটায় কোনদিন কোনও ভাড়াটে এসেছে বলে মনে পড়ে না কারুরই, সে বাড়ীটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো হঠাৎ। যে ভুতুড়ে বাড়ীটা একা একা দাঁড়িয়ে থেকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে আর ইঁট বের করে আর সবুজ শ্যাওলা জমিয়ে যেন জুজুর মত দাঁড়িয়ে আছে অনেক—অনেক দিন থেকে, সেই বাড়ীটায় যেন মনে হল দেখলাম টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে, আর আমাদের হাতছানি দিয়ে

ডাকছে। তিনজনেই আমরা ভয়ানক চমকে উঠলাম—এ আবার কি কাণ্ড। খালি বাড়ীতে আলো জ্বালিয়ে রেখে ভয় দেখানো আমাদের? না আর কিছু হতে পারে? আমার গাটা, সত্যি বলছি, বেশ ছম ছম করে উঠলো। বটকেষ্ট—ও চিরদিনই ভয়ানক গোঁয়ার, বলল: হুঁ, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। ডাকাতটাকাত নয় তো?

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'কি দরকার আমাদের মাথা গলিয়ে। তার চেয়ে চল, বাড়ী যাই ভাই বটু!' বটকেষ্ট কঠোর ভাবে বললো, না, তা হয় না আশুতোষ।······তারপর পা টিপে টিপে আমরা সেই ভাঙ্গা বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ালাম, আমি আর বটকেষ্ট আর দোলগোবিন্দ,—তারপর কাঁচ-ভাঙ্গা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমি দেখলাম ঘর ভর্ত্তি সব সিংহের মত চেহারার এক একটা জোয়ান—তারা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে আর মাঝে মাঝে বিড়ি খাচ্ছে। মাঝখানে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে দুটো লণ্ঠন। দোলগোবিন্দ হঠাৎ আমাকে কনুয়ের গুঁতো দিয়ে ঘরের এককোণে কি যেন দেখালো। তাকিয়ে দেখলাম লাল কাপড়ের উপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—"নিখিল ভারত চোর সম্মেলন"। অন্য সময় হলে আমি নিশ্চয়ই হো হো করে হেসে উঠতাম, কিন্তু এখন কেন জানি হাসি এলো না, শুধু বুকের নীচটা একটু গুড়্ গুড়্ করে উঠলো। লক্ষ্য করে দেখলাম একটা লোক ছাড়া সবাই মেঝের উপর বসে আছে। যে লোকটা টুলের উপর বসেছিল, দেখলাম সে একটা গোলাপী রং এর হাতকাটা গেঞ্জীও গায়ে দিয়েছে। বুঝলাম আজ সেই সভাপতি। সভাপতি মশায় আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকাতে ওঁর চেহারা আমরা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের যদিও ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল সভাপতির চেহারাটা একবার দেখবার, না জানি

কি ভীষণ হবে! (এখন ভাবি অতটা কৌতূহল না দেখালেই হ'ত তখন—দোষ তো আসলে আমাদেরই।)

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সব গোলমাল ফিসফাস একেবারে থেমে গেল। সর্বনাশ! ওরা ঠিক আমাদের দেখতে পেয়েছে। নিশ্চয়ই? নিশ্চয়ই!! ভয়ে আমার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—আর দুটো হাঁটুতে বেশ জোরে জোরে ঠোকাঠুকি সুরু হল। বটকেষ্টর উপর দারুণ রাগ হতে লাগলো। ওঃ, ওরা কি আমাদের ছেড়ে দেবে এরপর? পুলিশের লোক ভেবে হয়তো আজই রাত্রে খুন করে পুঁতে রেখে দেবে। তারপর, উঃ আর ভাবতে পারি না ⋯...কিন্তু কই, ওসব তো কিছু হচ্ছে না! ও, বুঝলাম এতক্ষণে। এবার সভাপতি মশায়ের বক্তৃতা হবে। টুল ছেড়ে সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মিটমিটে আলোতেও এবার আমরা ওর মুখ স্পষ্ট দেখলাম। সেই মুখ দেখে আমার মনে হল আমি বুঝি এক্ষুণি মরে যাবো। ওঃ, কি সাংঘাতিক—কি সাংঘাতিক সে মুখ! অ্যাতো ভয়ঙ্কর তা তো আশা করি নি! এ রকম চেহারা হবে লোকটার (তা হোক না চোরের সর্দ্দার!) তা স্বপ্নেও ভাবি নি। হা ভগবান্! দুহাতে চোখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে বল্লাম—'শেষে এই দেখতে হল বটু? চল ভাই শীগগির বাড়ী চল—বড় ভয় করছে আমার—'। ওরাও ভয়ানক ভয় পেয়েছিল। পাবেই তো! আর কোন কথা না বলে আমরা চুপ-চাপ যে যার বাড়ীতে চলে এলাম।

বাড়ী ফিরে আমার কি হল কে জানে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে কেবলই চোরের সভাপতির মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর আমি ভয়ে বিছানায় উঠে বসি। অন্যদিন আমার ঘুম ভাঙ্গে বেলা আটটায়—আজ সাড়ে সাতটার মধ্যেই উঠে পড়লাম। বাড়ীর সকলে ভয়ানক অবাক্ হল, কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না। কি বা হবে বলে!

বই নিয়ে পড়তে বসলাম রোজ যে রকম করি। কিন্তু পড়ায় কি আর ছাই মন বসে? যে কাণ্ড হয়ে গেল রাতে!

দশটার সময়ে ইস্কুলে যাবার জন্য ভাল করে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে খেতে বসলাম। ভাতের থালার সামনে বসে আমার বমি আসতে লাগলো। চুপ করে বসে ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

ঠাকুর বলল: ও কি দাদাবাবু! কিছু খাচ্ছেন না কেন?

তাড়াতাড়ি ডাল মাখতে মাখতে বললাম: এই যে খাচ্ছি।

ঠাকুর একটু চুপ করে থেকে আবার বললো: রান্না ভাল হয়নি দাদাবাবু?

ভাত, ডাল, ঢ্যাঁড়সের তরকারী, মাছ-পাতুড়ি, অম্বল—কত কষ্ট করে রাঁধলুম—

: রান্না খুব চমৎকার হয়েছে ঠাকুর।

: আজ কি তবে ইস্কুলে পরীক্ষা দাদাবাবু?

: না।

ঠাকুর এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল: তবে কি ইস্কুলের মাইনে খরচ করে ফেলেছেন সেবারের মতো!

: না, তাও না।

: তবে আমার কি কোন দোষ হয়েছে দাদাবাবু? স্নেহের সুরে ঠাকুর বললো।

সত্যি এবার আমার চোখে জল এল। শার্টের হাতায় চোখ দুটো মুছে নিয়ে জোর করে একগ্রাস ভাত চিবুতে চিবুতে বললাম: শোন ঠাকুর, বড় বিপদ্ হয়েছে। কাল রাত্তিরে আমি হঠাৎ চোরেদেরএক সভায় গিয়ে পড়েছিলাম,—বুঝেছ?

চোরেদের সভায়? ভয়ানক অবাক্ হয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল: বলেন কি দাদাবাবু? কি সাংঘাতিক! চোরেদের সভায়?

—'হ্যাঁ ঠাকুর, চোরেদের সভায়। গভীর রাত্রিতে আমি আর বটুবাবু আর দোলুবাবু।'

দেখলাম ঠাকুরও বেশ ভয় পেয়েছে, মাছের ঝোল পাতে দিতে না দিতে বলল, 'তারপর?'

'তারপর?' কঠোর ভাবে আমি তাকালাম ঠাকুরের দিকে, একটু ইতস্তত: করে আস্তে আস্তে বললাম, 'তারপর সেখানে দেখলাম, তুমি, হ্যাঁ ঠাকুর, তুমিই তাদের সভাপতি!'

শক্তি

শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

টাটকা সব্জি, তাজা শ্বেতসার, আমিষ খাদ্য নানা,
খাঁটী দুধ ঘি ও মাখনে যেমন স্বাস্থ্যের সঞ্চার;—
অভ্রান্ত এ-সত্যটা আছে সার্বজনীন জানা,
তেমনি শক্তি মেলে এ-জীবনে—আশ্রয়ে সত্তার।

খাদ্যের গুণ প্রমাণিত দেহে বিজ্ঞান অভিমতে,
মনে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি মেলে পুষ্টির ফল; —
মানবজীবন করে নির্ভীক্ বিপদপূর্ণ পথে,
মহাবিজ্ঞানী পরমেশ্বর দেন নৈতিক বল।

যেমন ফসল মেলে ঠিক সার-শ্রম-নিয়মের ফলে,
কর্মনিষ্ঠা-সাধনায় যথা সব সাফল্য রাজে,—
তেমনি হৃদয়ে সত্তায়-পাওয়া নিজ নৈতিক বলে
পরমানন্দে বেঁচে থাকা যায় প্রতিকূলতার মাঝে।

দেহের শক্তি প্রথমেই বটে, প্রকৃত শক্তি মনে,—
দেহ হ'তে মন বড়ো জানাটাই মানুষের পরিচয়।
জীবনের যত সুখ-দুঃখের হাস্য বা ক্রন্দনে
ভুলেও কখনো ছাড়িতে চেয়ো না সত্তার আশ্রয়।

মহুয়ার কান্না

শ্রীভবানীপ্রসাদ দে

অমলদের কলকাতার বাড়ীর বাগানে একটা মহুয়া গাছ আছে। বছর চল্লিশ আগে অমলের দাতু যখন সাঁওতাল পরগণায় ফরেষ্ট রেঞ্জার ছিলেন, তখন একবার ছুটিতে কলকতায় আসার সময় একটা মহুয়ার চারা এনে বাগানে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই চারাটা এখন বেশ বড়সড় হয়েছে। বসন্তকালে যখন সেই গাছটাতে স্তবকে স্তবকে হলুদ ফুল ফোটে, তখন মহুয়ার মন-মাতানো গন্ধে অমলদের সারা বাড়ীটা মৌ মৌ করতে থাকে। দাতুর মুখে সে শুনেছে প্রতি বছর বসন্তকাল আসতে না আসতেই সাঁওতাল পরগণার বনভূমিতে অগুণতি মহুয়া গাছের ডালে ডালে হলুদের জোয়ার আসে। তখন সেখানে উৎসব শুরু হয়ে যায়। পূর্ণিমা চাঁদের রূপোলী আলোয় প্রতি মহুয়াবীথিতে সাঁওতালী নাচের আসর জমে ওঠে। অমল কল্পনায় অনুমান করে নেয় সাঁওতালী নাচের সে অপরূপ দৃশ্য। আর সেই নাচের সঙ্গে যে মাদল বাজে, তার ডিম্ ডিম্ ধ্বনিটুকুও যেন তার কানে বাজতে থাকে।

অমলের দাতুর এখন বেশ বয়স হয়েছে। বাড়ীর গাড়ী করে মাসান্তে একবার সরকারী দপ্তরে পেনসনের টাকা আনতে যাওয়া আর মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে কি লেকে হাওয়া খেতে যাওয়া ছাড়া তিনি বাড়ীর বাইরে বড় একটা কোথাও যান না। মাঝে মাঝে তিনি অমলকে তাঁর ছেলেবেলার নানান গল্প বলেন,—শহর থেকে অনেক দূরে রূপাই নদীর পাড়ে ছবিরমত সুন্দর তাঁদের গ্রামের কথা, বাল্যসাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে কাপড়ের কোঁচাতে বাঁধা মুড়ি খেতে খেতে ভিন্ গাঁয়ের পাঠশালায় পড়তে যাওয়ার কথা, লোকালয়ের বাইরে চুক্‌নী বুড়ীর পোড়ো ভিটেতে চড়ুইভাতি করতে যাওয়ার কথা, আরো কত কি! তাঁর বড় দুঃখ, তিনি হয়তো আর কখনও এসব

দেখতে যেতে পারবেন না। কালেভদ্রে দু'-একজন লোক গ্রাম থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে!

অমলের মনে হয় তাদের বাগানের মহুয়া গাছটা দাদুর মতই দুঃখী। তার আত্মীয়পরিজন সব্বাই রয়েছে সুদূর ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণার বনভূমিতে, আর সে বেচারী একাকী চিরকালের জন্যে এখানে বন্দী। এ তো খুব সত্যি কথা, সারা কলকাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আর একটা মহুয়া গাছের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অমল বইতে পড়েছে মানুষদের মত গাছেরা তাদের নানান অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে। বনে বনে যখন ফুল ফোটে, গাছেরা তাদের সেই আনন্দের দিনে মৌমাছি আর প্রজাপতি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এনে মধু খাওয়ায়। এক ধরণের লতাগাছ আছে, মানুষের ছোঁয়া পেলে যাদের নাকি লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়ে। তাই সে একদিন দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা দাদু, মহুয়া গাছটা ওর নিজের দেশের কেউ এলে খুব খুশী হবে, না?"

দাদু বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই হবে।"

একদিন মহুয়ার দেশের লোক আর তাদের নাচ দেখার সুযোগ হয়ে গেল অমলের, কলকাতায় বসেই। পুরোনো লয়েড্‌স ব্যাংকের উল্টোদিকে গড়ের মাঠে যেখানটায় ক'টা গাছ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাঠুরেদের হাত এড়িয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে প্রতি শনিবার বিকেলে মুক্তমেলার আসর বসে। এই আসরে কবিরা স্বরচিত কবিতা পড়েন, গায়করা গান শোনান। গাছের গায়ে নিজেদের আঁকা ছবি টাঙিয়ে শিল্পীরা বসান প্রদর্শনী। একদিন খবর পাওয়া গেল মুক্তমেলায় সাঁওতালী নাচ দেখাতে আসছে সাঁওতাল পরগণার একদল নাচিয়ে। অমলের দাদু গাড়ী করে অমলকে নিয়ে নাচ দেখতে গেলেন, সেই সঙ্গে গড়ের মাঠের হাওয়াও খাওয়া যাবে।

সাঁওতালী নাচের আসরে দর্শক নেহাৎ কম জমে নি। যেটুকু জায়গা জুড়ে নাচ হচ্ছিল, তার চারদিকে গোল করে ঘিরে বসেছিলেন সবাই; যাঁরা পিছনের দিকে ছিলেন তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিলেন। অমল বসেছিল তাদের গাড়ীর বনেটের উপর। তার ঠিক সামনে দাঁড়ানো তারই সমবয়সী একটা ছেলে; বার বার পায়ের উপর উঁচু হয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে আর সেই জন্যে অমল নাচিয়েদের ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। শেষটায় সে বিরক্ত হয়ে ছেলেটাকে বলল, এই যে ভাই, চুপটি করে দাঁড়িয়ে নাচ দেখো না। এত নড়াচড়া করছ কেন?"

ছেলেটা তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার রং কালোপানা, চেহারাটা বেশ সুঠাম, আর মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। ছেলেটা একটু সপ্রতিভ হেসে গড়ের মাঠ ছাড়িয়ে অফিসপাড়ার উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর আরও পিছনে যেখানে হাওড়া ব্রীজের একটা চূড়া ধোঁয়াটে মেঘের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল, সেইদিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ওটা হাওড়া পোল?"

অমল দাছুর কাছে অনেকবার শুনেছে সাঁওতালরা কেমন টেনে টেনে বাংলা বলে আর তাই শুনে সে অনেক হাসাহাসিও করেছে। ছেলেটার কথায় ঠিক তেমনি সাঁওতালী টান,—নিশ্চয়ই মহুয়ার দেশের লোক। নিমেষে অমলের বিরক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল।—"ও, মা তুমি দেখছি হাওড়া ব্রীজ চেন না! কলকাতায় নতুন এসেছ বুঝি?"

ছেলেটি বলল, সে সাঁওতালী নাচের দলের সঙ্গে কলকাতা দেখতে এসেছে। অমল তাকে হাত ধরে গাড়ীর বনেটের উপর বসিয়ে বলল, "এখান থেকে হাওড়া ব্রীজ আর একটু ভাল দেখা যাবে। তোমার নাম কি ভাই?"

ছেলেটি আগের মতই একমুখ হেসে বলল, "আমার নাম? আমার নাম মংলু।"

মুক্তমেলার সেই নাচের আসরে মংলুর সঙ্গেই অমলের আলাপ

জমে গেল। না না,—মংলুর মত সাঁওতালী ছেলেরা আর লেংটি পরে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে জঙ্গলে খরগোস আর পাখীদের পিছু ধাওয়া করে না। বনবাসীদের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার জন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সেখানে যত্রতত্র মিশন খুলে বসেছেন। এই রকম একটি মিশনের স্কুলে পড়ে মংলু। অমলের মতই জামাজুতো পরে, বই খাতা নিয়ে সে রোজ সকালে স্কুলে যায়।

কথায় কথায় অমল তাকে বলতে ভুলল না তাদের বাগানের মহুয়া গাছটার কথা, তার রাশি রাশি চোখ জুড়ান সুগন্ধি ফুলের কথা। অমলের বড় সাধ, বড় হয়ে সে একবার বসন্তকালে সাঁওতাল পরগণায় মহুয়া ফুলের মেলা দেখতে যাবে। সব শুনে মংলু বলল, "তোমার একদম পছন্দ নেই দেখছি! ও রকম মহুয়া গাছ আমাদের ওখানে পথে-ঘাটে কতই ছড়িয়ে আছে, এতে দেখার কি আছে? হ্যাঁ, ফুল ফোটে আমাদের মিশনের বাগানে।—ডালিয়া, ক্রিসানথিমাম, সান ফ্লাওয়ার, টিউলিপ—আরও কত রকমের রঙীন মরসুমী ফুল! তাদের সঙ্গে কটকটে হলদে মহুয়া ফুলের তুলনা হয় কখনো?"

দু'জনের মধ্যে আরও কিছু কথাবার্ত্তা হলেও অমলের আর ভালো লাগছিল না। নাচ শেষ হতে মংলু বলল, "চলি ভাই! নইলে আবার দলের লোকেরা খুঁজবে।" এই বলে সে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অমল গাড়ীর বনেটের উপর চুপ করে বসে রইল। এতদিন তার মনের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার একটা সুন্দর ছবি আঁকা ছিল, মংলু তাতে এক দোয়াত কালি উল্টে দিয়ে গিয়েছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ না হলেই ভালো ছিল।

পরদিন, কেন কে জানে, খুব সকালে তার ঘুম ভেঙে গেল। তখনও বাড়ীর আর কেউ ওঠেন নি। বিছানা ছেড়ে ছোট ছোট পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে ধীরে ধীরে বাগানে এসে থামল সে। তার সরল এক-জোড়া চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি সেই মহুয়া গাছটার দিকে। মহুয়া গাছের চওড়া পাতার

গা বেয়ে তখনও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে টপ্-টপ্ করে,—অমলের ছোট বোনটি যখন অঝোরে কাঁদে তখন তার নরম কচি গাল বেয়ে যেমন করে জলের ধারা বয়, ঠিক তেমনি করে। হয়তো রোজই এমনটা হয়, কিন্তু এর আগে কোনদিন অমলের চোখে পড়ে নি। সে আবার আস্তে আস্তে বারান্দা পার হয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। দাদু উঠলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, গাছেরা কি কাঁদতে জানে ?

করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া
করা কভু নাহি হয় ;
করনীয় যাহা, আজ কর তাহা,
বিলম্ব উচিত নয়।
যে চাষা আলস্য ভরে, বীজ না বপন করে,
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায় ?

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

আচ্ছা ফ্যাসাদ

শ্রীজয়দেব রায়

তুরানের এক শহরে করিম বলে এক দর্জি বাস করত। দর্জি বড় ভাল লোক ছিল, আর তার হাতও ছিল বেশ দোরস্ত। তাই শহরের সব আমীর-ওমরাহ্‌দের বাড়ি ছিল তার বাঁধা, তাদের কাজ-কর্ম সব সে-ই করত। বাড়িতে তার ছেলেপিলে ছিল না, সে আর তার বউ। করিম আর তার বউ দুজনেই গানবাজনা খুব ভালবাসত।

গায়কগায়িকাদের বাড়িতে ডেকে তারা তাকে বেশ করে খানা খাওয়াত, আর গানবাজনা শুনত। এমনি একদিন করিম শুনল তাদের শহরে বোগ্‌দাদ থেকে এক কুঁজো গায়ক এসেছে। সে নাকি খুব ভাল গান গায়।

করিম একদিন রাতে কুঁজোকে তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করল। কুঁজো এলে তার বউ তাড়াতাড়ি করিম ও কুঁজোর জন্যে আসন পেতে জল ঢেলে থালা সাজিয়ে দিল—মাছভাজা, কাতলা মাছের কালিয়া, মাছের পোলাও চাটনি এইসব।

কুঁজোর রাত হয়ে যাচ্ছে বলে সে একটু তাড়াতাড়ি খাচ্ছিল। খেতে খেতে করিম জিজ্ঞাসা করল,—ভাই, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কুঁজোর গলায় মস্ত একটা কাঁটা বিঁধে গেল। কাসতে কাসতে তার দম বন্ধ হয়ে গেল। চোখ কপালে উঠে গেল—হাঁপাতে হাঁপাতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

করিম আর তার বউ মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করে তাকে সুস্থ করতে পারল না। বুকে হাত দিয়ে দেখে শব্দ হচ্ছে না। নাকে হাত দিয়ে দেখে নিশ্বাস পড়ছে না। ভয়ে তো তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। এই বিদেশী লোকটাকে মারবার দায়ে তাদের ফাঁসি না হয়!

করিমের বউ খুব বুদ্ধিমতী। সে বলল—কুঁজো যে আমাদের বাড়ীতে এসেছে তা তো কেউ জানে না। এক কাজ করি—সামনে ঐ হাকিমের বাড়ি, ওকে চলো, ফেলে রেখে আসি।

তখন বেশ রাত হয়েছে। পথে লোকজনও নেই। তারা দুজনে কুঁজোকে ধরাধরি করে হাকিমের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগল—হাকিম সাহেব, হাকিম সাহেব, বাড়ি আছেন কি?

করিমের বউ খুব বুদ্ধিমতী

হাকিম সাহেব তখন ঘুমোচ্ছিল। তার বাড়ির বান্দা ভি থেকে বলল—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

সে চলে যেতেই করিম আর তার বউ দরজাটা ঠেলে ভিতরে সিঁড়ির মুখে কুঁজোকে বসিয়ে রেখে চুপি চুপি পালিয়ে এল।

বান্দা গিয়ে হাকিমকে খবর দিতেই হাকিম ব্যস্ত হয়ে বিছানা

থেকে উঠে বসল। সে ছিল যেমন কৃপণ, তেমনই লোভী। খরচের ভয়ে আলো জ্বালত না, আর রোগীদের কাছ থেকে নানা ভাবে বেগ দিয়ে পয়সা আদায় করত। এই সব ভেবে আলো না জ্বেলে ছুটতে ছুটতে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। আর পা ফসকে পড়বি তো পড় কুঁজোর ঘাড়ে। কুঁজোর লাসও গড়িয়ে পড়ে গেল। পেছন পেছন বান্দা আলো নিয়ে আসছিল। হাকিম ব্যস্ত হয়ে কুঁজোর নাড়ি দেখে সিঁড়িতেই বসে পড়ল—আরে, কি সর্বনাশ হ'ল! রোগী ত আমার ধাক্কা খেয়েই মরে গেল! এখন কি হবে? তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা কর।

বান্দা চালাক লোক, সে বলল—হুজুর, এক কাজ করি আসুন। কেউ তো এখনও জানতে পারে নি। দুজনে মিলে লাসটাকে পাশের ঐ মুদির দোকানে ফেলে দিই, চলুন। রাত্রিতে দোকানে লোক থাকে না, আর আমাদের ছাদের দিকে দোকানের একটা জানালাও খোলা আছে।

হাকিম বলল—কিন্তু রোগীর আত্মীয়রা এলে কি বলবি?

বান্দা বলল—বলব যে, হাকিম সাহেবের এক দাগ ওষুধ খেয়ে তোমার লোক একেবারে চাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। তারপর লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে গিয়েছে।

এই বলে তারা দুজনে কুঁজোর লাসকে চ্যাঙদোলা ক'রে নিয়ে গিয়ে মুদির দোকানের মধ্যে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নামিয়ে দিল।

মুদি দোকানের পাশের ঘরে থাকে। সেদিন রাতে তার কোথায় নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়াদাওয়া সারতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে তার হঠাৎ মনে হল—আরে, তাই তো! পাশের বাড়ির দিকে জানালাটা বোধ হয় বন্ধ করে যাই নি। যা চোরের উপদ্রব! দেখি একবার দোকানটা খুলে। দোকান খুলতেই তার চোখে পড়ল কোণের দিকে একটা লোক বসে আছে ঘাপটি মেরে। মুদির মনে হল এই ব্যাটা চোরই বোধ হয় প্রতিদিন আমার দোকানে চুরি করতে ঢোকে।

সে একটা পেল্লায় লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে পেছন থেকে ু্ঁজোর মাথায় মারল এক বেদম ঘা। আর অমনি ঢলে পড়ল গর লাস। গায়ে হাত দিয়ে মুদি দেখল একবারে কনকনে ঠাণ্ডা!

মুদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—অ্যাঁ! তবে কি আমি চারটাকে মেরে ফেললাম নাকি? তা হলে তো আমার ফাঁসী হবে।

সে আর সময় নষ্ট না ক'রে লাসটাকে কাঁধে তুলে রাস্তায় পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

এক মাষ্টার মশাই বাড়ি ফিরছিল অনেক রাতে। সারাদিন ছেলে ঠেঙিয়ে আর শাসন করে খুব ক্লান্ত। তারপর এক ভোজবাড়ি গিয়ে একটু সরাপ খাওয়ায় নেশা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় তার সঙ্গে পাঁচিলে-ঠেস-দেওয়া লাসের ধাক্কা, সেটা তার গায়ে গড়িয়ে পড়েছে।

মাষ্টার মশাই তাকে গুণ্ডা ভেবে খুব মার দিচ্ছে—আর চিৎকার করছে—গুণ্ডায় আমাকে মারল—মারল।

চারদিক্ থেকে লোকজন সব ছুটে এসেছে। সিপাই এসে দেখে—কুঁজো মরে পড়ে আছে আর মাষ্টার তাকে বেদম মারছে।

সিপাই তাকে গ্রেপ্তার করে কাজীর দরবারে নিয়ে গেল। কাজীর বিচার—অত খোঁজ-খবর নেই। সাক্ষীরা একবাক্যে বলল—আমরা স্বচক্ষে দেখেছি মাষ্টার লোকটাকে মারছে।

কাজী বলল—মাষ্টারের ফাঁসি।

তারপর কুঁজোর লাস দেখে তো কাজী চমকে উঠেছে—আরে এ যে খলিফার খাস ভাঁড় খোন্দকার!

ব্যস্ত হয়ে সুলতানকে কাজী খবর দিল। সুলতানও তাড়াতাড়ি এসে হাজির। তিনি কুঁজোর অবস্থা দেখে কেঁদেই অস্থির, তাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তারপর ঢেঁড়া দিয়ে দিতে বললেন বাজারের মধ্যে মাস্টারের ফাঁসি হবে। সবাই এসে দেখুন সুলতানের প্রিয়পাত্রকে মারলে কেমন শাস্তি হয়।

বাজারের মধ্যে একজন লোকের ফাঁসি হচ্ছে শুনে মজা দেখতে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল। করিম দর্জি, মুদি, হাকিম-সবাই মজা দেখতে এসেছে।

কুঁজোর লাসটাও সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে।

মাষ্টারের গলায় জল্লাদ দড়ি চাপাচ্ছে, এমন সময়ে মুদি আর থাকতে পারল না। একজন নিরীহ লোক তার অপরাধের জন্যে প্রাণ দিতে যাচ্ছে! এ জন্মে না-হয় সে ছাড়া পেল, কিন্তু আল্লার কাছে সে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেবে?

সে হাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে গিয়ে স্থলতানকে বলল— হুজুর, মাস্টার সাহেব নির্দোষ। ভাঁড় সাহেবকে আমিই মেরেছি। আমার মুদিখানার মধ্যে তিনি কি জন্যে ঢুকেছিলেন জানি না। চোর ভেবে আমি ওর মাথায় লাঠি মারি ...।

স্থলতান বললেন—মাস্টারকে ছেড়ে দিয়ে ঐ মুদি ব্যাটাকে ফাঁসিতে ঝোলাও।

মুদিকে টানতে টানতে সিপাইরা নিয়ে যাচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে হাকিমও ছিল। তার কান্না শুনে হাকিমের অনুশোচনা হল—তাই তো, লোকটাকে আসলে মারলাম আমি, আর বেচারা মুদির প্রাণ যাচ্ছে। ওর বাড়িতে বউ-ছেলে মেয়ে, বাপ-মা সবাই আছে, ও মারা গেলে তারাও নিশ্চয়ই না খেতে পেয়ে মারা পড়বে।

সে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল—হুজুর, লোকটাকে [আ]মিই খুন করেছি। আমারই ফাঁসি দিন।

স্থলতান বললেন,—তাই নাকি? তাহলে মুদিকে ছেড়ে দিয়ে [হা]কিমকে ফাঁসি দাও।

করিম দর্জিও ভিড়ের মধ্যে ছিল। বুড়ো হাকিমের দাড়ি ধরে সিপাইরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সে-ও আর থাকতে পারল না। দু হাত দিয়ে লোক সরাতে সরাতে সে ছুটে এসে স্থলতানকে কুর্নিশ করে বলল—হুজুর, হাকিম সাহেব খুনী ন'ন, আমিই খুনী।

—এই বলে সে সমস্ত কথা খুলে বলল।

কাজী বলল—এবার তাহলে আসল অপরাধীকে পাওয়া গিয়েছে, দাও, ওকেই তাহলে ফাঁসিতে ঝোলাও।

সুলতান হাত তুলে বারণ করলেন—না, না। যা শুনলাম তাতে বোঝা যাচ্ছে আমার ভাঁড়কে দর্জি ইচ্ছা করে খুন করেনি। দৈব-ক্রমে তার মৃত্যু হয়েছে গলায় কাঁটা বিঁধে। দাও, ওকে ছেড়েই দাও।

ভিড়ের মধ্যে এক নাপিত ছিল, সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল হুজুর আমার যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে। এতক্ষণ কুঁজো মারা গিয়েছে, কিন্তু লাস তো পচে নি, খাসা আছে।

এই বলে নাপিত এগিয়ে গিয়ে কুঁজোর গলায় হাত ঢুকিয়ে কাঁটা বের করে দিল। আর কি আশ্চর্য! কুঁজো দিব্যি বেচে উঠে বসল।

তারপর চারদিকে তাকিয়ে পাশেই করিমকে দেখে হেসে বলল,—ভাই, চাটনিটা খাসা বানিয়েছে। তারপর আর সব খানা কই?

মন্ত্র শক্তি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মিঃ নরম্যান একজন বিখ্যাত শিকারী। দীর্ঘ দিন তিনি আফ্রিকার বন জঙ্গলে কাটিয়েছেন। আফ্রিকায় এমন কোন প্রদেশ নেই তিনি শিকার করতে যান নি। জীবনে তিনি পাঁচশো সিংহ, তিনশো হাতি মেরেছেন। নেকড়ের তো কথাই নেই। তা ছাড়া ছোটখাটো শিকার করেছেন অজস্র।

এই নরম্যান নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনার কথা বলেছেন। যেমন বিস্ময় কর, তেমনি ভয়ঙ্কর। তাঁর মতন লোকের মুখের কথা বলেই কথাটা বিশ্বাস হয়।

"একবার এক শিকার পার্টি নিয়ে আমি ভিক্টোরিয়া লেকের এন্টিবি বন্দরে আস্তানা গাড়ি। জায়গাটা এমন সুন্দর, ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না। স্থির করলাম এ অঞ্চলে কিছু দিন থাকব আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে, আদীবাসীরা দল বেঁধে আসতে লাগল। তাদের শোভা যাত্রা দেখবার মত। দলের যারা অগ্রগামী লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি গলায় ঝুলিয়ে ঢোলকের মত বাজাতে বাজাতে আসছে। এদের পেছনে মেয়েরা। সকলেই অল্প বয়স্ক। সংখ্যায় কম হলেও একশো। মেয়েদের কোমরে শুধু চামড়ার সাজ. তাও হাঁটু পর্য্যন্ত। উপরে কোন আবরণ নেই। মুখে বুকে উল্কি। এরা পায় ঘুঙুর পরে না। পরে কোমরে। এরা এসে আমাদের নাচ দেখালো। অপূর্ব নাচ! এদের নাচ শেষ হতেই পুরুষের দল ছুটে এলো বর্শা হাতে। মনে হলো রমণীদের আক্রমণ করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে আর এক দল পুরুষ এগিয়ে এলো ওদের বাধা দিতে। তুমুল বাদ্য বেজে উঠলো। শুরু হয়ে গেল নৃত্যযুদ্ধ। সে এক দেখবার মত। নৃত্য শেষ হতেই ওদের মোটা টাকা বকশিস দিলাম।

"যে কয়েকদিন ছিলাম বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল। কেউ আসছিল জিনিষ পত্র বিক্রি করতে। কেউ আসতো চাকরী পাবার আশায়। এর মধ্যে একটি লোক প্রায়ই আসতো। লোকটা বেজায় জোয়ান, লম্বায় সাতফুট। গলায় মানুষের হাড়ের মালা। মাথায় পাখীর পালকের টুপী। কোমরে স্কার্টের মত চামড়ার সাজ। সারা গায়ে উল্কি। ওকে দেখতাম প্রায়ই তাঁবুর চারিধারে ঘুরতে কিন্তু লোকটা একদিনও এসে আমার সঙ্গে দেখা করে নি। লোকটাকে কেমন যেন লাগলো।

"এক দিন বাবুর্চিকে ডেকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, লোকটি কে, কি চায় ও ?

"বাবুর্চি বলল, লোকটা মস্তবড় গুণীন। ও মন্ত্র দিয়ে হিংস্র পশু জলের কুমির বশ করতে পারে। ও আসে কোন হিংস্র পশু এসে যেন আপনাদের ক্ষতি করে না যায়।

"বাবুর্চির কথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। আফ্রিকায় পা দিয়েই এধরনের অনেক আজগুবি গল্প শুনেছি। তাই বাবুর্চির কথা বিশ্বাস করতে পারি নি। বাবুর্চি লজ্জিত হয়ে, ফিরে গেলো। মনে হল, আমার ব্যবহারে ও মনে দুঃখ পেয়েছে। একদিন বাবুর্চিকে দিয়ে জাদুকরকে ডেকে পাঠালাম।

"লোকটা এলো আমার সামনে। এমন বিরাট পুরুষ আমি দেখি নি। চোখ দুটি দেখলাম অস্বাভাবিক উজ্বল।

"বললাম বাবুর্চির মুখে শুনলাম, তুমি বনের হিংস্র পশু, জলের কুমির নাকি বশ কর। আমার কিন্তু এ সব কথা বিশ্বাস হয় না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করাতে পার, তোমাকে আমি প্রচুর টাকা বকসিস্ দেব। কেমন রাজি? আমার উদ্দেশ্য ছিল লোকটাকে বেকুব বানান, আর বাবুর্চির বিশ্বাস ভাঙ্গানো।

কিন্তু লোকটা এক কথায় রাজি হয়ে গেলো। বলল কবে দেখতে চান হুজুর ?

বললাম, আজ দেখাতে পার ?

লোকটা বলল, নিশ্চয়! কিন্তু কিছু মাংস ও মাছ যে আমার চাই হুজুর। আমি কুমিরের খেলা দেখাব।

লোকটাকে নিয়ে বাজরে গেলাম। দশসের মাংস. পাঁচসের মাছ কিনে আমরা লেকের ধারে এসে দাঁড়ালাম। জাদুকার হন্ হন্ করে জলের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পাড়ে অপেক্ষা করছি!

লোকটা জলের ধারে দাঁড়িয়ে অনবরত অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছে। আর মাছ ছুঁড়ছে। পাঁচ মিনিট পর বিরাট এক কুমীর ভূস করে উঠলো। লোকটাকে দেখে সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে আসতে লাগলো। কুমির দেখে আমি বন্দুক রেডি করে রাখলাম যদি কুমির লোকটাকে নেয়, তবেই গুলি করব। একটু পরেই কুমিরটা জল ছেড়ে পাড়ে উঠে এলো। লোকটার সামনে এসে বিরাট হাঁ করলো। দেখে তো আমারা ভয়ে মরি। গুলি করব কিনা তাই ভাবছি। এমন সময় লোকটা মাছের ঝুড়ির সব কটাই মাছ কুমিরটার মুখে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমির মুখ বন্ধ করলো। আর জাদুকর কুমিরটার পিঠে উঠে বসলো। এবার কুমিরটা সুবোধ বালকের মত জাদুকরকে নিয়ে লেকের জলে নেমে গেলো। জাদুকর তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে রইল। কুমির লেকের জলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে জাদুকরকে নিয়ে ডাঙ্গায় ফিরে এলো। জাদুকর তার পিঠ থেকে নেমে মাংসের ঝুড়িটা তুলে ধরলো। কুমির আবার হাঁ করলো। জাদুকর ঝুড়ির সব মাংসগুলো কুমিরের মুখে ঢেলে দিলো। কুমির মাংস খেয়ে জলে নেমে গেলো। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। জাদুকর উপরে এলে, তাকে একশ শিলিং পুরস্কার দিলাম। সেও খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলো। আমরাও তাঁবুতে ফিরলাম।

স্বপন বুড়োর কৈশোর স্মৃতি

স্বপনবুড়ো

আমরা যখন কলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে পড়তাম তখন তারই কাছাকাছি একটা হোস্টেলে আমরা থাকতাম। সকলেই হবু শিল্পী, তাই দিনগুলি সেই ভাবেই কাটছিল। এরই মধ্যে একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

আর্ট স্কুল বোর্ডিং এ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারো পেন্সিল নেই, কেউ রবার খুঁজে পাচ্ছে না, কারো ছোট্ট কাঁচিটা উধাও।

ছেলেরা ভাবে, এ ত' মহা মুস্কিলে পড়া গেল। এই ছোট-ছোট দরকারী জিনিসগুলি যায় কোথায়?

একদিন একটি ছেলে হদিশ দিলে—এ হচ্ছে চতুর্ভুজের কাণ্ড। চার হাতে ও আমাদের দরকারী জিনিস সরাচ্ছে। চতুর্ভুজ হোস্টেলের এজমালি ভৃত্য!

কিন্তু শুধু মুখে অভিযোগ উত্থাপন করলেই ত' হবে না,—প্রমাণ চাই।

এর মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী ছেলে খবরটা হোষ্টেল সুপারিন্-টেন্ডেন্ট্ নন্দ বাবুর কানে তুলে দিল।

তখন স্থির হ'ল বোর্ডারদের সামনে চতুর্ভুজকে তার ট্রাঙ্ক খুলতে বলা হবে।

যে কথা সেই কাজ।

সকলের সমবেত আক্রমণে চতুর্ভুজ ঘাবড়ে গেল। তার পর মুখ মুছে বল্লে,—না—না, কিছু না—

কিন্তু সমবেত দাবীতে সেই ট্রাঙ্ক খুলতেই হ'ল। অতগুলি বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখা গেল কারো পেন্সিল, কারো রবার, কাঁচি, আবার কারো ক্যামেরা, কারো রঙের টিউব সযত্নে রাখা আছে।

নন্দ বাবু চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলেন, চতুর্ভুজ, এ কি ব্যাপার?

সপ্রতিভ চতুর্ভুজ উত্তর দিলে—"পরিহাসো করিথিলা।"

এর অল্পদিন পরেই দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোক গমন করলেন।

তাঁর মরদেহ স্পেশাল ট্রেনে কলকাতায় নিয়ে আসা হ'ল।

সেদিন দুপুর বেলা চৌরঙ্গীর বুকে যে শোকযাত্রা দর্শন করেছিলাম, কলকাতার বুকে এত বিরাট আর ব্যাপক শোকযাত্রা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

নীরব শোকযাত্রা। দারুণ গ্রীষ্ম। মাথার ওপর প্রচণ্ড তপন তার তেজে যেন সব ভস্ম করে ফেলতে চাইছে। কোথা থেকে রাশি রাশি হাতপাখা ছড়িয়ে দিয়েছে—এই শোকযাত্রীদের উদ্দেশ্যে। একটা বাঁধ-ভাঙ্গা নদী যেন দক্ষিণ পথে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সুউচ্চ অট্টালিকা থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে শোকযাত্রীদের মাথার ওপর। কলকাতা শহরের সব অধিবাসী যেন আজ একই পথের যাত্রী।

শেকাযাত্রা যখন চৌরঙ্গীতে আর্ট স্কুলের সাম্‌নে এসে হাজির হ'ল—আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম প্রিন্সিপ্যাল পার্সি ব্রাউন মাথা থেকে টুপি তুলে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে কাজি নজরুল রচনা করেছিলেন:

"হায় চির-ভোলা হিমালয় হ'তে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া।"

চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের পর শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন ছাত্রদের মধ্যে একটি ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সেই সময় আর্ট স্কুলে টি. এ আচারী নামে একজন মাদ্রাজী টিচার হেড মাষ্টারের পদে আসীন ছিলেন। এই টিচার আগে কাঠের মিস্ত্রি ছিলেন। ভালো হাতের কাজও জানতেন। কিন্তু কি কৌশলে তিনি হেড টিচারের মত অত বড় পদ লাভ করেন—সেটা আমাদের জানা নেই।

মিঃ আচারী ইংরেজীতে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তবে ভাঙা বাঙলায় কথা বলতে পারতেন। তিনি ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে ছাত্রদের ডেকে চীৎকার করে বলতে স্থুরু করলেন—

জানিস্—সায়েব বলেছে। ছবি আঁকবি তোরা। সি আর দাস ফানেল। আট ফুট চার ইঞ্চি।

এখন, মজা হ'ল এই যে আচারী সাহেবের ঘোষণার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। সবাই অবাক্ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সি আর দাস ফানেল কি?

অবশেষে অফিসে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের আসল ঘোষণার মর্ম উদ্ধার করা হ'ল। সি, আর, দাসের ফিউনারাল প্রসেশনের একটি ছবি আঁকতে হবে। ছবিটির দৈর্ঘ্য হবে—৮ ফুট ৪ ইঞ্চি।

এই চিত্র প্রতিযোগিতা থেকেও বোঝা যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমাদের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল!

ভারতের পালশিল্প

'র্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

গুপ্তযুগকে যেমন বলা হয় ভারতের সুবর্ণযুগ তেমনি গুপ্তযুগের অনেক পরে পালযুগকেও আবার ভারতের—বিশেষ করে বাংলা-দেশের সুবর্ণযুগ বলা যায়, এযুগে বাঙ্গালীরা দেশের ও দশের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলায় যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তার তুলনা ভারতে মেলে না।

সাধারণভাবে নবম থেকে দ্বাদশ এই চারশ বছর ধরে পালযুগ বর্তমান ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে যদিও সেনবংশ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি ছোট রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন, তবুও এই শতাব্দীর সংস্কৃতিও পাল সংস্কৃতি, শতাব্দীর শিল্পধারাও পালশিল্প ধারা। শিল্পের তিনটি প্রধান অঙ্গ—স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা,—এই তিন শাখাতেই পালশিল্পীরা ছিলো বিশেষ পারদর্শী।

পালযুগের পূর্বে বাংলাদেশে পাথরের উপরে ভাস্কর্যের নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না। এ দেশ পাথুরে দেশ নয়—পাহাড় পর্বত এখানে নেই বললেও চলে। কাজেই ভাস্কর্যের উপযোগী পাথরের এখানে বড় অভাব। পক্ষান্তরে বৃষ্টিপ্রধান, নদনদী, জল-ভূমি ও বনভূমিবহুল এদেশে এঁটেল মাটির ও কাঠের অভাব কখনো হয় নি। এইজন্য মৃৎশিল্প ও কাঠ খোদাই শিল্প এখানে প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করে। বাংলার মৃৎশিল্পীরা হাঁড়ি, ঘড়া, সড়া গড়তেন, নরম মাটিতে অনায়াসে আঙ্গুল ও করতল চালনা করে খেলনা, পুতুল ও নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে অবলম্বন করে নানা সুদৃশ্য মাটির টালী, পোড়া ইঁটের উপর নানা নক্‌সা ও সুদৃশ্য অলংকরণ করে মন্দিরের [illegible]

হ'ল বাংলার শিল্প বা লোকশিল্প। পুরুষানুক্রমে একই শিল্পধারা পিতামহ থেকে পৌত্রে বর্তিয়েছে, কর্মসিদ্ধ দরিদ্র শিল্পীদের এই ছিল উপজীবিকা।

কিন্তু পালযুগের বিপুল সমৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে একদল অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠল। তাঁরা পোড়া মাটির ফলকে তাঁদের শিল্প-রুচিকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে রাজী হলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে ঐসব মৃৎশিল্পীরা পাথরের উপরে ভাস্কর্য রচনায় অগ্রসর হলেন। নরম মাটিতে যে কাজটি অতি সহজে রূপায়িত হত, কঠিন পাথরের উপর লোহার বাটালি দিয়ে তত সহজে তা করা সম্ভব হত না। বৃদ্ধ শিল্পীরা একাজে তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার তাদের পুরোনো কাজেই ফিরে গেলেন, কিন্তু উৎসাহী যুবক শিল্পীরা কঠিন পরিশ্রমে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ধীরে ধীরে সফলতার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এইভাবে আঞ্চলিক মৃৎশিল্পের প্রাণপ্রবাহ ও সুকোমল ডোল মিশিয়ে এক নূতন শিল্পধারার পত্তন হল। এ ধারাটি হচ্ছে পাল শিল্পধারা।

কিন্তু লুপ্তশিল্পের মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়ালে মনে যে স্নিগ্ধ ও দিব্যভাবের উদয় হয় এখানে তার অভাব রয়ে গেল। একটু লক্ষ্য করলে এগুলির সঙ্গে ধাতুতে নির্মিত ভাস্কর্য কলার একটা বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ পাল ভাস্কর্যগুলি সাধারণতঃ কষ্টি পাথরেই তৈরী হত। কষ্টি পাথর অতি কঠিন ও মসৃণ, সূক্ষ্ম কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী। এ মূর্তিগুলিতেও সেই গঠন নৈপুণ্য ও কোমলতাই প্রকাশ পেয়েছে। মূর্তিগুলির বক্ষ নিরাবরণ, কটিতে অলংকৃত মেখলা বা কটিবদ্ধ, সূক্ষ্ম বস্ত্রের আভাস। মাথায় সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত মুকুট, কানে কুন্তল, গলায় মণিহার বা মুক্তামালা, হাতে অঙ্গদ, কেউর, বালা, পায়ে নুপুর ইত্যাদি। মুখের ডোলটি লম্বা ধরণের, ধনুকের মত বাঁকা ভুরু, উন্নত নাসিকা, ভাবে ঢল ঢল চোখ, সরস অধর

মধুর হাসি। মুখের গঠনে বা ডোলে দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে পার্থক্য বড় একটা দেখা যায় না।

পালযুগের শিল্পীরা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী ও হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে অমর হয়ে আছেন। পাল সম্রাটেরা বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সে কারণে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাশাপাশি গঠিত হওয়ার কখনই কোনই অসুবিধা হয় নি। পালযুগে ভারতের অন্যান্য অংশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে স্বরু করে, কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। এই সময়েই বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে এখানে প্রচলিত হয়। উপরন্তু এ সময় থেকেই ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকতা দেখা দিয়ে সেটা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে আরম্ভ করে। পাল রাজত্বের সময়েই তিব্বতের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হওয়ায় তিব্বতীয় ভাবধারার নানা দেবদেবী তান্ত্রিকতার সুযোগে হিন্দু ধর্মকেও প্রভাবিত করে ফেলে। এ যুগের তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তিগুলির দৈহিক গঠনভঙ্গীর বিভিন্নতা, রূপের, ভাবের বিভিন্নতা ও আকৃতির নূতনত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারো কুড়ি হাত, কারো দিশ, কারো ছয়। চার হাত দু'হাত তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আট মুণ্ড, ছয়, চার, তিন—তার মধ্যে দু'একটি মুণ্ড কোন পশুর। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ শস্ত্রপাণি, কেউ বা বরাভয় দায়ী প্রভৃতি বহু বিচিত্র, অদ্ভুত ও ভীষণ মূর্তি এসময়ে তৈরী হয়ে সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মহাযান ও বড়যান ধর্মমতে উপাস্যা দেবীর সংখ্যা অনেক। প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, পর্ণশবরী, চুণ্ডা ও হারীতী এবং বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হ'তে উদ্ভুত মূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবী মারীচীর মুখ তিনটি, তার মধ্যে একটি মুখ শুকরের। আট হাতে বড় অঙ্কুশ, শর, অশোকপত্র, সূচী, ধনু, পাশ ও তর্জনীমুদ্রা। দেবীর মাথার একটি বুদ্ধমূর্তি সূর্যের মত। তিনিও প্রভাতকালের দেবী, তাঁর রথের সারথি রাহু এবং সাতটি শকর সে রথ টানছে। ফরিদপুর

জেলায় মাঝবাড়ি গ্রামে একটি অষ্টধাতুতে নির্মিত বড়তারা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। একটি অষ্টদল পদ্ম, পদ্মের মাঝখানে একটি ছোট দেবী-মূর্তি পদ্মাসনে বসা এবং পদ্মের আটটি দলে দেবীর আটজন সখীর ছোট মূর্তি বিরাজিত। ঐ আটটি দলকে ইচ্ছা করলে বন্ধ করা যায়। তখন এটিকে একটি অষ্টধাতু নির্মিত পদ্ম বলেই মনে হয়।

মারীচী দেবী

হিন্দু দেবদেবী মূর্তি, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রভৃতি ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পালযুগের হিন্দু মূর্তিগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। কারণ প্রতিটি মূর্তির পিছনে চালচিত্রের অলংকরণ পাল ভাস্কর্যের বিশেষত্ব। অনেক ক্ষেত্রে মূর্তির পিছনে

চালচিত্রের পটভূমিকা হতে সম্পূর্ণ কেটে বার করা হয়েছে। কোথাও বা মূর্তিগুলি গভীর ভাবে খোদাই করে পটভূমিকার সঙ্গেই যুক্ত আছে। এই চালচিত্রের অলংকরণগুলি নানা স্থাপত্য ভাস্কর্য ও গন্ধর্ব ইত্যাদির মূর্তি দিয়ে সাজানো। কোথাও বা শুধুমাত্র ফুল পাতার কেয়ারীর বন্ধনীর মধ্যেই আবদ্ধ। আজকাল আমাদের দেশে যে মূর্তির পিছনে চালচিত্র দেখতে পাই তা এই পাল ভাস্কর্য হতেই দেশে প্রবর্তিত হয়েছে। অবশ্য তার আকৃতিতে অলংকরণ পরবর্তী মোগল যুগের অলংকরণের সঙ্গে মিশে মিলে একটা নূতন আকার ধারণ করেছে মাত্র। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, নারায়ণ-মূর্তি, ধরা ও শ্রীযুক্ত বাসুদেব মূর্তি, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণেশ, দুর্গা, মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তিগুলি ভারতে অন্যান্য স্থানেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েক খানি বিশেষ মূর্তি যা পালযুগে বাংলাদেশেই নির্মিত হয়েছে, তা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। দিনাজ-পুর, রংপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হতে হরপার্বতীর কয়েক-খানি বিলাস মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এতে চারহাতযুক্ত শিব বাঁ হাঁটুর উপর পার্বতীকে বসিয়ে ডান হাতের একখানি দিয়ে পার্বতীর মুখটি তুলে ধরে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন। পার্বতী শিবের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ঢাকা পূবপাড়া গ্রাম হ'তে একখানি অর্দ্ধনারীশ্বর ও বাঁকুড়া হতে একখানা হরিহর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

নটরাজের মূর্তি সারা দক্ষিণ দেশের গুহা মন্দিরে ও নানা দেব দেউলে ছড়িয়ে আছে। সর্বপ্রথমে নটরাজের সন্ধান মেলে পশ্চিম চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত বাদামী গুহা মন্দিরে। এখানে নটরাজের হাত ১৮ খানি। সমসাময়িক কালের এলিফেন্টা গুহাতেও ৮ হাত, সর্বশেষে চিদম্বরমে তাঁর হাতের সংখ্যা চারে দাঁড়ায়। এই চার হাত ওয়ালা নটরাজই আজ পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু পাল যুগে যে দু'খানি নটরাজমূর্তি পাওয়া গেছে তাঁর হাত দশ খানি করে। একখানি মূর্তি পাওয়া গেছে

রামপালে আর একটি বীরভূমে। নটরাজদু'টি মাটিতে নেমে নাচের আসর জমাবার অবসরটুকুও পান নি। বাহন ষাঁড়ের উপরে দাঁড়িয়েই তাঁরা ঐ দশ হাত নিয়ে নাচছেন। এধরণের মূর্তি ভারতের আর কোথাও নেই।

নাগমাতা মনসা দেবীর মূর্তি পাল ভাস্কর্যের আর একটি অভিনব রূপায়ণ। রংপুর, বীরভূম ও বিহারে অনেক মনসা মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রতিটি মূর্তিতেই একটি করে মঙ্গল ঘট ও লীলায়িত ছন্দে নাগের রচনা মাধুর্যমণ্ডিত। ষষ্ঠি ও শীতলা মূর্তিরও অনেক সন্ধান পাওয়া গেছে। গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি সাধারণতঃ মন্দিরের দরজার দু'দিকে খোদাই করা থাকত, তাঁদের পৃথক পৃথক মূর্তিও আছে। কিন্তু আধুনিক বাংলাদেশের সর্বজনপূজ্যা কালী মূর্তির সন্ধান কোথাও মেলে নি। তবে সপ্ত মাতৃকার মূর্তি অনেক পাওয়া গিয়েছে। এই মাতৃকাগণ দেবতাদের শক্তিরূপে কল্পিত। এঁরা ব্রহ্মানী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুণ্ডা। চামুণ্ডা-দেবীর পৃথক ও বিভিন্নরূপের অনেক মূর্তি আছে। ইহঁাদের মধ্যে কোনটি চতুর্ভুজা, কোনটি বা ষড়ভুজা, নানা প্রহরণ ধারিণী ও নৃত্যপরায়ণা। বর্দ্ধমান জিলায় অট্টহাস গ্রামে চামুণ্ডা দেবীর একখানি ভীষণ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। উবু হয়ে বসা, অতিশীর্ণ অস্থিচর্মসার, গোল গোল চোখ, মুখে পৈশাচিক হাসি, বিকশিত দাঁত, ও কোঠরাগত জঠর।

এমন কত সুন্দর, কত অদ্ভুত, কত ভয়ঙ্কর মূর্তি যে পাল যুগে নির্মিত হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

এই ভাবে পালযুগের শিল্পীরা মূর্তি শিল্পে তাঁদের বহুমুখী প্রতি-ভার পরিচয় রেখে গিয়ে ভারত শিল্প ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। আজও উত্তর বঙ্গে, বিশেষতঃ করতোয়া নদীর তীরে তীরে গ্রাম গুলিতে বহু পাথরের বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী মূর্তিগুলি—কোথাও 'কাল ভৈরবী', কোথাও 'বনদুর্গা', কোথাও বা 'সর্বমঙ্গলা' বা 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে অভিহিত হয়ে হাত-পা নাক ভাঙ্গা অবস্থায় সিন্দুর চন্দনে মাখামাখি হয়ে গ্রাম্য বধূদের মঙ্গল সাধনে ব্যপত আছেন। প্রত-

তাত্ত্বিকের শিক্ষিত চক্ষু ছাড়া তাঁদের আজ চিনে ওঠে কার সাধ্য।

ছোট ছোট ধাতু মূর্তিগুলিও পাল ভাস্কর্যকলার এক গৌরবের বস্তু। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায়, নালন্দায়, গয়া ও দিল্লীতে পালযুগের সুন্দর সুন্দর ধাতব মূর্তির বহু সংগ্রহ আছে। মূর্তিগুলি অধিকাংশই অষ্ট ধাতুতে নির্মিত। এছাড়া পিতল, রূপা ও সোনার মূর্তিও অনেক পাওয়া গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে নালন্দার সংগ্রহশালা হতে সোনার তৈরী মহিষঘাতিনী দুর্গা মূর্তিখানি চুরি যাওয়ার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিও এই পালযুগেরই শেষের দিকে তৈরী মূর্তি। রূপার তৈরী বহু বিষ্ণু, নারায়ণ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি বাংলাদেশের নানা স্থান হতে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মূর্তিগুলির চালচিত্রের কথা বলেছি। এই চালচিত্রেরও নানা প্রকার ডোল দেখা যায়। কোনটি অশ্বত্থের পাতার মত, কোনটি বট পাতার মত, কোনটি বাঁশ পাতার মত, কোনটি পদ্মের পাঁপড়ির মত কোনটি বা সম্পূর্ণ গোল। সাধারনতঃ বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও জৈন তীর্থঙ্কর-দের বসা বা দাঁড়ানো মূর্তিগুলির পিছনে কোন চালচিত্রের অলংকরণ দেখা যায় না। এগুলি শুধুমাত্র পদ্মের অলংকরণ-যুক্ত পাদপীঠের উপরে স্থাপিত।

রূপার তৈরী মূর্তিগুলি সাধারণতঃ ছেনি বাটালী দিয়েই কেটে তৈরী করা হত। তবে এধরণের মূর্তির সংখ্যা কম। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহের মধ্যে বহু ছোট ছোট পিতলের ও অষ্টধাতুর মূর্তির সংখ্যাই বেশী। এই ধাতুর মূর্তিগুলি নেপাল ও তিব্বতের ধাতুমূর্তি শিল্পের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। তবে তিব্বতীয়ধাতুমূর্তিতে সাধারণতঃ রং দিয়ে চোখ, ভ্রু, ঠোঁট ইত্যাদি এঁকে দেওয়ার প্রথা আছে, কিন্তু বাংলা দেশের ধাতু মূর্তিতে ঐ রকম ভাবে রং লাগাবার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। এখানে শুধু বাংলায় পাল যুগের ভাস্কর্যের কথাই বললাম। চিত্র শিল্পেও এযুগের অবদান উল্লেখযোগ্য।

অঙ্কের মজা

শ্রীপ্রভাত কুমার দত্ত

অঙ্ক সম্পর্কে অনেকেরই নিদারুণ ভয়। সব বিষয়ে পরীক্ষায় পাশ করে যাব, কিন্তু অঙ্কে? হলফ করে কিছুই বলা যায় না। সেদিনের সান্ধ্য আসরে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।

অমিয় বললো, ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে আমি একশোর মধ্যে সতের, সাত, তিন এই রকম নম্বর পেয়ে আসছি। কিন্তু কি আশ্চর্য জান, অঙ্ক যে ঠিক করি না, তা নয়। মনে আছে খুব ছোটবেলায় একবার $\frac{26}{65}$ কে সরল করতে দিয়েছিল। প্রায় সব ছেলেই 13 দিয়ে ওপর নীচে ভাগ করে উত্তর পেয়েছিল $\frac{2}{5}$। আমি কিন্তু সাধারণ নিয়মে সরল করি নি। আমি 6 আর নীচের 6 কেটে দিয়ে উত্তর পেয়েছিলাম $\frac{2}{5}$; ঠিক উত্তরই তো পেয়েছিলাম, কিন্তু তবু একচোখো অঙ্কের মাষ্টার ব্রহ্ম গুপ্ত আমাকে শূন্য নম্বর দিয়েছিলেন। এটা কি উচিত হয়েছিল? অন্যেরা unlucky 13 নম্বর নিয়ে নাড়াচাড়া করে lucky হয়ে গেল, আর আমি সযত্নে 13 এড়িয়ে 6 এর সাহায্যে সরল করার চেষ্টা করলাম, তবু আমার বেলা সব নয়-ছয় হয়ে গেল। লীলাবতীর লীলাখেলা আর কি?

শালকিয়ার রজত সেন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললো—যা বলেছ অমিয়; একদম খাঁটি কথা। মানে আমারও একটা ওই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিনা!

অনেকে হৈ চৈ করে উঠলো—কী রকম? কী রকম? রজত বললো—আমার বেলায় অবশ্য $\frac{26}{65}$ ছিল না, ছিল $\frac{16}{64}$। আমি তো অমিয়র মতই ওপরের 6 আর নীচের 6 কেটে $\frac{1}{4}$ উত্তর করে অঙ্কের মাষ্টার ভাস্কর আচার্য্যের কাছে গেলাম। তিনি তো আমার সরল করার পদ্ধতি শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গেলেন; তার মানে ...

নয় যে তিনি বোঝালেন—হ্যাঁ, পদ্ধতিটা ঠিক তো বটে। পরে আমার প্রসারিত হাতের ওপর পড়লো বেত, আওয়াজ হল সপাং সপাং। আমার মনে হল, একখানা হাত বুঝি চার টুকরো হয়ে গেল। একের চার কি করে হয় সেদিন হাতে হাতে এবং হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

শ্যামল বললো, অঙ্কের ভেতর কিন্তু রসও কম নেই। একবার ট্রিগোনেমেট্রির ক্লাশে মাষ্টার মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল তো π (পাই) এর মান কত ?

পাই ? পাই মানে কি রে ? দিলীপ সেন শুধোলো। শ্যামল বললো, আমিও তো তখন তাই ভেবেছি রে। তখন কি আর জানি কোন বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতকেই পাই বলে। তখনো তো ভাল করে বই খুলে পড়া শুরু করি নি। পাইকে তখনো পাই নি। আমায় নিরুত্তর দেখে সেণ্ট জেভিয়ার্সের Father Goreux বলে উঠলেন—কি হল, উত্তরটা জানা আছে না কি ?

আমি সপ্রতিভভাবে জবাব দিয়েছিলাম—Yes, I have a number। কেন ওই জবাব দিয়েছিলাম তা জানি না, কারণ উত্তরটা আমার তো সত্যি সত্যি জানা ছিল না।

আমায় প্রশ্ন করেই ফাদার কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডে লিখেছিলেন, $\pi = 3{\cdot}1416$। আর সেটা দেখেই আমার মধ্যে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আমিও তো ওই উত্তরটাই বলেছি, ফাদার। তবে একটু অসাধারণ উপায়ে।

কী রকম ?

Yes, I have a number এই শব্দগুলো যথাক্রমে 3,1,4,16 সংখ্যক অক্ষর নিয়ে গঠিত। আর Yes এর পরে যে কমা রয়েছে সেটা 3 এর পরে দশমিক বিন্দু সূচিত করছে।

ফাদার আমার উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন। আমাকে অনেক রকম অঙ্কের মজা দেখালেন।

অমিয় আর রজত বলে উঠলো—অঙ্কের মজা! কী রকম ?

শ্যামল বললো—বেশীর ভাগই ভুলে গিয়েছি, কিন্তু দু-একটা মনে আছে। তার মধ্যে একটা বলি :—

ফাদার বললেন, কোন্ digit বা অঙ্ক তোমার ভাল লাগে? আমি বলেছিলাম—'7'। তখন ফাদার আমায় 12 34 56 79 এই সংখ্যাটাকে 63 দিয়ে গুণ করতে বললেন। আমি কাগজ কলম নিয়ে গুণ করে দেখি উত্তর ফলে সব '7'। এটা একটা মজার ব্যাপার নয়?

অমিয় তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোট বই বার করে গুণটা করে ফেললো। সবাই নোট বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলো :—

```
  12345679
       ×63
----------
  37037037
 74074074
 777777777
```

রবি বললো,—না, ব্যাপারটার মধ্যে মজা আছে। কিন্তু তোমার যদি '7' ভালোনা লেগে '5' ভালো লাগতো বা অন্য কোন অঙ্ক?

শ্যামল বললো, যে অঙ্ক ভালো লাগবে তাকে 9 দিয়ে গুণ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যা দিয়ে সর্বদাই 12345679 এই বড় সংখ্যাকে গুণ করলেই অভীষ্ট ফল লাভ হবে। '7' ভালো লাগলে, গুণ করতে হবে 7×9 বা 63 দিয়ে; 5 ভালো লাগলে, 5×9 বা 45 দিয়ে গুণ করতে হবে।

অজয় বললো, মজাটা তবে 9কে কেন্দ্র করে! কিন্তু 7 দিয়ে গুণ করে সব 9 পাওয়ার মজাটা কি জান? এই দেখ—বলে অজয় নোট বুকে লিখলো,

```
  142857
      ×7
--------
  999999
```

তারপর বললো, 142857 সংখ্যাটা কিন্তু খুবই মজার। এই সংখ্যাকে 2, 3, 4, 5 এবং 6 দিয়ে গুণ করলে 1, 4, 2, 8, 5, 7 অঙ্কগুলিই ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। এই দেখ :—

142857	142857	142857	142857
× 2	× 3	× 4	× 5
285714	428571	571428	714285

142857
× 6
857142

বিজয় বললো, এইরকম মজার উদাহরণ আমারও কিছু কিছু জানা আছে। 1089 সংখ্যাটিকে 9 দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় 9801, অর্থাৎ 1089 সংখ্যাটির চারটে অঙ্ককে ঘুরিয়ে লিখলে যা দাঁড়ায়—তাই। অনুরূপে 2178 সংখ্যাটিকে 4 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 8712 তারপর অজয়ের হাত থেকে নোট বইটা নিয়ে বিজয় লিখলো,

312	213
×221	×122
312	426
624	426
624	213
68952	25986

এবং তারপর বললো, মজাটা বুঝলে ?

রজত বললো, এর মধ্যে মজাটা কোথায় ?

বিজয় বললো, 312 কে উল্টে পাওয়া যায় 213; 221 কে উলটে পাওয়া যায় 122 এবং 68952 কে উলটে পাওয়া যায় 25986 অর্থাৎ প্রথম দুটো সংখ্যার গুণফল, সংখ্যা দুটিকে উলটিয়ে লিখে যে দুটি সংখ্যা পাওয়া যায় তাদের গুণফলের ঠিক উলটো। মজাটা এইখানেই।

সুজয় বললো, উলটিয়ে লেখার কথায় আমার একটা মজার অঙ্কের কথা মনে পড়ছে। একদিকে ফোর্ট উইলিয়াম, অন্যদিকে কর্মব্যস্ত জনবহুল কোলকাতা শহর, এদের মধ্যিখানে নরম চিকন সবুজ ঘাসের তৈরী মনোরম গালচের ওপর বসে সান্ধ্য আসরের গল্পের সভ্যেরা—অজয়, বিজয়, সঞ্জয়, দুর্জয়, আমি, যাদুকর এবং অতিথিরা অর্থাৎ অমিয়, রজত, দিলীপ, রবি, শ্যামল—এই যে আমরা গল্প জমিয়েছি, আমরা ইচ্ছে করলে নিজেদের মধ্যে উলটে পালটে বসেও তো গল্প করতে পারতুম। আমরা সারি সারি দশজনএকটা সরলরেখায় বসে আছি, আর আমাদের সামনে অল্পদূরে মুখোমুখি বসে আছে আসর পরিচালক যাদুকর। আমরা দশজন নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে কতভাবে বসতে পারি সেটাই হল প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার কাছে খুব মজার বলে মনে হয়।

অমিয় বলে উঠলো, কেন, মজার বলে মনে হয় কেন?

সুজয় বললো, তার আগে বলতো আমরা কত রকম ভাবে বসতে পারি?

অমিয় বললো, ও আর এমন শক্ত কি? একটু হিসেব করলেই বোঝা যাবে। চল্লিশ পঞ্চাশ রকম ভাবে হয়তো বসা যাবে। কি বল রজত?

রজত বললো, একটু কম বেশী হতে পারে, কিন্তু একশো রকমের বেশী কিছুতেই হবে বলে মনে হয় না।

সুজয় বললো, বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু এটা সত্যি যে আমরা দশজনে নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে ৩৬,২৮,৮০০ (ছত্রিশ লক্ষ আঠাশ হাজার আটশো) রকম ভাবে বসতে পারি। উত্তরের এই বৃহত্বটাই আমার কাছে মজার লাগে।

অমিয় এবং রজত বলে ওঠে—কী করে হোল?

সুজয় বললো, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। দশজনে বসার জন্যে দশটা স্থান আছে। প্রথম স্থানটা দশরকম ভাবে পূর্ণ হতে পারে, কারণ দশ জনের যে কেউ সেখানে গিয়ে বসতে পারে। প্রথম

স্থানটা পূর্ণ হবার পর দ্বিতীয় স্থানটা নয় রকমভাবে পূর্ণ হতে পারে, কারণ বাকী নয়জনের যে কেউ দ্বিতীয় স্থানটা দখল করতে পারে। সুতরাং প্রথম দুটো স্থান 10×9 বা 90 রকমভাবে পূর্ণ হতে পারে। অনুরূপভাবে বলা যায় প্রথম তিনটে স্থান $10 \times 9 \times 8 = 720$ রকম ভাবে পূর্ণ হতে পারে। এইভাবে দেখানো যায় যে দশটি স্থান পূর্ণ হতে পারে $10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ বা 36,28,800 রকমভাবে।

অমিয় আর রজত হাঁ হয়ে শুনলো।

সঞ্জয় বললো, সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে বড় বটে কিন্তু এর চেয়েও বড় সংখ্যা কম নেই। এক গ্রাম বস্তুর মধ্যে 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 সংখ্যক ইলেকট্রন আছে। আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে মোট যত জল কণা আছে তার থেকেও এই সংখ্যা অনেক বড়। পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির অণুর সংখ্যা হল 31×10^{42} অর্থাৎ 31 এর পরে 42টি শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই।

সঞ্চয়ের হিসাব শুনে সবাই চুপ। ঠিক হলো আর আরেক দিন অঙ্ক নিয়ে হবে আলোচনা।

সেদিনের সান্ধ্য আসর শেষ হল। সবাই উঠে পড়লো। বিষাদে, কি কী স্বাদে জানি না, দিলীপ খাদে গান ধরলো—

মেলানকোলিয়া

মোরা যাই যে চলিয়া . ....

যীশু খৃষ্ট জন্মাবার আগে পৃথিবীতে বহু সভ্যজাতির উত্থানপতন হয়। তাদের মধ্যে এককালে গ্রীস ছিল সবচেয়ে উন্নত।

ইতিহাস সঠিক ভাবে বলতে পারে না কবে প্রথম গ্রীকদের খেলাধুলা সংঘবদ্ধ রূপ নেয়। তবে পণ্ডিতরা মনে করেন খৃষ্ট জন্মাবার সাতশ' ছিয়াত্তর বছর আগে গ্রীকদের প্রথম প্রতিযোগিতা সুরু হয়। অ্যালফিউস্ (Alpheus) নদীর তীরে অলিম্পিয়া (Olympia) গ্রামে প্রায় দু'শ' কুড়ি গজ হাঁটার এক প্রতিযোগিতা হয়। কোরোইবাস্ (Coroebus) নামে এক যুবক প্রথম হয়। পুরস্কার স্বরূপ অলিভের পাতার মালা তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রথমে প্রতি পাঁচ বছর ও পরে চার বছর অন্তর ঐ খানে এই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে

ত্রয়োদশ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পাল্লার হাঁটা, যুবক ও বালকদের জন্য মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, ডিস্‌কাস্ ছোড়া, রথের দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীক জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকের এই খেলাধুলা চরম জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গ্রীকদের স্বর্ণযুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকের খেলাধুলার গৌরবও ম্লান হ'তে থাকে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পর তিনশ' বিরানব্বই খৃষ্টাব্দে এক রোমান সম্রাট এই খেলাধুলো বন্ধ করে দেন। এর কিছুকাল পরে অলিম্পিকের গ্রাম ভূমিকম্পের কবলে মাটির তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা তার কিছু কিছু ধ্বংস-স্তূপ এখন আবিষ্কার করেছেন।

মানুষ ক্রমশঃ অলিম্পিকের খেলাধুলোর কথা ভুলে গেল।

আঁঠারশ ছিয়ানব্বই খৃষ্টাব্দে পিয়েরি দ্য কুর্বার্তিন্ নামে এক ফরাসী মনীষী অলিম্পিকের আদর্শে খেলাধুলোকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহু আলাপ আলোচনার পরে অবশেষে আধুনিক অলিম্পিকের সূত্রপাত হয়। প্রথম ক্রীড়াক্ষেত্র হ'ল গ্রীসের নগরী এথেন্স। সমস্ত গ্রীক জাতি যেন তাদের হৃতগৌরব ফিরে পেল। বিশ্বের কোণে কোণে সাড়া জেগে উঠল। পুরোনো দিনের ছাঁচে সাজানো হ'ল আধুনিক বিশ্বের প্রথম ক্রীড়াক্ষেত্র। প্রথম পুরস্কারটি পায় জেম্‌স্ কনোলি নামে আমেরিকার এক তেজস্বী ছাত্র। অলিম্পিকের খবর শুনে ইংল্যাণ্ড পাড়ি দিয়ে অনেক ঝামেলা করে জেম্‌স্ এথেন্সে পৌঁছায় খেলা শুরু হওয়ার মাত্র পনর দিন আগে। বেচারা জেম্‌স্ জানত না যে গ্রীক ক্যালেণ্ডার আমেরিকার থেকে বারো দিন এগিয়ে থাকে। হোটেলে বসে নিশ্চিন্ত মনে প্রাতঃরাশ করার সময় এক কর্মকর্তা এসে খবর দেন যে অলিম্পিক সেদিনই আরম্ভ হচ্ছে। হপ্-স্টেপ্-জাম্প হল প্রথম ইভেণ্ট। তড়িঘড়ি জেম্‌স্ এসে মাঠে নেমে হপ্-স্টেপ্-জাম্পে' প্রথম হ'য়ে সে আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম পুরস্কার পায়। প্রতি চার বছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন নগরে অলিম্পিকের খেলাধুলো চলতে থাকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় অবশ্য এই খেলা বন্ধ থাকে। আধুনিক অলিম্পিকে মেয়েরা প্রথম স্থান পায় ১৯১২ সালে, তাও শুধু ডাইভিং এবং সাঁতারে। ১৯২৮ সালে মাঠের অন্যান্য খেলাধুলোয় মেয়েরাও যোগ দেয়।

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো শহরে উনবিংশ অলিম্পিক হয়। সেই শহরেই বিংশতি অলিম্পিকের খেলাধুলোর জন্য বিশ্ববাসীকে আমন্ত্রণ জানালো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্ম্মানীর ম্যুনিখ শহর। জার্মান কবি মরগেন স্টার্ণ লিখেছিলেন, 'যে অসম্ভবে বিশ্বাস করে না সে বাস্তববাদী নয়।' তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় ১৯৭২ সালের ম্যুনিখ অলিম্পিকের বিভিন্ন ঘটনায়। আড়াইশ হেক্টার জমি জুড়ে

তৈরী হ'ল আধুনিক বিশ্বের বিস্ময় বিংশ অলিম্পিকের গ্রাম। ধ্বংস স্তূপের জঞ্জাল জড়ো করে এক কৃত্রিম পাহাড় বানানো হ'ল। পনেরশ মিটার লম্বা এক কৃত্রিম হ্রদ তৈরী হ'ল। প্রধান ষ্টেডিয়ামের সঙ্গে গ'ড়ে উঠল ছোট দুটি ষ্টেডিয়াম, চারটি ছাদ-ওয়ালা সাঁতারের জায়গা, ফুটবল এবং খেলাধুলোর মাঠ, সাইকেল ষ্টেডিয়াম, ভলিবলের জন্য দু'টি ইনডোর ষ্টেডিয়াম্ এবং বক্সিং-এর মঞ্চ। ১, ৬৮, ৯৬০টি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্ দিয়ে তৈরী হ'ল বিশাল স্কোর বোর্ড। পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগিদের জন্য অলিম্পিক গ্রামের মধ্যেই ছোট ছোট দু'টি নগর গ'ড়ে উঠল। সভ্য জগতের সব সুবিধাই সেখানে আছে। এক সাথে ৩৫০০ লোকের আহারের ব্যবস্থা করা হল তিনটি বিশাল ঘর জুড়ে।

ঠিক হ'ল বিংশ অলিম্পিকের খেলা শেষ হ'লে পুরুষ প্রতিযোগীদের গ্রামটি ম্যুনিখবাসীদের বাসগৃহ সমস্যা দূর করবে। মহিলা প্রতিযোগীদের গ্রামটি কলেজের ছাত্রীদের আবাস হবে। অলিম্পিক চলাকালীন বিশ্বের সঙ্গে খবর আদান প্রদানের প্রাণকেন্দ্র রেডিও ও টেলিভিশনের চারতলা বাড়িটি ম্যুনিখের ছেলে মেয়েদের জন্য খেলাধুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। ১৫০০০ লোক চারবছর ধ'রে দিনরাত খেটে গ'ড়ে তুললো এই অলিম্পিক গ্রাম। খরচ হ'ল ৪,৮০,০০,০০০,০০০ টাকা। আল্‌পস্ পাহাড়ের ঠাণ্ডায় যা'তে খেলোয়াড়দের অসুবিধে না হয়, দূরের মাঠের ঘাসের নীচে ২২ কিলো মিটার লম্বা গরম জলের পাইপ রাখা হ'ল। ব্যবস্থা হ'ল কোনও সাঁতারু প্রতিযোগিতার শেষে জল থেকে চোখ তুলেই যাতে জানতে পারে কে প্রথম হয়েছে—আর সেটা অলিম্পিকে না বিশ্বরেকর্ডে। সবই সম্ভব হ'ল কম্পিউটার চালিত ইলেক্‌ট্রনিক স্কোরবোর্ডের জন্য। অলিম্পিকের গ্রামে এক মজার লোক ছিল। রাশিয়া থেকে আগত এই বৃদ্ধ তার বহুদিনের বাসস্থান ছাড়তে নারাজ। নিরুপায় হ'য়ে কর্মকর্তারা ওকে অলিম্পিক গ্রামেই থাকতে দিয়েছিলেন। ডালিয়া ফুল বিক্রী ক'রে এখন সে বেশ দু'পয়সা করেছে।

ছাব্বিশে আগষ্ট, ১৯৭২ সাল, ম্যুনিখ, পশ্চিম জর্মানী। ইতি-হাসের সবচেয়ে বিলাস ও ব্যয় বহুল অলিম্পিক শুরু হ'ল। ১২০টি দেশের প্রায় ১২০০০ ক্রীড়াবিদ্ পনের দিন ধ'রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সৌর্য্য, বীর্য ও দক্ষতার পরীক্ষা দেবে। অষ্টম শতাব্দীতে তৈরী আটটি অ্যালপাইন শিঙ্গার গুরুগম্ভীর নিনাদের মধ্যে পশ্চিম জার্মাণীর প্রেসিডেণ্ট গুস্তভ হাইনম্যান্ আধুনিক অলিম্পিকের বিংশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। প্রধান ষ্টেডিয়ামের ৮০,০০০ দর্শক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল।

অলিম্পিকের জন্মভূমি সুদূর গ্রীস থেকে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সাহায্যে রিলে রেসের মাধ্যমে পূতাগ্নি ম্যুনিখে পৌঁছায়। পশ্চিম জার্মান দলের ১৮ বছর বয়সী ১৫০০ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগী 'গুণ্টার জান্' শেষ মশাল বাহক হিসাবে প্রধান ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশালাকায় ষ্টেডিয়াম সচকিত হ'য়ে ওঠে। এক পাক প্রদক্ষিণ ক'রে স্টেডিয়ামের ১৬২টি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে মশালের স্পর্শে বিরাট কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দিল 'গুণ্টার জান্'। এই পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা অলিম্পিকের শপথ গ্রহণ করল। সমস্ত প্রতিযোগীদের হয়ে এই শপথ বাক্য পাঠ করেন পশ্চিম জার্মাণীর লং জাম্পার, ডাক্তারি ছাত্রী, ২২ বছরের, 'হাইদি শেলার।'

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি 'আভেরি ব্রানডেজ' এবং বিংশ অলিম্পিকের সংগঠন সমিতির চেয়ারম্যান 'ভিলি ডম্'-এর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট হাইনম্যান্ আসন গ্রহণের পর উজ্জ্বল রঙীন পোষাকে সজ্জিত ম্যুনিখ শহরের ৩০০০ বালকবালিকা কাগজের মালা হাতে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে হেঁটে দর্শকদের অভিবাদন জানাল। স্টেডিয়ামের ওপর হাওয়ায় উড়তে থাকে ১২০টি দেশের জাতীয় পতাকা। পশ্চিম জার্মাণীর সামরিক ঐক্যতানের পরে পুরাকালের কামান থেকে তোপধ্বনি করা হ'ল। জার্মাণ বর্ণমালার

প্রতিযোগীরা প্রধান স্টেডিয়ামে মার্চ পাস্ট ক'রে গেল। মাথায় গাঢ় নীল রং-এর পাগড়ী ও গায়ে জওহর কোট পরা ভারতীয় দল এক বৈশিষ্ট্যের ছবি ফুটিয়ে তুলল।

পরের দিন শুরু হল ১১০৯টি পদকের জন্য প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৪১টি বিশ্বরেকর্ড ও ২২টি অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপিত হল।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সাল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আভেরি ব্রান্‌ডেজের মাথার ওপর পঞ্চবলয় চিহ্নের তুষার-শুভ্র অলিম্পিক পতাকা। সঙ্গে আরও তিনটি পতাকা—গ্রীস, পশ্চিম জার্মাণী ও ক্যানাডার; কারণ গ্রীস অলিম্পিকের জন্মভূমি, পশ্চিম জার্মাণী বিংশ অলিম্পিকের উদ্যোক্তা আর ক্যানাডা (মনট্রিল) নিয়েছে ১৯৭৬ এর একবিংশ অলিম্পিকের দায়িত্ব। ব্রানডেজ্‌ ঘোষণা করলেন, "আমি বিংশ অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং চার বছর পরে মনট্রিলে আমাদের সঙ্গে একুশতম অলিম্পিকে যোগ দেবার জন্য বিশ্বের যুবজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" বিদায় ভাষণ শেষ হবার সংগে সংগে স্কোর বোর্ডে উজ্জ্বল আলোর রেখা ফুটে উঠল—'মন্‌ট্রিল ১৯৭৬'।

শেষ হ'ল অলিম্পিকের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের একটি অধ্যায়। শুরু হ'ল আবার বিশ্ব জুড়ে সেরা খেলোয়ারদের অদম্য উৎসাহে নিরলস অনুশীলন। সবারই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা—মন্‌ট্রিল অলিম্পিকের মান আরও উন্নততর করতে হবে। অলিম্পিকের মন্ত্রে সবাই দীক্ষিত—'আরো জোরে—আরও উঁচুতে—আরও তেজের সঙ্গে'

আগুনে দেওয়া বেলুনের ম্যাজিক

যাদুকর এ. সি. সরকার

বিদেশ সফরকালে সেবার লণ্ডনের এক অনুষ্ঠানে একজন অষ্ট্রেলিয়ান যাত্নকরকে দেখাতে দেখেছিলাম একটা খুব মজাদার বেলুনের ম্যাজিক। যাত্নকর আসরে হাজির হলেন লাল আর হলুদ রঙের পোশাক-পরা তুজন সহকারীকে মঞ্চে নিয়ে। প্রত্যেক সহকারীর হাতে একটি করে ফোলান বেলুন। পোশাকের রং অনুযায়ী একজনের হাতের বেলুন লাল আর অপর জনের হাতের বেলুন হলুদ।

যাত্নকর দর্শকদের দৃষ্টি সেই বেলুন তুটোর দিকে আকর্ষণ করে একটি ছোট বিবৃতি দিলেন—

"বন্ধুগণ, এখন আপনাদের সামনে আমি দেখাবো একটি অদ্ভুত যাত্নর খেলা। অবশ্য যাত্নর খেলা মাত্রেই অদ্ভুত, তবুও এ যাত্নর খেলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই যে তু'জনের হাতে তুই রঙের তুটো বেলুন দেখছেন এদের উপরে আছে আমার পোষা ভূতের কুদৃষ্টি। ভূত বাবাজী এই বেলুন তু'টোকে নিয়ে কখনো কখনো এমন সব কাণ্ড কারখানা করে যে তার আর কী বলবো। আপনারা ভাল করে নজর রাখুন বেলুন তু'টোর দিকে। আমি ভূতকে ডাকছি, দেখি ভূতবাবাজী আজকে কোন্ কাণ্ড করে বসেন। আপনারা ভাল করে নজর রাখবেন বেলুন তুটোর দিকে। দরজার দিকে আমার যে হলদে পোশাক পরা সহকারী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে দেখুন, রয়েছে হলদে বেলুন; আর লাল পোশাক পরা, দেওয়ালের দিকে দাঁড়ানো সহকারীর হাতে আছে লাল রঙের বেলুন। এইবার আপনারা একটু সজাগ হয়ে বসুন, আমি ভূতবাবাজীকে

এর পরে যাত্নকর মশাই যে মন্ত্র পড়লেন তার বাংলা তর্জমা করলে অনেকটা এমনি দাঁড়ায়—

উটের গায়ে পালক হলে,
উট পাখি তা হয় না কি ?
নিউ গিনিকে গালিয়ে নিলে
তা থেকে হয় গয়না কি ?
আয়রে চলে, ভূতবাবাজী,
বেলুন নিয়ে কর খেলা।
শাদা-ভালুক কাঁপছে বসে—
তার গায়েতে জ্বর মেলা !

মন্তর পড়া শেষ হতেই যাত্নকর তাঁর হাতের পিস্তলের ট্রিগারটা হঠাৎ টিপে দিলেন। ত্বড়ুম করে কানফাটানো এক আওয়াজ হতেই সবাই চমকে উঠে তাকালেন বেলুন ত্নটোর দিকে। কি অবাক কাণ্ড ! কেমন করে ফুস্‌মন্তরে এ দিককার বেলুন ওদিকে আর ওদিককার বেলুন এ দিকে চলে এসেছে ! দরজার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা সহকারীর হাতের লাল বেলুন ভূতের কেরামত্তিতে যেমন চলে গেছে দেওয়ালের দিকে দাঁড়ানো সহকাকরীর হাতে, তেমন দেওয়ালের দিকে দাঁড়ানো সহকারীর হাতের হলুদ বেলুন এসে আশ্রয় নিয়েছে দরজার ধারে দাঁড়ানো সহকারীটির হাতে। বেলুনের এই অদ্ভুত স্থান পরিবর্তনের ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলেন ঘর সুদ্ধু সবাই।

অনুষ্ঠান শেষে যাত্নকর মশাই তাঁর এই বেলুনের খেলার প্রশংসায় নিজেই পঞ্চমুখ হয়ে আমার কাছে খুব বড়াই করতে থাকলেন। এই ম্যাজিকটির সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলতে থাকলেন তিনি আমার কাছে আমাকে একলা পেয়ে।

"কেমন দেখলেন বেলুনের ম্যাজিকটা ? কৌশলটা নিশ্চয়ই ধরতে পারেন নি। পারবেনই বা কেমন করে ! এর মূল রহস্য তো আর তেমন সহজ সরল নয়। এ আমার নিজস্ব আবিষ্কার।" বড়াই করে বলে চলেন যাত্নকর মশাই আমাকে তাচ্ছিল্য করে।

তাঁর এই উদ্ধত আচরণ আর সহ্য হয় না আমার। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলি, "দেখুন, সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি—এটি মোটেই আপনার নিজস্ব আবিষ্কার নয়। যদি শুনতে চান তবে বলি কোন কৌশলে আপনি এই বেলুনের খেলাটা দেখালেন।"

আমার কথায় যাদুকর মশাইর অত্যুৎসাহে ভাটি পড়ে। বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি।" চেয়ারের উপরে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে আমি শুরু করি— "আসলে ঐ বেলুন দুটোর মধ্যেই আছে যত কারসাজি। প্রস্তুতি-পর্বে আপনার কাছে ছিল একই মাপের দুটো লাল আর দুটো হলদে বেলুন। প্রথমে আপনি নিলেন দু'রঙের দু'টো বেলুন যেমন ধরুন একটা লাল আর একট হলুদ। প্রথমে হলুদ বেলুনটা নিয়ে

তার ভেতরে আপনি ফেলে দিলেন একটা চাল বা ছোট দানা পাথর কুচি। তারপরে এর ভেতরে আস্তে লাল বেলুনটা এমন ভাবে গলিয়ে দিলেন যাতে দুটো বেলুনের মুখ থাকে একত্র। এর পরে ফুঁ দিয়ে এক সঙ্গে ফোলালেন দুটো বেলুনকে। ফোলানোর সময় খেয়াল রাখলেন যাতে হলুদ বেলুনের ভেতরে চাল বা পাথর কুচিটা থাকে তার গলার কাছে। ফলে যাবার পরে বাইরে থেকে কেবল

ফোলানো লাল বেলুনটা। দ্বিতীয় সেট বেলুন অর্থাৎ যেটার বাইরে লাল আর ভেতরে হলুদ, সেটাও বানিয়ে নিলেন একই কায়দায়। তারও ভেতরে আপনি একদানা চাল বা পাথর কুচি ভরে নিতে ভুল করলেন না। সুতো দিয়ে বেঁধে নিলেন ফোলা বেলুনের জোড়া-মুখ।

এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে আপনি আপনার সহকারীদের হাতে এই দু'টো কায়দা করা বেলুন এমন ভাবে ধরিয়ে দিলেন যাতে ভেতরকার দানা (চাল বা পাথর-কুচি) দুটো থাকে তাদের চিমটির নাগালের মধ্যে। আপনি পিস্তলের ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে সহকারীরা যার যার হাতে ধরা বেলুনের দানাতে চিমটি কাটলো সজোরে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের ডবল বেলুনের বাইরের দিককার বেলুন চোখের পলকে ফেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। ভেতরকার লুকনো বেলুন করলো আত্মপ্রকাশ। হলুদ বেলুন পাল্টে হলো লাল, আর লাল বেলুন হলো হলুদ। মনে হলো যেন এর হাতের বেলুন চলে গেল ওর হাতে। কেমন তাই না?"

আমার মুখে বেলুনের বিস্তৃত কৌশল-ব্যাখা শুনে যাদুকর মশাই চুপসে গেলেন। মহা অপ্রস্তুত হয়ে তিনি অন্যত্র প্রস্থান করলেন।

ইচ্ছে করলে তোমরাও তো এই বেলুনের মজা দেখিয়ে বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার। দেখানোর আগে বার কতক ভাল ভাবে অভ্যাস করে নিও। বেলুনের রং নির্বাচনের ব্যাপারটা নিজেরা বুঝে শুনে করে নিও। বিশেষ ধরনের ম্যাজিক-বেলুন তো এদেশে পাবে না। রং এমন বাছাই করবে যাতে ভিতরের বেলুনের রং বাইরে ফুটে না বেরোয়।

সাবধানে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে বন্ধুদের সামনে হাজির হও এই বেলুনের ম্যাজিক নিয়ে আর বিস্ময়ে হতবাক করে ফেলো তাদের।

অ্যাটম যুগের গল্প

শ্রীমণিকা ঘোষাল

এক ছিল টুনীপাখী, বেগুন ক্ষেতে নাচতে নাচতে ফুটল পায়ে……

—না না, ও চলবে না। নতুন গল্প বলতে হবে।

ঘুমোবার আগে রোজ রাত্তিরে দিতুনকে মধ্যিখানে রেখে ছুই পাশে ছুই নাত্‌নীর গল্প শোনা চাই-ই। নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে যেন। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এই সময়টা অন্য কারো সঙ্গে কথা বলা চলবে না। ওদের সম্পত্তি তখন আমি।

—কোথায় আর নিত্যি নতুন গল্প পাব বল? সব বলে বলে তো তোদের দিতুর ঝুলি উজার হয়ে গেছে।

—ঝুলি উজার হয়েছে তো মাথার খুলি থেকেই বার কর না। বড়দের জন্যে তো বেশ লিখতে পার।

—নাছোড়বান্দা ছুই জবরদস্তের পাল্লায় যখন পড়েছি একটা কিছু বলতেই হবে। নইলে পার পাব না। আমাদের ছোট বেলায় দিদিমা ঠাকুমা যা যা বলেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছি। এক গল্প একশবার বললেও তাই সই। এরা কিন্তু একই গল্পে তুষ্ট নয়।

যাই হোক, যা হয় একটা বলতেই হবে ; তাই শুরু করলাম।

বাবা আর মায়ের সঙ্গে ডিউক আর জর্জ্জি ছুই ভাই, লঞ্চে করে সমুদ্দুরের ওপোর দিয়ে পিকনিকের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। ওদের দেশে যে কোনো ছুটিছাটায় এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়ার রেওয়াজ। ঘরে বসে থাকে না বড় একটা কেউ। কখনো ক্যারাভ্যান বাসে তাঁবু টাবু নিয়ে দূর পাল্লায় পাড়ি দেয়। সেখানেই খাওয়া দাওয়া ঘুমানো চলে। কখনো সমুদ্দুরের কোনো দ্বীপে চলে যায় পিকনিক করতে, যেমন আজ চলেছে।…

বাধা দিয়ে রুন্‌কি বলল : ওদের ভারী মজা না দিদুন ? পেলেই ছুট্ করে কেমন বেড়াতে যায়। আমরা কেন যাই না ?

আমি জবাব দিলাম : ওদের ঐ রেওয়াজ। আমাদের তেমন সুবিধেই বা কোথায় ? তা' ছাড়া, ওদের খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা বা ঝুট্ ঝামেলা খুবই কম। টীনের খাবার, কিছু কেক-পেষ্ট্রি নিয়ে নিল। বাস্, হয়ে গেল। আমাদের দেখিস না, একদিন পিকনিক বা চিড়িয়াখানায় যাবো ত' তিনদিন আগে থেকে কত যে খাবার যোগানোর ধুম পড়ে যাবে। ওদের বেড়ানোটা বড়ো, আমাদের খাওয়াটা।

আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে ঝিমলি বলল : বাজে কথা থাক, এবারে শুরু কর তো।

নাঃ, অবান্তর কথা বলে সময় কাটাতে দেবে না ওরা। অগত্যা পূর্বের খেই ধরলাম : বড় বড় ঢেউএর তালে তালে লঞ্চের ওঠা নামা। ডিউক আর জর্জ্জির তো বেজায় ফূর্তি।

আবার বাধা। রুনকি জিজ্ঞেস করল, সমুদ্দরের বিশাল ঢেউ দেখে ওরা ভয় পেল না দিদুন ? বাব্বা, পুরীতে যা ঢেউ দেখেছি না, ধারে নেবে চান করতেই ভয়ে আধমরা হবার অবস্থা। তাও নুলিয়ার হাত ধরে, আর ওরা তো মাঝ সমুদ্রে একটা পল্‌কা লঞ্চে।

অমনি ঝিমলির মুখ ঝাপ্‌টা : আঃ রুনকি, বার বার বাধা দিচ্ছিস তো গল্প শুনবি কখন ? এটা সেটা প্রশ্ন করে গল্পের ইয়েটাই নষ্ট করে দিস।

আমি আবার শুরু করলাম : ওরা বেশ চলেছে আনন্দে। ওদের দু'ভাই এর দুটাপাটি ও বিশাল ঢেউএর ধাক্কায় লঞ্চখানার তো টলোমলো অবস্থা।

মা ছেলেদের ডেকে সাবধান করে বলছেন : অত ধারে যেও না বাছা। কখন কি হয় বলা যায় কি ? পড়ে টড়ে যেতে পার।

বাবা কিন্তু উৎসাহ দিয়ে বললেন : সমুদ্দরের সঙ্গে পাঞ্জা ...

তো কি আর হবে, সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠবে। কি পারবে না তোমরা?

সোৎসাহে দু'ভাই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল: হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আমরা সাঁতার কেটে তোমাদের আগেই তীরে গিয়ে উঠব। অবশ্য তোমরা লাইফবয়টা ফেলে দিও তাই নিয়ে দিব্যি চলে যাব।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউএর ধাক্কায় লঞ্চখানা একদিকে একেবারে কাৎ হয়ে পড়ল। অমনি দুইভাই টাল সামলাতে না পেরে টুপ্ করে অথৈ জলে পড়ে গেল।

ওদের জলে ফেলে দিতেই দারুণ উত্তেজনায় দুধার থেকে দু'জনে আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলতে লাগল: কি হবে দিদুন! যতই বলুক না, সমুদ্দুরে সাঁতরে তীরে ওঠা ওদের কম্ম নয়। ঐটুকু বাচ্চা ছেলে! এ আমাদের গঙ্গা নয় যে, একটু সাঁতার জানলেই হল।

শোন্ই তারপর কি হ'ল। আমি বলতে লাগলাম: যেখানটায় দু'ভাই পড়ে গেল, সেখানটায় জলের নীচে ছিল বিরাট এক তিমি। যেই না টুপ্ করে ওদের পড়া তিমিটা যেন তাক্ করেই ছিল অমনি মস্ত বড় হাঁ করে টুক করে ওদের গিলে ফেলল।

ওদের বাবা মা তখন হৈ চৈ কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে লাইফ-বয়টা ফেলে দিলে। দিলে হবে কি, যা 'হবার তা হয়ে গেছে ততক্ষণে, ওরা সোজাসুজি তিমির পেটে ঢুকে গেছে।

তিমিটা ছিল বিরাট আকারের, কাজেই তার পেটের খোলটাও নেহাৎ ছোট নয়। যেন একখানা খেলার মাঠ। দু'ভাই বুঝতেই পারল না, কোথায় গিয়ে পৌঁছালো। শুধু একটু গরম গরম লাগতে লাগল। ওরা সেই অন্ধকার পেটের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

আবার অমরিত্র উৎসুক প্রশ্ন: পেটের মধ্যে খালি খালি গড়ের

মাঠ হতে যাবে কেন? নাড়ি ভুড়ি থাকে না বুঝি তিমিদের পেটে? পিলে-লিভার, ষ্টমাক অ্যাপেণ্ডিক্স ··?

ঝিমলির পূর্ববৎ দাবড়ানিঃ তুই থাম তো। বলে যেতে দে দিতুনকে।

ওরা যখন লঞ্চে দাঁড়িয়েছিল, ডিউকএর হাতে একটা বড় ফুট-বল আর জর্জ্জির হাতে ছিল মস্ত এক কেকের বাক্স। সবশুদ্ধই তিমির পেটে চলে গিছল তো। কিছুক্ষণ পর আঁধার ক্রমে সরে এলো। দু'জনেরই ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেছে। তাই প্রথমে ওরা কেকটার সদ্ব্যবহার করল। এবার কি করা যায়? চুপচাপ বসে থাকার পাত্তরই নয় ওরা। হাতের বলটা নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল। তারপর খেলায় জমে গেল। লম্বা লম্বা জোরসে সট্‌ মেরে মেরে তেড়ে খেলতে লাগল। তিমির পেটটা তো খেলার মাঠের মতই বললাম না।

আবার রুনকির মন্তব্যঃ কি সব আজগুবি বলছ দিতুন! ওরা যেমন কেকটা হজম করছে, তিমিটাও ওদের তেমনি হজম করে ফেলছে না কেন? তিমিটার পেটে অ্যাসিড নেই বুঝি?

ঝিমলি আবার বিরক্ত হয়ে বলল ঃ বলতেই দে না শেষ অবধি! দেখি দিতুনের কল্পনার দৌড় কদ্দূর। বারে বারে ঝগড়া দিতে হবে না।

· ঝিমলির মুখ ঝাম্‌টা খেয়ে রুনকি চুপ!

পুনরায় ছেঁড়া সুতো জোড়া দিলামঃ খেলতে৷৷খেলতে ডিউক অ্যায়সা এক সট্‌ মেরেছে যে তিমির পেটের চামড়া ফুটো হয়ে বলটা তীরের মত একেবারে সোজা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউক আর জর্জ্জিও তড়াক করে এক লাফে ঐ ফুটো দিয়ে ফুরুৎ করে তিমির পেটের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসেই ঢেউএর এক ধাক্কায় মাইল খানেক এগিয়ে গেল। ওদের কি বরাত জোর! সামনেই দেখতে পেল বাবা-মার লঞ্চ থেকে ফেলে দেওয়া দুটো লাইফবয়। ব্যস্‌, আর পায় কে? ...

ধরে ঢেউএর তালে তালে হেলে দুলে তীরে এসে হাজির হ'ল। ওদের বাবা মা লঞ্চ নিয়ে খুঁজেপেতে ওদের বার করলেন। সবার কি আনন্দ তখন। নিজেদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সবিস্তারে বাবা মার কাছে বলতে লাগল। আমার কথাটিও ফুরোলো।

সর্বক্ষণ ঝিমলি রুনকির কৌতূহলকে ধমকে দমিয়ে দিয়েছে। এবারে ঝিমলি মুখ খুলল। আমাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল: কি একখানা গল্পই শোনালে! তিমি ওদের খেয়ে ফেলল আর ওরা দিব্যি পেটের মধ্যে ফুটবল খেলতে লাগল। এ ও কখনো সম্ভব? এসব টুটুনকে শুনিও। টুটুন এক বছরের বাচ্চা, ওদের ছোট্ট ভাই।

আমি বললাম: তিমির পেটে বেঁচে থেকে ফুটবল খেলতে পারবে না কেন শুনি? এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি রূপকথা আর উপকথা হুমড়ি খেয়ে পড়িস সেগুলো বুঝি আজগুবি নয়, সত্যি? বোয়াল মাছের পেটে ঝিনুকের মধ্যে রাজকুমারী যদি জেলের ঘরে গিয়ে রেঁধে বেড়ে জেলেকে খাওয়ায়, তাহলে ডিউক আর জর্জিই বা তিমির পেটে ফুটবল খেলতে পারবে না কেন? ও সব ছাপার অক্ষরে কিনা, তাই নাওয়াখাওয়া ভুলে পড়তে মজা লাগে। আর দিদুন মুখে বলছে তাই এগুলো উদ্ভট, আজগুবি।

দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠল: তুমি বলছ আজকে এই অ্যাটমের যুগে, তুমি কেন সেই আদ্যিকালের ছেলে ভুলানো—গাঁজাখুরি গল্প বলে আমাদের ভোলাতে চাইবে? আমরা এখন স্পুটনিকে চড়ে চাঁদে যাবার আশা রাখি। এভারেস্ট জয় করতে দেখি, প্যাপিরাসের নৌকো করে সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা ভাবি। রাজকুমার সরোবরে ডুব দিয়ে স্ফটিক তরোয়ালের এক কোপে কেটে ভোমরার ঠ্যাং ছিঁড়লেই রাক্ষস মরে যাবে বা তিমির পেটে গিয়ে ফুটবল খেলা শেষে ফিরে আসবে সে কথা বিশ্বাস করি না মোটেই।

যা তা বানিয়ে বলে ওদের কাছে পার পাব আমিও আর তা' বিশ্বাস করি না।

ভালো আছি

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

হ্যাঁ, বেশ ভালো আছি। অনেকদিন কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয় নি। আর তা হবেই বা না কেন? আমাদের দেহ যন্ত্রটি যদি এত হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত করেও নিজেকে ভালো না রাখতে পারে তা হলে আর অত কষ্ট করার দরকারটাই বা কি ছিল!

প্রথমে ধর আমাদের গায়ের চামড়া। কী ভীষণ এক বর্ম; এর ভেতর দিয়ে কোন জীবাণুর ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই। শুধু কি তাই? চামড়ারও জীবাণু মারবার শক্তি কম নয়, যেমন ধর আমাশার জীবাণু তোমার হাতের উপর রেখে দিলে বাঁচবে মাত্র ২০ মিনিট। পেটে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে তোমার তো হাতের জল শুকোনই মুস্কিল।

দু'একটা জায়গায় তো চামড়া বদলে গেছে, যেমন চোখ। চোখ তো আমাদের বাইরের দিকে খোলা, সব সময়েই ধুলো বালি জীবাণু এসে পড়ছে। প্রথমেই দেখ চোখ আমাদের ভর্তি হয়ে ওঠে জলে। জলে ধুয়ে দেওয়া হয় যত রাজ্যের আবর্জনা। তারপরে চোখের জলেতে আছে জীবাণুদের মারবার জন্যে একটি জিনিস লাইসোজাইম।

মুখ আমাদের খোলা থাকে খাবার জন্যে, কিন্তু আমাদের মুখ ভেজাবার লালা যে শুধু খাবারই হজম করতে সাহায্য করে তাই নয়; এতেও আছে জীবাণু—প্রতিষেধক নানা জিনিস—লাইসোজাইম, লাইসিন, প্ল্যাকিন, লিউকিন ইত্যাদি।

যদি কোন রকমে মুখটুখ পেরিয়ে জীবাণুরা ঢুকলো পেটে, সেখানে আছে বেশ ঝাঁঝালো অ্যাসিড, সেখানেই হয় তাদের মৃত্যু। খুব কম জীবাণুই জ্যান্ত ঢুকতে পারে অন্ত্রে।

আমাদের নাক দেখলে অবাক হতে হয়। ঘ্রাণ নেবার জন্যে

এতো রকম কায়দা করার কী দরকার? না, যা কিছু ব্যবস্থা তার কারণ হলো নাক আমাদের জন্য নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করে। আর যে বাতাস তাকে শরীরের ভেতরে ঢোকাতে হয় তারা তো ভর্ত্তি নানা রকম ধুলো আর জীবাণুতে। কাজেই প্রথমে আছে নাকের লোম—ঝাঁঝড়ির মত; কিছু কিছু জিনিস দেয় বার করে। যারা এড়িয়ে যায় তাদের জন্যে আছে নাকের কফ, সঙ্গে সঙ্গে বের করার জন্যে হয় হ্যাঁচ্চো—। তাতেও না হলে নাকের জল বেরুতে থাকে বাইরে—সব ধুয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা। ফুসফুসেও সেই ব্যবস্থা—জীবাণু ঢুকেছে কি তাদের আটকে রাখতে চেষ্টা করে কফ, সুরু হয় কাশি, কাশতে কাশতে বের করা হয় জীবাণুদের শরীরের বাইরে।

কিন্তু যদি ধর তোমার চামড়া কেটে জীবাণু ঢুকলো শরীরের ভেতরে। তারা তক্ষুনি শুরু করলো বংশবৃদ্ধি করতে। ৬-৭ ঘণ্টায় হয়ে যাবে প্রায় এক কোটি, আর পরের দিনে হাজার কোটি। ভেবে দেখ ব্যাপারটা! কিন্তু শরীর তো তা বলে বসে থাকতে পারে না। সে সুরু করে দেয় তার কাজ।

জীবাণুরা যেখানে ঢুকলো, সেখানকার কোষগুলি ঢেলে দিল তার চারিপাশে কতকগুলি রস, তারা গিয়ে কাছের রক্ত-জালীর দেয়ালগুলিকে করে দেয় একটু ঢিলে, যাতে রক্তের জলীয় ভাগ চলে আসতে পারে জীবাণুর কাছে, তার সঙ্গে আসে শ্বেত কণিকারা। তাদের কাজ হলো জীবাণ দের খেয়ে ফেলা। এদের কাজ যাতে সহজ হয় তাই রক্তের একটা উপাদান জমিয়ে দেয় জায়গাটাকে যাতে জীবাণুরা শরীরের দিকে দিকে ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

কিন্তু কতক্ষণ এরা লড়বে? কাজেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে তৈরী হয় নতুন নতুন রস; তারা চলে যায় শরীরের সব জায়গায়, নতুন শ্বেত কণিকারা হুড়মুড় করে চলে আসে যুদ্ধক্ষেত্রে আর আমাদের হাড়ের ভেতরে সুরু হয় নতুন শ্বেত কণিকার কারখানা।

অনেক সময় হয়তো শ্বেত কণিকারা জীবাণুদের মারতে পারে

না ; তাদের তখন নিয়ে যায় সামনের লসিকা গ্রন্থিতে, আর তার জন্যেই তারা বেড়ে ওঠে বড় হয়ে। এখানে লসিকা গ্রন্থিরা ধীরে সুস্থে জীবাণুদের মেরে ফেলে। কিন্তু তার ফলে সারা শরীরের অসুখ সেরে গেলেও অনেক সময়ই ওরা বড় হয়ে থাকে অনেকদিন।

যদি এসব বাধা এড়িয়েও কোন জীবাণু চলে যায় রক্তে তা হলে তাদের ধরে ফেলে আমাদের যকৃৎ, প্লীহা আর হাড়ের ভেতরের কোষগুলি।

সবচেয়ে মজার কথা হলো আমাদের শরীরের কোষগুলি আপন-পর চেনে কি করে? আমাদের শরীরে একরকম জিনিস আছে যাদের নাম অ্যান্টিবডি। এরা শ্বেত কণিকার গায়ে গায়ে লেগে আছে। এরাই চিনিয়ে দেয় কে আপন, কে পর। আমরা যে টাইফয়েড, কলেরা বা অন্য ব্যারামের জন্যে ইন্‌জেক্‌শন নিই, তাতে এই অ্যান্টিবডিরাই বেড়ে ওঠে। তাইতো আজ জয় করতে পারা গিয়েছে ডিপথিরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশি—ট্রিপল এ্যান্টিজেন দিয়ে ; পলিওমায়েলাইটিস, তার প্রতিষেধক খাইয়ে।

অমনি কি আর ভাল আছি ভাই, আমার শরীর অনেক কাঠ খড় পোড়াচ্ছে, তাই না ভাল আছি।

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

গল্প আরম্ভ

ও ঠাকুমা, গল্প বলো
সোনার জালে বোনা
যে গল্প তোমার বাবার
মায়ের কাছে শোনা।
সেই ঠাকুমা শুনেছিলো
তার ঠাকুমার কাছে
সব ঠাকুমার গল্প-গাঁথা
সব নাতিটির আছে।
প্রথম দিনের ঠাকুমা'টি
প্রথম নাতির কানে
যে গল্প শুনিয়েছিলো
ঘুমপাড়ানীর গানে,
সেই সে রাজা রাজপুত্র
সওদাগরের ছেলে
ঘুমন্ত সে রাজকুমারীর
স্বপ্ন ভেঙে ফেলে—
সাত সাগরের তলায় সে-এক
রাক্ষসেরই দেশে—
সোনার কাঠির খবর পেয়ে
থামলো সেথায় এসে।
অমানিশায় ভূত-পেত্নি
শাকচুন্নীর বাড়ী
সেই দেশেতে সেই ঠাকুমা
হঠাৎ দিলেন পাড়ি।
হারিয়ে গেছে সে-সব দিনের
সেই ঠাকুমা-নাতি
হারিয়ে গেছে রূপনগরের
হাজার ঝালর বাতি।
হারিয়ে গেছে মিশকালো সেই
অন্ধকারের রাত
অজগরের গজ-গজানি
ঝকমকানি দাঁত।
নতুন দিনের ঠাকুমাটি
নতুন নাতির কাছে

ব'লছে "দাদু, চাঁদে যাবার
গল্প জানা আছে।
সেই গল্প জানতে যদি
মনটা ওঠে মেতে
বলছি শোন নাতির দল-
ছোট্ট দু'কান পেতে।"

এক

এক যে ছিল রাজার ছেলে ছোট্ট, খাটো, বেঁটে
ঠিক ক'রেছে চাঁদের দেশে চ'লবে হেঁটে হেঁটে।
শূন্যে হাঁটা করবে শুরু সেই সে ছেলে রাজার
দুই লক্ষ মাইল সে যাবে—আর চল্লিশ হাজার।
আকাশ ছেড়ে মহাকাশের ধাপে ধাপে উঠে
রাজার ছেলে চাঁদের পথে চলবে সোজা ছুটে।
তার ভ্রমণের কাহিনীটা বিরাট সে এক খাতায়
আঁকা-বাঁকা হাতের লেখায় রং-বেরঙের পাতায়।
চুপি চুপি লিখে যাবে সেই সে রাজার ছেলে
সন্ধ্যাবেলা ঘুমের চোখে হয়তো যাবে ফেলে।
ঠাকুমা তার ঝুলির ভেতর রাখবে তুলে তাই
হাজার নাতির কানে কানে গল্প বলা চাই।
লক্ষ-মাণিক জ্বলছে দেখো মহাকাশের গায়
সবচে' কাছে চাঁদের দেশে রাজার ছেলে ধায়।
বিজ্ঞানীরা কানে কানে বলে দেবেন পথ
রাজার ছেলে করবে যোগাড় মস্ত রকেট-রথ।

দুই

সুন্দর চন্দ্র সে ছন্দের গোলা
ঘুম ঘুম তন্দ্রায় শিশু-মন ভোলা
সুগন্ধ ঢালে ফুল আনন্দে মগন
বন্ধ অন্ধ চোখে সারাটি গগন।
কবিরা কাব্য লেখে গভীর ভাষায়
চকোর চাঁদেরে ডাকে মধুর আশায়।

হায় হায় আসলেতে কুরূপ চাঁদের
নেই তার কোনো ঢং ছিরি ও ছাঁদের।

জীব নেই, গাছ নেই, নেই কীট কোনো
আরও কত নেই তাই মন দিয়ে শোনো।
জল নেই, বায়' নেই, নেই মেঘ, আলো
পূর্ণিমা রাতে তবু চাঁদ লাগে ভালো।

পাহাড়ের সারি শুধু আর সব ফাঁকা
বরফ বিটপী নেই, পাথরেতে ঢাকা।
জলধির খাত আছে নেই তাতে জল
শুধু আছে বড় বড় বিরাট ফাটল।
শুকনো পাথর-রাশি খাঁ-খাঁ করে শুধু
সাড়া নেই, তাড়া নেই প্রাণহীন ধূ-ধূ।
জীবন্ত চাঁদে ছিল অনন্ত বাহার
ফুটন্ত লাভার আভা জলন্ত পাহাড়।
মৃত-চাঁদ আজ শুধু নিরব নিথর
অমৃতের শোভা তবু আনে শশধর।
নিভে যাওয়া লাভা জ'মে উঁচু হোল কত
লজ্জায় হিম হয়ে মাথা করে নত।

পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু চাঁদের বিকাশ
যেটা খুব উচু সেটা 'কোপারনিকাস্'।
পৃথিবীর পাহাড়েরা ছোট তার কাছে
এমন পাহাড় চাঁদে আরো কত আছে।
রাজার কুমার দেবে সেই দিকে পাড়ি
শুধু চাই তাড়াতাড়ি রকেটের গাড়ি।,

তিন

রাজার ছেলে প্রশ্ন করে
চোখ কপালে তুলি :
"এমন কেন দারুণ উঁচু
চাঁদের পাহাড় গুলি।
দূরবীণেতে যাচ্ছে দেখা
গর্তগুলো তার—
মস্ত সে সব চওড়া দারুণ
ধরণ বোঝা ভার।
এই পৃথিবীর পাহাড় আছে
গর্ত আছে যত—
নয়কো তারা অমন বিরাট
চাঁদের দেশের মত।"

চুপি চুপি বিজ্ঞানীরা
বলেন কানে কানে,
"উঁচু পাহাড়, গর্ত বিরাট,
অর্থ সবাই জানে।"
চাঁদের দেশে অল্প বেলায়
আকর্ষণীর টান
তাই সেখানে সব জিনিসের
হাল্‌কা ওজন, মান।
নিজের দিকে টানার যদি
শক্তি থাকে কম
হাল্‌কা টানে তুলতে ওজন
অল্প পরিশ্রম।
এক লাফেতে এই ধরাতে
যাও যদি 'ফুট'-চার
চন্দ্রে যাবে ছ'গুন বেশী
কেমন চমৎকার।
আকর্ষণীর টান না থাকায়
লক্ষ বছর আগে
তপ্ত চাঁদের তরল পাহাড়
উঠতো ওপর ভাগে।
ধরার মত নীচের দিকে
ছিল না তার টান
তাই তো চাঁদের পাহাড়গুলোর
উচ্চে অভিযান।
একটু কোথাও গর্ত হলেই
ছড়িয়ে যেত দূরে
রাজার ছেলে বললে, 'সে-সব
দেখবো নিজে ঘুরে।'

চার

রাজপুত্র, মন্ত্রীকুমার, সওদাগরের ছেলে
তিনজনেতে চাঁদের দেশে ছুটলো অবহেলে
তাপটি ধরা, বাতাস ভরা, মুখোস পরা জামা
দেখলে পরে হচ্ছে মনে ভীম-ভবাণী-গামা।
বসার জায়গাতেই থাকলো শুয়ে তিনজনেতে চিৎ
শূন্যে মাঝে গাইছে তারা মহাকাশের গীত।
খাওয়া-দাওয়া, গল্প-হাসি, চলছে তারি মাঝে
বসুন্ধরায় বার্তা পাঠায় সকাল, বিকেল, সাঁঝে।
ভারি হাওয়া, হাল্‌কা হাওয়া বাতাসবিহীন ফাঁকা
হাজার মনের গ্যাস্‌ জ্বালিয়ে শূন্যে শুয়ে থাকা।
চ'লছে ছুটে রকেটখানি রাজার ছেলে হাসে
ধরার বিপুল আকর্ষণ—হাল্‌কা হয়ে আসে।
সাজ-পোষাক আর সরঞ্জামে চার-মণেরই দেহ
চন্দ্রে গেলেই সের-সাতাশেক—মানবে সে-কি কেহ।
একটু যদি লাফাও চাঁদে ছিটকে যাবে দূরে—
হাল্‌কা টানে, হাল্‌কা প্রাণে বেড়াও ঘুরে ঘুরে।

বিপদ হ'লেই রাজার ছেলে রাজধানীতে তার
বেতারেতে বার্তা পাঠায় লাঘব করে ভার।

অমনি রাজা মন্ত্রী ডাকেন, মন্ত্রণা দেয় প্রজা
ঠিক হলে রথ আবার তারা চললো ছুটে সোজা।
রাজপুত্র, মন্ত্রীকুমার, সওদাগরের ছেলে
ধরার মানুষ চন্দ্রে চলে প্রাণের মায়া ফেলে।

পাঁচ

রকেট্ রকেট্ রকেট্
তিনখানা তার খোলস যেন
তিনটি মজার পকেট।

তিনবারে তিন ধাক্কা দিয়ে
মহাকাশের ভেলায়
বিরাট বিপুল গতির টানে
শূন্য মাঝে খেলায়।

এই পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে
হাল্‌কা হল গতি
চাঁদের টানের মধ্যে প'ড়ে
বাড়লো সে-বেগ অতি।

অমন জোরে ঢুকলে চাঁদে
মহাকাশের যান
ধাক্কা খেয়েই হয়তো হবেন
টুক্‌রো কয়েক-খান।

তাই তো তখন সামনে পেছন
দুই দিকে স্থায় টান
মন্ত্রতে নয় যন্ত্রে হলো
চন্দ্রে অভিযান।

দুই দিকেরই দুই টানেতে
নামলো ধীরে নীচে
আর একজনা রকেট মাঝে
ঘুরছে পিছে পিছে।

চাঁদের পিঠে নামলো ভেলা
ঘুরছে দূরে রথ
ফেরার পথে তুলবে টেনে
সুগম হবে পথ
বসুন্ধরায় ফিরবে আবার
সঙ্গী সাথী তিন
রাজায় প্রজায় সবাই মিলে
নাচবে তা-ধিন ধিন।

গল্প শেষ

রাজার কুমার ভাবে
এই সেই চাঁদ
চিরদিন মানুষের
মনে পাতে ফাঁদ।

পুরাণের কাহিনীতে
স্বরগের কাছে
অসীম পুলক-ধাম
'চাঁদ-লোকে' আছে।

সুধা-ভরা চাঁদে সব
সুখে দিশাহারা
যারা-সে পুণ্যবান
শুধু যেতো তারা।

আর ছিলো চাঁদমামা
দূরে নিশাকালে
ঘুম পেলে টিপ্ দিত
খোকনের ভালে।

বিজ্ঞানী, কল্পনা
ভেঙে করে চুর
চন্দ্রের গ্রহখানি
আর নয় দূর।
কাব্যের কল্পনা
থামা ওরে থামা—
থামা নয়, মামা নয়
চাঁদে হলো নামা।

পৃথিবীর তিনবীর
নেই তার জুড়ি
চাঁদে হেঁটে তুলে আনে
মাটি আর নুড়ি।

তার পর ভেলা বেয়ে
ওপরেতে ওঠে
রকেটেতে ফিরে এসে
পৃথিবীতে ছোটে।
এই ভাবে যায় লোকে
চন্দ্রের দেশ
ঠাকুমার গল্পের
এইখানে শেষ।

১৩৮১ সালের শিশুবিচিত্রা ও তোমাদের জন্য প্রতিযোগিতা

পরের বছরের শিশুবিচিত্রার জন্য এখনই আমরা কাজ সুরু করে দিচ্ছি। এবারে আমরা তোমাদের চাই আমাদের সঙ্গে। সে জন্য আমরা ঠিক করেছি

ক) তোমাদের লেখা আমরা ছাপব প্রায় এক ফর্মা অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা।

খ) সে জন্য তোমাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি প্রতিযোগিতার :

১। **গল্প**—ছোট গল্প লিখতে হবে। ফুলস্কেপের ৪ পৃষ্ঠার চেয়ে যেন বেশী না হয়। (আনুমানিক ১২০০ শব্দ)।

২। **কবিতা ও ছড়া**—এক পৃষ্ঠার বেশী যেন না হয়।

৩। **জীবনী**—যে কোন মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। ফুলস্কেপের ৪ পৃষ্ঠার চেয়ে যেন বেশী না হয়।

৪। **ছবি**—তোমাদের আঁকা ছবি।

প্রত্যেক বিভাগেই—

যে প্রথম হবে তাকে দেব আমরা ৫০ টাকা

যে দ্বিতীয় হবে তাকে দেব আমরা ২৫ টাকা

আর যাদের লেখা ভাল হবে তাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে বই।

নিয়ম :

১। প্রত্যেক লেখা বা ছবির সঙ্গে প্রতিযোগীর অভিভাবকের একটা পত্র দিতে হবে যে এ লেখা বা ছবি প্রতিযোগীর নিজের এবং তার বয়স ১৬ বছরের অনধিক।

২। প্রত্যেক লেখা বা ছবির সঙ্গে পাঠাতে হবে পাঁচ টাকা; আগামী বছরের শিশুবিচিত্রার দাম হিসাবে। শিশুবিচিত্রার দাম যাই হোক না কেন, তোমরা, প্রতিযোগীরা পাঁচ টাকাতেই পাবে।

৩। **সময় :** ১৩৮১ সালের বৈশাখ মাসের ৩০শে পর্যন্ত।

৪। **পাঠানোর ঠিকানা :** ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

৫। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। সে সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ বা কথা বলা সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতার কুপন

আমি.................................... ....

ঠিকানা.................................... ....

এই সঙ্গে ১৩৮১ সনের শিশুবিচিত্রার জন্য পাঁচ টাকা পাঠালাম।

এই সঙ্গে আমার লেখা....................................

পাঠালাম। আমি বিচারকদের সিদ্ধান্ত বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেব।

স্বাক্ষর

[এই সঙ্গে অভিভাবককে একখানা পত্র দিতে হবে]